Post-Conference Proceedings of

ʃɔbd̪o

Guest Editor

Sankar Ram Barman

A JJLL Publication of School of Languages and Linguistics
Jadavpur University
Kolkata
2026

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

Volume 08, Special Edition

Post-Conference Proceedings of

ʃɔbd̪o 2024

© 2026 by the author(s) of the respective articles. No part of this material protected by this copyright notice may be reproduced or utilised in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright owner(s).

***

Editorial Board:
Atanu Saha
Indranil Dutta
Samir Karmakar

Managing Editor:
Samir Karmakar

ʃɔbd̪o 2024 Conference Organising Committee

আহ্বায়কবৃন্দ

অভিজিৎ মল্লিক, বারুইপুর মহাবিদ্যালয়, বারুইপুর

দেবদীপ ধীবর, দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর

রিমি ঘোষদস্তিদার, পি.আর. ঠাকুর সরকারী মহাবিদ্যালয়, ঠাকুরনগর

ছন্দম চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সমীর কর্মকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কার্যনির্বাহী সমিতি

অর্ঘ্যদীপ সরকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

অগ্নিভ দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

অনিরুদ্ধ পোদ্দার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

দৃপ্তা ষড়ঙ্গী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

পতিতপাবন পাল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

রাতুল ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

শংকর রাম বর্মন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

শুভেন্দু বিশ্বাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সহযোগিতায়

বারুইপুর মহাবিদ্যালয়, বারুইপুর

দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর

পি.আর. ঠাকুর সরকারী মহাবিদ্যালয়, ঠাকুরনগর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সম্পাদকীয়

করোনা মহামারির লকডাউনে যখন আমরা গৃহবন্দি তখনকার এক পড়ন্ত বিকেলবেলা বাংলা ভাষায় ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার জন্য এক পরিসর রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই মতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক সমীর কর্মকারের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়ে যায় সলতে পাকানোর কাজ। কোভিড পরিস্থিতিতে কিছু বিধিনিষেধ থাকায় আগের দুটি সম্মেলন অনলাইনে সম্পন্ন করতে হয়েছিল। বিগত দুটি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ও গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপনকারী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সাড়া পেয়ে আমরা তৃতীয় সম্মেলনের আয়োজন করার সাহস পেয়েছি। অনলাইনের সীমাবদ্ধতা ও নানা সমস্যার কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কোভিড মহামারির পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তৃতীয় সম্মেলনটি আর অনলাইন মাধ্যমে নয়, অফলাইন মাধ্যমে আয়োজন করা হবে। সেই সূত্রে তৃতীয় শব্দ সম্মেলনটি প্রথম অফলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'শব্দ' আয়োজিত ভাষা বিষয়ক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বারুইপুর মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয় এবং পি.আর. ঠাকুর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে ২৭–২৯ ভাদ্র, ১৪৩১ (ইং ১৩–১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটিতে ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্বের মতো কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান, ভাষা রাজনীতি, ভাষা ও প্রযুক্তি, প্রয়োগতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদির মতো বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ, ২৮ ভাদ্র, ১৮৩১ (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) তারিখে অধ্যাপক নন্দন ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে 'শোষিতের ভাষ্য থিয়েটারের ভাষা' বিষয়ে গবেষণা উপস্থানকারী এবং অংশগ্রহণকারী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকদের নিয়ে একটি ভিন্নধর্মী ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা নিবন্ধ এবং আমন্ত্রিত বক্তৃতাগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচিত ২০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের গবেষণা নিবন্ধ গতবারের মতো এবারেও 'যাদবপুর জার্নাল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স' নামক জার্নালের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হল। নানা অসুবিধার কারণে সংকলনটি প্রকাশে কালবিলম্ব হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

ধন্যবাদান্তে,

শংকর রাম বর্মন

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

সূচিপত্র

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষাবৈচিত্র্য: একটি নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষার তুলনামূলক প্রতিবেদন 001-028
সুমন ঘোষ

প্রতিবন্ধকতার পরিচয় নির্মাণে ভাষাগত বিবর্তন: একটি পর্যবেক্ষণ 029-037
বুবাই বাগ

বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: একটি এইচপিএসজি পর্যালোচনা 038-052
শুদ্ধ এম. তৌসিফ

প্রজেকশন তত্ত্ব: বাক্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ 053-062
প্রণতি ঘোষ

চাঁই টেন্সের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি টেন্সের তুলনা 063-071
পরিমল মন্ডল

ভাষা দ্বারা রহস্যের আবহ নির্মাণ: প্রসঙ্গ পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল 072-086
দেবলীনা সেন

ছোটদের ছোটগল্প: শশিভূষণ দাশগুপ্তের শিশুসাহিত্যে ধারণাগত মেটাফর 087-097
কৃষ্ণ শিঞ্জিনী দেব

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার শব্দেরা কথা বলে 098-116
প্রদীপ বিশ্বাস

বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যে ভাষার অভিমুখ 117-122
প্রিয়াঙ্কা মৈত্র

ভাষার সংমিশ্রকরণ ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব—প্রসঙ্গ *সেকশুভোদয়া* 123-134
পার্থসারথি ভট্টাচার্য

ভারতে ভাষাগত সমস্যা: ভাষানীতি ও মানবাধিকার 135-143
ঋষিকৃপা দাস

বঙ্গে পাণিনীয় ব্যাকরণের পরম্পরা: জ্ঞাপকসমুচ্চয় ও আচার্য পুরুষোত্তম দেব 144-158
স্বয়ম্ভা দাস

বঙ্গের ভোটে উদ্ভূত ভাষা-সংস্কৃতি: ঐতিহ্য যেন অতীত 159-164
বাসুদেব সরকার

মালতো ও বাংলা ভাষা সংযোগ 165-173
বাপী সরকার

ছড়া, গীতি, প্রবাদে ব্যবহৃত রাঢ়-বাগড়ির আঞ্চলিক ভাষা: একটি সমীক্ষা 174-182
দেবাশিস পাল

কৃষিকাজ ও বাংলা শব্দভাণ্ডার 183-191
গোপীনাথ দাস

নারীর গানে নারীর কথা: ভাদু ও টুসু 192-196
মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও হাওড়ার বাসিন্দাদের একটি অংশের মধ্যে হিন্দি ভাষার দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনামের ব্যবহার: একটি সমাজভাষাগত বিশ্লেষণ 197-208
মোঃ আবুল আফজাল মুবাশ্শির

বাংলাদেশে ব্যবহৃত সাঁওতালি ভাষা ও বাংলা ভাষার ক্রিয়া রূপতত্ত্ব: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ 209-224
প্রজ্ঞা সাহা এবং মালিহা ফাহমিন আহমেদ

পশ্চিম বাংলার কুম্ভশিল্প-বিবর্তনের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে কুমোর পাড়ার শব্দ 225-241
সুমন দাস

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষাবৈচিত্র্য: একটি নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষার তুলনামূলক প্রতিবেদন

সুমন ঘোষ

শ্রীরামপুর কলেজ

ARTICLEINFO

Article history:
Received 12/05/2025
Accepted 10/08/2025

সূচক শব্দ:
রাজবংশী ভাষা,
শেরশাবাদী ভাষা,
ধ্বনিতত্ত্ব,
রূপতত্ত্ব,
ক্ষেত্রসমীক্ষা,
ভাষা-সংরক্ষণ।

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রবন্ধে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্গত রাজবংশী ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রসমীক্ষা, স্থানীয় অধিবাসীদের সাক্ষাৎকার ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের ব্যবহৃত ভাষার নমুনার উপর ভিত্তি করে এই ভাষার বহুমাত্রিক রূপ ও উপভাষাগত পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়–রাজবংশী ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যেমন ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, অল্পপ্রাণীভবন (উঠেছে > উঠিচে, ফেলছে > ফিলাচে) মধ্যস্বরাগম (প্রাণ > পরাণ, সন্ধ্যা > সইন্ধ্যা) দ্বিত্বব্যঞ্জন, অপিনিহিতি, অনুনাসিকতা (আঁখা, আঁউসি) ইত্যাদি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার, বিভক্তি পরিবর্তন ('তে'-এর পরিবর্তে 'ত', 'মনত', 'পাড়ত', 'ঘরত', 'গাছত' ইত্যাদি) এবং বাক্যগঠনে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এই ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শেরশাবাদী ভাষার সঙ্গে উচ্চারণগত দিক থেকে রাজবংশী ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি নমুনার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য স্থানীয় ভাষার বৈচিত্র্য এবং আদি বাংলা তথা চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণও করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

সামগ্রিক আলোচনার নিরিখে তাই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে, রাজবংশী ভাষা একটি পূর্বভারতীয় আর্য ভাষার শাখা বিশেষ, যার সংরক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ভাষাটির টিকে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

Corresponding author's email ID: sumanswarat@gmail.com

১. ভূমিকা:

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা দীর্ঘদিন ধরেই ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত। এই অঞ্চলের রাজবংশী বা কামতাপুরী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বহন করে আসছে প্রায় সহস্র বছর ধরে। রাজবংশী ভাষা একটি কথ্য ভাষা হিসেবে মূলত জনজাতীয় ও কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রচলিত হলেও, বর্তমানে বেশ কয়েক দশক ধরে তা ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই ভাষার মধ্য দিয়ে যেমন প্রতিফলিত হয় স্থানীয় মানুষের জীবনের নিজস্ব সংস্কৃতি, তেমনই এই ভাষার গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় বহুভাষিক যোগাযোগ ও ভাষা পরিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়া। ‘রাজবংশী’ ভাষাকে ‘কামতাপুরী’ ভাষা বলেন অনেকে। তার অনেক যুক্তি-প্রতিযুক্তি আছে। আমরা আপাতত সেই বিতর্কে না গিয়ে 'রাজবংশী' শব্দটিই ব্যবহার করছি।

এই ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাজবংশী ভাষা একদিকে যেমন বাংলার উপভাষার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তেমনই অন্যদিকে অসমিয়া, ওড়িয়া, নেপালি ও হিন্দি ভাষার প্রভাবও এর মধ্যে ক্রিয়াশীল। ফলে এটি একটি হাইব্রিড বা মিশ্র ভাষারূপে বিকশিত হয়েছে। গ্রিয়ার্সন মাগধী প্রাকৃতের চারটি ঔপভাষিক বৈচিত্র্যের কথা লিখেছেন। তার মধ্যে ‘কামরূপী’ প্রাকৃতের মধ্যে পূর্বী শাখাতে রয়েছে অসমিয়া, পশ্চিমা শাখাতে রয়েছে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বাংলা ও রাজবংশী।

২. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ:

বর্তমান প্রবন্ধে এই ভাষার বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে—যেমন রাজবংশী ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য, ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য এবং বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। সেই সঙ্গে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে রাজবংশী ভাষার সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিচার করে এর ভাষাগত অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় রাজবংশী বলতে আমরা মূলত পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবংশীর কথা বলছি। এই দুটি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত বিশদে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে আমরা এত তথ্য পেয়েছি, কোনো জেলা বা ব্লকের ভাষার নমুনা দিলে আমাদের তথ্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে তা কোন জেলার কোন ব্লকের ভাষা তা আজ আমরা নির্ণয় করতে সক্ষম। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী ভাষার কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহের রাজবংশীর বৈশিষ্ট্য আবার এই জেলাগুলির ভাষার থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। সে বিষয়েও আমরা প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছি। বর্তমানে সেই পরিসর নেই। সে প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

৩. গবেষণা পদ্ধতি:

এই আলোচনার মাধ্যমে রাজবংশী ভাষার একটি ভাষাতাত্ত্বিক আলেখ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যা কেবল ভাষার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যই নয়, বিভিন্ন জেলায় ভাষাটির আঞ্চলিক রূপভেদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে। এই প্রবন্ধ একদিকে ভাষাবিজ্ঞানের গবেষকদের জন্য একটি বিশ্লেষণধর্মী দলিল, আবার অন্যদিকে রাজবংশী ভাষার আত্মপরিচয়েরও এক গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে!

বিস্তৃত ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে আমাদের কাজে ভাষাগত তথ্য দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন পাশারুল আলম, দীনবন্ধু রায়, সুদেব দাস, বহ্নিশিখা পাত্র, হাসান আলি, বাপি দাস, মানস চক্রবর্তী, আবদুল হালিম, অজিত চাঁই, গণেশ দাস, দিলীপ দাস, রাজু বাগচী, তমা দত্ত, মাইকেল খান, সৌরভ দত্ত প্রমুখ। কাজটির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ কিছুটা অর্থ সাহায্য পেয়েছিলাম UGC, IISc, Bangalore এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে। এছাড়া কানপুর আইআইটি-র কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে নানান সাহায্য পেয়েছি। আরও একাধিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আমাদের সহায়তা করেছেন। সকলের নাম উল্লেখ করা আপাতত সম্ভব হল না।

৪. তাত্ত্বিক পটভূমি:

বাংলার আঞ্চলিক ভাষাগুলি সম্পর্কে পর্যপ্ত তথ্য পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়েছিলাম বত্রিশটি আঞ্চলিক ভাষায় এবং আংশিক অনুবাদ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলাম প্রায় আশিটি অঞ্চলের ভাষায়। এছাড়া গ্রীয়ার্সন-উল্লিখিত গল্পটি বিরাশিটি আঞ্চলিক ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে সমর্থ হয়েছিলাম। জলপাইগুড়ির মাদারিহাট-সংলগ্ন একটি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলাম যে রাজবংশী টেক্সটি তার থেকে ছোট একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করলাম। এই অঞ্চল থেকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির সম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদের সংগ্রহে আছে।

> ‘বাইষ্যার মাঝামাঝি।
>
> পদ্মাত চলেছে ইলিশ মাছ মারার মরসুম। দিন-আতি কুনোসমায় মাছ মারার কমতি নাই। সাঞ্জেরক্ষণ জাহাজঘাটিত দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকোত জোনাকীর মতন করি শও শও আলো জ্বলেছে।’

“পদ্মাত চলেছে ইলিশ মাছ মারার মরসুম।”—বাক্যটির গঠন লক্ষ্য করা যাক। “পদ্মাত”—এখানে মান্য চলিত বাংলা-অনুসারে অধিকরণে 'তে' এর বদলে অধিকরণে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ রাজবংশী ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সুকুমার সেন এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিহ্নিত করেছিলন।

এছাড়া ঘটমান বর্তমান কালে রাজবংশী ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, প্রথম পুরুষ ঘটমান বর্তমান মান্য চলিত বাংলায় যেখানে 'সে করছে' বলে, রাজবংশীতে তা 'উয়ায় করির নাইগছে' বলা হয়। 'করির নাইগছে' রাজবংশী ভাষার একটি পুনরাবৃত্ত বাক্যখণ্ড। এটি এই ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ marker। যেমন—

- সগায় য্যাং করি কামাই করির নাইগছে তুইও এইমতন কামাই করবু।

- অন্য কোন স্বাস্থ্য তহবিল হবার নাইগছে।

সাকল্যবাচক সর্বনাম, ব্যক্তি ও বস্তুবাচক সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়াবিভক্তির ক্ষেত্রে রাজবংশী ভাষার বেশ কিছু নিজস্ব লক্ষণ আছে। এই লক্ষণগুলি আবার জেলাগুলির বিভিন্ন ব্লকে বেশ কিছুটা আলাদা। এই বিষয়গুলি মূলত রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে পরে আসব। প্রথমে দেখা যাক রাজবংশী ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি।

আমাদের এই সীমিত পরিসরে প্রাথমিক কয়েকটি দিক আলোচনা করা সম্ভব। বিশদে যাওয়ার সুযোগ আপাতত নেই।

৫. আলোচনা:

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

- **ব্যঞ্জনাগম:** শব্দ মধ্যে যখন ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে ব্যঞ্জনাগম।
- **অনুস্বর-এর আগমন:** রাজবংশী ভাষায় কিছু কিছু শব্দের শেষে অনুস্বর এর অতিরিক্ত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

- শুনেছি > শুইনছোং, জানি > জানোং ইত্যাদি।
- মুই শুইনছোং ভারত থাকি আগের বছর সারে দশ লাখ টন অপরিশোধিত চিনি আমদানি কইরছে।
- মুই তো জানোং।
- চাইরটা ভাত খায়া অদি এ্যাকনা কড্ডা দিনুং।

তবে এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—এই অনুস্বরের (ং) আগম বিশেষত ক্রিয়া বিভক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়। সাধারণ বর্তমান, ঘটমান বর্তমান ও পুরাঘটিত বর্তমান কালে ক্রিয়া-বিভক্তি হিসেবে অনুস্বরের (ং) আগম দেখা যায়।

আদি-মধ্য বাংলায় সাধারণ সদ্য অতীত কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি ছিল ইলাঙ্ —ইলাম এবং প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি ছিল -ইল -ইলা ইত্যাদি। যেমন—উত্তম পুরুষ—

“সেই পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।”

—মুকুন্দ চক্রবর্তী

এই দিক থেকে আদি-মধ্য বাংলা ভাষার সাথে রাজবংশী ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে।

- **'য়'-এর আগম:** কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে অন্ত্যব্যঞ্জনাগম হিসেবে 'য়'-এর আগম লক্ষ করা যায়। যেমন—

- গোটা > গোটায়, বেচা > বেচায়, কহে > কয় ইত্যাদি।
- বাইর্ষা কাল নাইগলে গোটায় গেরাম জুড়ি ধান আবাদ করে হামার গেরামোত।

- **ছ > চ্ছ:** ক্রিয়াবিভক্তি শেষে থাকা 'ছ' কোচবিহারের রাজবংশী ভাষার অনেক ক্ষেত্রেই 'চ্ছ' রূপে উচ্চারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, "ধরছে" শব্দটি 'ধরচ্ছে' হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমন—

  - এবার যে বাইঘনের কেমন ফল ধরচ্ছে।
  - মুই মার কাছত যাবার ধইরচ্ছং।

- **'য-ফলা'-এর আগম:** কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ করতে অতিরিক্ত 'য' বা 'য-ফলা'এর আগমন লক্ষ করা যায়। যেমন—দেয় > দ্যেয়, সরিষা > সইরষ্যা ইত্যাদি। উদাহরণ:

  - হামারব একন্যা খাওয়ার জন্ত্যে সইরষ্যা গারছি।

- **মধ্যব্যঞ্জনাগম:** শব্দের ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় আমাদের জিহ্বা অসাবধানতাবশত দু'টি ধ্বনির মাঝখানে কোনো অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে ফেললে সেই প্রক্রিয়াকে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে। এইভাবে যে অতিরিক্ত ধ্বনিটি শব্দের মাঝখানে উচ্চারিত হয়ে যায় তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে।

- **কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'য-ফলা' কে 'র-ফলা' রূপে উচ্চারণের বিশেষ প্রবণতা রাজবংশী ভাষায় দেখা যায়।** যেম—খাদ্য > খাদ্র। উদাহরণ:

- কৃষিখাদ্যের মধ্যত পড়ে ধান, আলু, পিয়াজ, মরিচ এইগল্যা, এক কতায় হামরা যেইগল্যা আনাজ খাই সোগে কৃষিখাদ্র।

অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'য-ফলা' এর 'র-ফলা' রূপে উচ্চারণের বিশেষ প্রবণতা রাজবংশী ভাষায় দেখা যায়।

- **দ্বিত্বব্যঞ্জন:** উচ্চারণের সুবিধার জন্য তথা শব্দ-মধ্যস্থ কোন দল বা অক্ষরে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য বা শ্বাসাঘাত জনিত কারণে রাজবংশী ভাষার কোনো কোনো শব্দে শব্দ মধ্যস্থ অক্ষরে দ্বিত্বব্যঞ্জনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন—ঢেকে > ঢ্যাক্কে, সাজিয়েছে > সিজ্জাইছে, চাকা > চাক্কা ইত্যাদি। উদাহরণ:

- ছাগোলের খোপরাৎ দড়ি খুলি দিয়া ভিৎরা ঢ্যাক্কে যুই আদুবোরখানসা পেথুল পৈল সৈন্ধ্যাতে।
- ঘরোৎ সিজ্জাইছে তিন বেটা অ্যাক বেটি।

➢ রাজবংশী ভাষায় চ্, জ্, স্ / শ্ যথাক্রমে ৎস্, জ্, হ্ হয়। যেমন—চংচঙা, চকচক, চমচম, চাইছং, চিল্লায়তাছস, চলাইছি, চলাইতাছি, চালাইছে, চারাইছে, চৈরবে, চইলবে—শব্দগুলিতে 'চ' এর উচ্চারণ 'ৎস' এর মতো হয়। উদাহরণ:

- চেংড়িগুলা এইবার মুখ টিপি হাসির নাগিল।

➢ **আদি ব্যঞ্জনলোপ:** শব্দের আদিতে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোপ পেয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন— রং > অং, রাঁধা > আন্দা ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- ডালিয়া সাদা, নাল অংয়ের হয়।
- আনাজোক ভাল মতন করি ধুয়া আন্দা ভাল।

আদিব্যঞ্জনলোপের এই দৃষ্টান্ত শেরশাবাদিয়া ভাষাতেও দেখা যায়, ফলে শেরশাবাদিয়া ভাষার সাথে রাজবংশী ভাষার সাদৃশ্য এক্ষেত্রে অনেকটাই রয়েছে। যেমন: রন্ধন > রান্ধা > আঁন্ধা।

উদাহরণ:

- আইজ কী আঁইন্ধ্যাছো?

➢ **অন্ত্যব্যঞ্জনলোপের দৃষ্টান্ত:**

শত শত > শও শও।
শও শও আলো।

➢ **মধ্যব্যঞ্জনলোপ:** দ্রুত উচ্চারণজনিত কারণে শব্দ মধ্যস্থ কোন ব্যঞ্জনধ্বনির লোপের দৃষ্টান্ত শেরশাবাদিয়া ভাষার মতো রাজবংশী ভাষাতেও দেখা যায়। যেমন: জায়গা > জাগা।

➢ **ধ্বনির রূপান্তর:**

➢ **মূর্ধন্যীভবন:** 'ঋ', 'র্', 'ষ্' এবং ট্', 'ঠ্', 'ড্' প্রভৃতি মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোনো দন্ত্যধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইত্যাদি) যদি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে মূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন—কোথায় > কোটে, যেথায় > যোটে।

উদাহরণ:

- কোটে গেইছিস।

এই প্রক্রিয়ায় দন্ত্যধ্বনিগুলি মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এটি কিছু উপভাষায় দেখা যায়।

- যেমন: শেরশাবাদিয়া ভাষা: কোথায় > কুষ্ঠে, যেথায় > যেঠে।

- **ঘোষীভবন:** সাধারণত বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমধ্বনি, য়্, র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ় এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হলো সঘোষ ধ্বনি। আর অন্য ধ্বনিগুলি অঘোষ ধ্বনি। কোনো সঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি যদি সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে বলা হয় ঘোষীভবন। যেমন—ঝক্‌ঝকে > ঝগ্‌ঝগা, জাক > জাগ, সাথে > সুদে ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- বড়ো গাড়িগুল্যা দিয়া ডাঙাইলে ধানোত ঝগ্‌ঝগা হয়।
- হামরা একদিন ধান জলোত জাক দিয়া পড়ে জল থাকি ধান ছেকি।
- ফণি তোর সুদে মোর অ্যাকনাকতা আছে।

- কখনো কখনো পদান্তে অবস্থিত একক অঘোষ ধ্বনি সঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় একে স্বতোঘোষীভবন বলা হয়। যেমন—কাক > কাগ, লোক > লোগ।

- কিন্তু এরকম ঘোষীভবন সর্বক্ষেত্রে হয়না। যেমন—শোক, হাত।

তবে এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের রীতির সাথে শেরশাবাদিয়া ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন:

- ছাদ > ছাত (অঘোষীভবন),
- শোক > শোগ (ঘোষীভবন),
- নখ > লোগ (ন > ল, খ > গ, ঘোষীভবন)।

- **অঘোষীভবন:** ঘোষীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া অঘোষীভবন। ঘোষধ্বনি অঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হলে সেই প্রক্রিয়াকে অঘোষীভবন বলে। যেমন—মকুব > মকুপ।

উদাহরণ:

- কৃষাণ গুলা যেইগল্যা ঋণ দ্যেয় তা মকুপ করি দিয়া সরকার ভর্তুকি ভরে।

- **অল্পপ্রাণীভবন:** মহাপ্রাণ বর্ণ যদি অল্পপ্রাণ রূপে উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায় তবে তাকে অল্পপ্রাণীভবন বলে। 'ক থেকে ম' পর্যন্ত ২৫টি স্পর্শ বর্ণের প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ (ক, গ, চ, জ, ট, ড) অল্পপ্রাণ, এবং দ্বিতীয় (খ, ঘ, ছ, ঝ) ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ। কোচবিহারের রাজবংশী ভাষায় এই মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ রূপে রীতি দেখা যায়। যেমন: বেঁধে > বান্দি, রাখে > রাকে, বাঘ > বাগ ইত্যাদি।

- এই বিশেষত্ব শেরশাবাদিয়া ও সূর্যাপুরী ভাষাতেও দেখা যায়। যেমন: বাঘ > বাগ, মেঘ > মেগ।

উদাহরণ:

- মাটিত পোতেয়া রাকে।

- **মহাপ্রাণীভবন:** অল্পপ্রাণ বর্ণ যদি মহাপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হয় তবে তাকে মহাপ্রাণীভব বলা হয়। এই রীতির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় রাজবংশী ভাষায়। যেমন—এঁটেল > আইঠাল।

উদাহরণ:

- কুইশাল আইঠাল মাটিতে ভালো হয়।
  আনধার্/আন্ দার; এখেটা/একেটা; লাঠি/নাঠি; এঠে/এটে।

➢ **নাসিক্যীভবন:** কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন (ঙ, ঞ, ণ, ন্, ম ইত্যাদি) যদি ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ লোপ পায় এবং তার রেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা অনুনাসিক অনুরণন যোগ হয়। তবে সেই প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন:

- পঞ্চ > পাঁচ, দন্ত > দাঁত, পঞ্চবিংশ > পঁচিশ।

➢ **নাসিক্য ধ্বনির আগম:**

তবে কখনো কখনো নাসিক্য ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি শব্দ মধ্যস্থ কোন স্বরের অনুনাসিক উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায় বা অতিরিক্ত কোন নাসিক্য ধ্বনির আগম দেখা যায় কোচবিহারের রাজবংশী ভাষায়। মৌলিক স্বরধ্বনি কখনো কখনো অনুনাসিক হয়ে 'ঙ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন:

- কও > কঁও, কঙ্
- মুই কঙ্ তুই এ্যালায় বাড়ি যা।
- কেউ কাউকে > কাঙো কাঙোকে, তা-ও > তাঙ ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- তাও কাঙো কাঙোকে হ্যেকড্যেকেও ফ্যেলায় না।

➢ **এই ভাষায় উচ্চারণের সময় য় ধ্বনি কখনও কখনও আনুনাসিক হয়ে ঞ রূপে উচ্চারিত হয়।** যেমন-

- পেয়ে > পাঞা, হয়ে > হঞা ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- ব্যাটা বাপের সয়সম্পত্তি পাঞা ধ্বনি।
- গাবুয়ার ডাঙার ঢুলানির সুদে বগলের গেরামের ভ্যেলেঙের খালি সাগাই হঞা গেরামের সাগাই ফান্দিচে তায় বোল নোঞায়।

অনুনাসিক ব্যঞ্জন হিসেবে 'ঞ' এর বহুল ব্যবহার আদি বাংলা তথা চর্যাপদের ভাষাতেও দেখা যায়, এমনকি আদি-মধ্য বাংলা ভাষা তথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ভাষাতেও দেখা যায়। এই দিক থেকে আদি-মধ্য বাংলা ভাষার সাথে রাজবংশী ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে।

- **স্বরাগম:** যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্যে বা তার উচ্চারণের কর্কশতা কমিয়ে তাকে মধুর করার জন্যে আমরা যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি এনে যোগ করি। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে এইভাবে স্বরধ্বনির আবির্ভাবকে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে।

- উচ্চারণের সুবিধার জন্য এই ভাষায় কখনও কখনও শব্দের মধ্যে ও, উ-এর আগমন লক্ষ করা যায়। যেমন—পায়ের > পাওয়ের, যাক > যাউক ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- হামার হাতর তালার থাকি পাওয়ের তালা মজবুত হয়।
- ব্যাগল উনার ঘরক বড়ো করি তোলে ইদি ভাইবৈনির ঘর কোটে ভাসি যায় যাউক।

এক্ষেত্রে একক তথা মৌলিক স্বরধ্বনিকে যৌগিক রূপে উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন: পায়ের > পাওয়ের শব্দে 'প' এর পরে 'আ' মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে ছিল, কিন্তু 'পাও' শব্দাংশে 'আও' যৌগিক স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। আবার যাক > যাউক, এই উদাহরণেও 'আ' মৌলিক স্বরধ্বনি 'আউ' যৌগিক স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

➢ **মধ্যস্বরাগম:** - উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যে মধ্যস্বরাগম হিসেবে ‘ই’- এর আগমন এই ভাষায় বিশেষভাবে লক্ষনীয়। যেমন-

- যেটা > যেইটাক, হল > হইলেক, বদলাচ্ছে > বদলাইছে; ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- আবহাওয়া বদলাইছে বলি ম্যালা রকমের আবহাওয়া হিসাবে ম্যালা রকমের আবাদ হবার লাগাইছে
- ইনার এমন অবস্থা হইলেক।
- এক ধরনের খাবার যেইটাক গছ্ থাকি পাওয়া যায়।
- ধাইষ্যার মাঝামাঝি।

অন্যদিকে পদমধ্যস্থ 'ই' ধ্বনির আগম রাজবংশী ও জলপাইগুড়ির ভাষার পাশাপাশি শেরশাবাদী ভাষাতেও এই বিশেষত্ব দেখা যায়। যেমন-

- আইজ, কাইল, চাইল, ডাইল প্রভৃতি।

তবে 'যেইটাক' ও 'হইলেক' পদদ্বয়ের পদান্তে যে 'ক' স্বার্থিক প্রত্যয়ের আগম দেখা যায় সেটা ঝাড়খণ্ডী উপভাষা তথা পুরুলিয়ার ভাষাতেও দেখা যায়। যেমন: হবেক, যাবেক, আইসবেক প্রভৃতি। এই দিক থেকে রাজবংশী ভাষার সাথে উক্ত উভয় ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে।

- ➢ বিশেষভাবে লক্ষনীয়, জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষায় বাক্যে 'ঠাইল' যেটি কোচবিহারের রাজবংশী ভাষায় 'ডাইল' রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

- গছের ঠাইলটাত একেনা টিয়া পখি বসি আছে। (জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষা)
- গছের ডাইল কিনাত একেনা টিয়া পখি বসি আছে। (কোচবিহারের রাজবংশী ভাষা)

- ➢ **অপিনিহিতি:**

শব্দ মধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' ধ্বনি যদি তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির আগেই উচ্চারিত হয় তবে তাকে অপিনিহিতি বলা হয়। 'অপি' শব্দের অর্থ পূর্বে এবং 'নিহিতি' শব্দের অর্থ অবস্থিত। ধ্বনি পরিবর্তনের এই বিশেষত্ব রাজবংশী ও জলপাইগুড়ির ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে শেরশাবাদিয়া ভাষায় ও বঙ্গালী উপভাষাতেও এই ধরনের উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, "আজি" শব্দটি 'আইজ' এবং "আসি" শব্দটি 'আইসি' হিসেবে উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ:

- তুই ন্যা সেদিন কোচবিহার গেলি আইজক্যা আবার ক্যা যাইস?
- আইজ হামার বাড়িত মরুচ ছিড়া যে কাম নাগিসে তোমাক কাহোয় সমতি দিবার নাহয়।"
- আইজ কাইল মধ্যে মধ্যে এল্যাওইনা জেলে পাড়াত যাওয়া আইসি করে।

শেরশাবাদিয়া ও বঙ্গালী উপভাষায় এমন অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত হল- পড়িয়া > পইড়্যা, দেখিয়া > দেইখ্যা,

- আসিয়া > আইস্যা, বলিয়া > বইল্যা প্রভৃতি।

- ➢ **স্বরলোপ:**

- ➢ **অন্ত্যস্বরলোপ:** স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায়ই শব্দের শেষেরদিকে শ্বাসের জোর কমে আসে এবং শব্দের শেষে অবস্থিত স্বরধ্বনি ক্ষীণ উচ্চারিত হতে-হতে শেষে লোপ পায়। যেমন—

- আমাকে > মোক; আপনাকে > আপনাক;
- উনাকে > উনাক; কাকে > কাক; ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- উনাক মাসি কয়, বৈসেক ভালা।

- ➢ **মধ্যস্বরলোপ:**

দ্রুত উচ্চারণজনিত কারণে শব্দ মধ্যস্থ স্বরধ্বনির লোপ যেমন মান্য চলিত বাংলা ভাষায় দেখা যায়, তেমন দৃষ্টান্ত জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষাভাষী মানুষের উচ্চারণেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, "গাছ" শব্দটি 'গছ' এবং 'আলাদা' শব্দটি ''আলদা' হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমন-

- আলাদা > আলদা, গাছ > গছ।

উদাহরণ:

- গছ্ থাকি পাওয়া যায়।
- আলদা গাওয়ের নৌকা।

➢ ও' কখনো কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কোন্ > কুন্, তোমার > তুমার, তোমারা > তুমারা

- আচ্চা তুমরা যে বন্দন থাকি নোন কৈরচেন এইটার সুদ বেশি না এইললা ব্যাঙের সুদ বেশি?

এছাড়া অন্যান্য উদাহরণ-

- কুম্পানি, কুতো: কেন্দোরো সরকার কতো শহোরের কুম্পানিক এই সউগ নোনের ব্যাবসা কৈরার জ্ইন্যে ট্যাকা দিবে জানিস?
- কুনোদিনো: কাকা, জ্যাটো তোমরা কুনোদিনো সরপোটেলের তকাই খাইচেন।
- কুনোকিচুই: এ মানষির ছাগলের অইত্যাচারের জইন্যে কুনোকিচুই আবাদ করা যায় না।
- সুজা: এত সুজা না।

- **প্রগত স্বরসংগতি:**

এই ভাষায় কিছু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে পরস্পর ধ্বনিসাম্য লাভ করে বা সান্নিধ্য লাভ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন:

- মিশে > মিশি, চিন্তা > চিন্তি প্রভৃতি।

উদাহরণ:

- তামানলায় রায় বর্মণ হঞা রাজ বংশীর সুদে মিশি গেইচে।
- আইশালা ভাবিচিন্তি কয়!

➢ এই ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'এ' ধ্বনির স্থানে 'আ' এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

- উদাহরণস্বরূপ, 'হয়ে' শব্দটি 'হয়া' এবং 'পেয়ে' শব্দটি 'পায়া' হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমন:

  নিয়ে > নিয়া, হয়ে > হয়া।

উদাহরণ:

- এ্যাকেনা চাঙারি নিয়া বিচন তুলির যাবার কইস।

- এবার মানষিটা মরুচের দাম কনেক ভাল পায়া মানষিটায় নাল হয়া গেল।

➢ **'ন' এর স্থানে 'ল' ব্যবহার এই ভাষার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।** যেমন-

- লাগে > নাগে, লকলকে > নকনকে

উদাহরণ:

- ভালে নাগে না।
- গছ তারাতারি নক্‌নকা হয়্যা ওঠে।

'ন' কে 'ল' রূপে উচ্চারণের প্রবণতা শেরশাবাদিয়া ভাষাতেও দেখা যায়, এই দিক থেকে শেরশাবাদিয়া ভাষার সাথে রাজবংশী ভাষার বিশেষ ভাবে তুলনীয়। যেমন:

- নদী > লোদ্দী, নিশ্চিত > লিচিন।

উদাহরণ:

- এই গরোমে লোদ্দিতে গা ধুইয়্যাও লিচিন নাই।

- **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**
- **নির্দেশক:**

নির্দেশক হিসেবে ‘না', ‘কেনা', ‘কোনা' এর ব্যবহার এই ভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন:

কত্‌কোনা, কতোকোনা, এ্যাকনা, পাঁচকনা।

উদাহরণ:

- মোক্ এ্যাকনা গুয়া আনি দ্যাওতো।
- পাঁচকনা ভাই আর পাঁচকোনা বৈনি।
- কৎকোনা বয়স হৈবে নিসাদুর যে বয়স বছরের হিসাবৎ হয় না।
- এ্যাইক্’না জিনিষ মোকে নাইগ্’বে।

বহুবচন নির্দেশক:

- কোচবিহারের ভাষায় নির্দেশক সহযোগে সর্বনাম পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। বস্তুবাচক পদে বহুবচন নির্দেশক হিসেবে 'গুলি', ‘গুলো, ‘গুলা' স্থানে 'লা/ ল্যা/ গল্যা ' নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন:

- এইলা, ঐগেলা, ঐলা, অতলা, অতুলা।

উদাহরণ:

- একঝনে এইলা আবাদ কৃষি সামলা বিশাল তাল।

- ফোন পে এইগল্যা দিয়া পাইসা পাঠানি যায়।
- যেইগল্যা খাবার আগোতে বোনানি থাকে ওইগল্যারে ফর্দি।
- নাউ, আলু, কফি এইগল্যাত ম্যালা ওষুধ দেওয়া নাগে।
- তোক্ কনুং এ্যাকেটা আনেক, তুই এ্যাকেরে অতুলা আলু।
- বিচনের ধানগুলা এ্যাকভাও করি শুকির দ্যাও।

➢ **ব্যক্তিবাচক বহুবচন নির্দেশক** হিসেবে গুইলা/ গল্যা ' নির্দেশক অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়। যেমন:

- আমরাগুইলা, তোমরাগুলা।

উদাহরণ:

- ফেলি দেওয়া শরস্যা দিয়া আমরাগুইলা সার বানাং
- তোমরা গুলা কি কোন দিন ঝড়ি হবার পরে নালাতকা পর বিছিয়া গুরা মাছ ধরচ্ছেন।

➢ **সর্বনামীয় সাদৃশ্যবাচক পদ:**

সর্বনামীয় সাদৃশ্যবাচক পদ ব্যবহারের কোচবিহারের ভাষায় একটা দারুন বৈচিত্র্য দেখা যায়, যা অন্য ভাষায় খুব কমই চোখে পড়ে। যেমন:

- 'মতো' অর্থে 'নাখা, নাখাতি প্রভৃতি।

উদাহরণ:

- আগের মাসোতে না ঐনাখা জামা কিনলু আবার ঐনাখা জামা কিনির চাবার নাগছিস?
- মুই ঐ নাখাতি চ্যোংড়ি খুজির নাইগছোং বেটার বাদে।

➢ **দূরত্ববাচক সর্বনাম:**

দূরত্ববাচক সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে নেতিবাচক অব্যয় সর্বনাম পদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বসে। যেমন:

- ঐঠেকেনা (ঐখানে না), ঐঠেনা (ঐখানেই না), ঐঠেকেনায়(ঐখানটায়) প্রভৃতি।

উদাহরণ:

- মুই ঐঠেকেনারে মানষি কি হইছে কন মোক?
- উমার বাড়ির ঐঠেকেনায় পুজার প্রসাদ দিছে।
- ঐ যে ঐঠেকোনায় মোর ঘর।

➢ **পুরুষবাচক সর্বনাম:**

- পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের প্রথম পুরুষের একবচনে সাধারণ অর্থে 'উয়্যা (সে) সম্মানার্থে 'উনায়'(তিনি) আবার বহু বচনে সাধারণ অর্থে ও সম্মানার্থে 'রা' এই একই নির্দেশকের ব্যবহার করা হয়, এক্ষেত্রে তেমন বৈচিত্র্য নেই। যেমন-

- উমরা (তারা/তাঁরা) আবার তুচ্ছার্থে বা স্নেহার্থে তুই সর্বনাম পদের ব্যবহার দেখা যায়।
  এই জেলার স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় প্রথম পুরুষ বাচক সাধারণার্থক সর্বনাম রূপে একবচনে- উয়ায়, উঞায় ইত্যাদি এবং বহুবচনে- উমরা, উমা, উমরালা, উমরাগিলা, উমরাগুলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ:

- উমার দোকানোত আছং।
- উমাক বিচিগুল্যা ফেরত দে।
- অন্যদিন উনায় উনার হাঁস জলোত ছাড়িয়া দিয়া চলি যায়।
- উমরা মানষির থাকি পাইসা নিয়া বা বড় মাইনশির থাকি ট্যাকা মারি মাগনায় মানষীর চিকিৎসা করে [কোচবিহার, ৭৩৬১৩৪]

জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত 'ইমা 'কোচবিহারে রাজবংশী ভাষায় 'এমা' রূপে ব্যবহৃত হয়।

- যেমন - ইমাক ধরি সংসারত ক্যাচালে সার। (জলপাইগুড়ির রাজবংশী)।
- এমাক ধরি সংসারত ক্যাচালে সার। (কোচবিহার রাজবংশী)।

> ➢ **প্রশ্নবাচক সর্বনাম:**

যে সর্বনামপদে কোনোকিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে তাহাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে। প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে কোচবিহারের ভাষায় বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন: কায় (কে), কাকো (কাকে), কতো, কাক, কইকন্যা, ক্যানে, কোনবেলা, ক্যাংকরি।

উদাহরণ:

- ক্যাংকরি করি যে যাও?
- ক্যাংকরি যে ঐ কাথাটা উমাক বলি?
- মুই এল্যা কাক দুষিম?

➢ **উত্তম পুরুষে সর্বনাম**:

উত্তম পুরুষে সর্বনাম পদের আদিতে যেখানে 'আ' থাকে সেখানে 'হ'-এর আগম দেখা যায় এই ভাষায়। যেমন:

- আমাকে > হামাক, আমরা > হামরা।

উদাহরণ:

- হামারগুলার থাকি উপকার পাবু।
- হামার ভিতরা ঠাকুর আছে।

সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে শেরশাবাদী ভাষা ও রাজবংশী ভাষার মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে তা হল- উত্তম পুরুষে সর্বনাম পদের আদিতে যেখানে 'আ' থাকে সেখানে গিয়ে 'হ' এর উপস্থিতি দেখা যায় যা কোচবিহারের ভাষার সঙ্গে সমন্বিত।

জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষার বাক্যে ব্যবহৃত 'হামার' কোচবিহারের রাজবংশী ভাষায় 'আমার' রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

- হামারলার বাড়ি হইল জলপাইগুড়ি জেলাত। (জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষা)
- আমারলার বাড়ি হইল কোচবিহার জেলাত। (কোচবিহারের রাজবংশী ভাষা)

যেমন:

- আমি > হামি, আমাকে > হামাকে, আমার > হামার।

উদাহরণ:

- হামি কাইল বাড়ি যাব।
- হামার সোঁতে যাইও তুমি।
- হাঁমাকে কাইলি পরীক্ষ্যা লিতে হৈবে।

➢ **কোচবিহারের ভাষায় কখনও কখনও উত্তম পুরুষের একবচনে মুই, মোর এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।**

উদাহরণ:

- পারসিত চিনি ককিকয় মুই জানোংনা।
- মোর দাদাক পুচকইরলে জানির পাইম উয়্যা জানে।

➢ **ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম:**

যে সর্বনামে কোনো ব্যক্তিকে বুঝায়, তাহা ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম। পুরুষ বাচক সর্বনাম পদে প্রথম পুরুষের 'উম'-নিষ্পন্ন পদের বহুল ব্যবহার কোচবিহারের ভাষায় দেখা যায়। যেমন: উম্যা, উমহা, উম্যরা, উমহরা প্রভৃতি।

- উমার জন্যে এত খাইটছোং।

➢ **সাধারণ মধ্যম পুরুষ:**

রাজবংশী ভাষায় সাধারণ মধ্যম পুরুষে তুই, তোর ইত্যাদি ব্যবহার রয়েছে। যেমন–

- তুই কি ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট চেক করিসিত।

➢ **সম্মানসূচক মধ্যম পুরুষ:** রাজবংশী ভাষায় সম্মানসূচক মধ্যম পুরুষে তোমরা, তোমার লাক, ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে।

উদাহরণ:

- তোমার লাক অটল পেনশন যোজনা নিবার বাদে ব্যাঙ্কত অ্যাকাউন্ট খুলির নাগে।

➢ **অবজ্ঞাসূচক মধ্যম পুরুষ:**

রাজবংশী ভাষায় অবজ্ঞাসূচক মধ্যম পুরুষে তুই তোক ইত্যাদির ব্যবহার আছে।

- যেমন – তুই এটে জিৎ করি বসির।

➢ **পুরুষবাচক সর্বনাম পদে গৌণকর্ম:**

- বাংলা ভাষায় পুরুষবাচক সর্বনাম পদে গৌণকর্মে 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে কেবল 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- আমাকে > হামাক (জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষা), আমাকে > আমাক (কোচবিহারের রাজবংশী ভাষা), তাকে > উমাক, ইনাকে > ইমাক, তোমাকে > তুমাক ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- তোক না না কইরছোং বেশি কতা কবু না।
- মোক ছাড়া উমার চলবার নয়।
- প্রতিদানে রাসু যে উমাক কিছুই দিবার পায়না সেইটাও খুবে সুস্পষ্ট।

➢ **নৈকট্যবাচক সর্বনাম:**

নৈকট্যবাচক সর্বনাম পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন:

- এইঠেনা, এইঠেকেনা, এইঠেকার, এইনাখা, এইনাখাতি, এইনং, এত্তি, এত্তিকোনা, এত্তিনা প্রভৃতি।

উদাহরণ:

- তুই এটে জিৎ করি বসির।
- মুই খালি এইঠে যাইম আর আসিম।
- মুই এইঠেকারে মানষি কী হইছে কন মোক?

➢ **সাপেক্ষ-সূচক সর্বনাম:**

একটি সর্বনাম পদের সাপেক্ষে যদি অন্য আরেকটি সর্বনাম পদের ব্যবহার দেখা যায় এবং সেগুলো প্রায় একে-অপরের সাপেক্ষেই ব্যবহৃত হয় তবে সেগুলোকে সাপেক্ষ সূচক সর্বনাম পদ বলা হয়। যেমন: যার-তার, ইমার-উমার, ইমাক- উমাক, ইয়ায়-উয়ায় প্রভৃতি।

উদাহরণ:

- ইয়ায়-উয়ায় দুই ভাই হবু।
- যারে তারে সগোত এনং করি ঝগড়া করার পারং না।

➢ **নির্দেশক:** যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, তাহাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। নির্দেশক হিসেবে কেনা, কোনা –এর ব্যবহার এই ভাষায় লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ:

- স্যার পেটুর ঘর পাঁচকনা ভাই আর পাঁচকোনা বৈনি।

➢ **যৌগিক সর্বনাম:**

- একাধিক সর্ব'নামপদের সংযোগে গঠিত কোনো যৌগিক পদ যখন অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে' বসে, তখন তাহাকে যৌগিক সর্বনাম বলে। যেমন: কৎকোনা, সোগকিছু।

উদাহরণ:

- কৎকোনা বয়স হৈবেনি সাদুরযে বয়স বছরের হিসাবৎ হয় না।

➢ **সাকল্যবাচক সর্বনাম:**

যে সর্বনামপদ সমষ্টিবাচক ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে সাকল্যবাচক সর্বনাম বলে। যেমন: সোগ, সোগকিছু, সগায়।

উদাহরণ:

- ধৈর্য্য ধর সোগে হইবে।
- চীন দেশত সোগথাকি বেশি হয়্যা থাকে।
- সগায় আইসো।

➢ **স্বকর্তৃকজ্ঞাপক সর্বনাম**: যে সর্বনামে কাহারও সাহায্য না লওয়ার ভাবটি বিশেষ জোরের সঙ্গে বুঝানো হয়, তাহাকে আত্মবাচক বা স্বকর্তৃকজ্ঞাপক সর্বনাম বলে। যেমন: নিজ, নিজে, নিজেদের ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- নিজের একাউন্ট থাকি টেকা বির করা যায়।

- সর্বনামপদ শুধু যে বিশেষ্যপদের পরিবর্তে বসে তাহা নয়, বাক্যাংশ বা একটি সমগ্র বাক্যের পরিবর্তেও প্রযুক্ত হয়।

উদাহরণ:

- কাণ্ড কি ইনা তোর দেখির প্রয়োজন নাই। সেইটা হামরা জানং। তোমার পাপতে সোগ হবার নাইগছে।

এখানে 'সোগ' সর্বনামটি পূর্ববর্তী সমগ্র বাক্যটির পরিবর্তে প্রযুক্ত।

- **অন্যাদিবাচক সর্বনাম:** অন্য, অপর, অমুক প্রভৃতি কয়েকটিকে অন্যাদিবাচক সর্বনাম বলে।

উদাহরণ:

- অন্য সগায় আলোচনা চালু কইরলে।

- **বচন:**
- **একবচন:** রাজবংশী ভাষার একবচনে -টা, -খান ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। যেমন–

- বাউ যেমোর ব্যাঙ্কের পাসবুকখান কোরেথু সে খুঁজি পাছোনা।

- **বহুবচন:** রাজবংশী ভাষার বহুবচনে -লা, -মেলা ব্যবহৃত হয়।
- ' ইলা' প্রকল্পলা হালুয়ালার বাদে সরকারের পাক থাকি চালু হুসে।

- **রাজবংশী ভাষার প্রত্যয়:**

  - ইল > ইলেক। যেমন –

  হইল > হইলেক, দেখল > দেইখলেক, গিয়েছিল > গেইছিলেক, বানিয়েছিল > বানাইছিলেক।

উদাহরণ:

- ঘরত যাইয়্যা বইসেক।
- নবীন কইলেক।

- **নিশ্চয়ার্থক প্রত্যয়:**

জোর দিয়ে বলার জন্য মান্য কথ্য বাংলায় যেখানে 'ই'-প্রত্যয় ব্যবহার হয়, রাজবংশীতে সেক্ষেত্রে 'য়'-প্রত্যয় ব্যবহার হয়। যেমন-

- সগায় আইসো।
- উয়ায় করির নাইগছে।

➢ **ক্রিয়াবিশেষণ:**

রাজবংশী শব্দভাণ্ডারের নিজস্বতার তাৎপর্যপূর্ণ অংশ লুকিয়ে আছে রাজবংশী ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয়ের প্রয়োগে। আমাদের বিপুল সংগ্রহ থেকে কয়েকটিমাত্র ক্রিয়াবিশেষণ দেওয়া হল। আমাদের অভিধান প্রকাশ পেলে আরও অসংখ্য তথ্য সহজলভ্য হবে।

কাইরি	জোরে ঘন ঘন টানা,	to work with excessive force.
কাউসি	ক্রমাগত, উপর্যুপরি,	repetitive insistence, effort.
খন্ খন্	অতিদ্রুত,	fast movement.
খন্তেক, ক্ষন্তেক	ক্ষণকালের জন্য,	for a while.
খম্কায়	অবশ্যই,	without fail.
খাড়ায়, খারায়	দ্রুত, শীঘ্র,	sooner than expected, sudden, at once.

● **অব্যয়:**

রাজবংশী ভাষায় স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অব্যয়ের বিচিত্র সমাহার আছে। আমাদের অপ্রকাশিত রাজবংশী শব্দের অভিধান থেকে কয়েকটি বিশেষ রাজবংশী অব্যয়ের অর্থসহ নমুনা দেওয়া হল।

এইতানে	এই কারণে, ইহার জন্য,	Owing to.
এই তাবৎ, এ তাবৎ	এই পর্যন্ত,	Till now.
কিটির কাটার	দেহাভ্যন্তরে বেদনা বা চুলকানি বিশেষ,	Stinging sensation inside the body, itching.
খমস্	কর্কশ শব্দ,	A harsh sound.
খড় মড়ু	শুষ্ক তৃণাদির মধ্যে বিচরণের আওয়াজ,	Rustling sound.
খাচ্চাউ	নরম জিনিস এককোপে কাটার শব্দ,	A sound of cutting some vegetable or soft tree.
খুলবুল	মনের একপ্রকার অবস্থা, উদ্বেল,	An excited state of mind to express something.
ঘাপাৎঘুপুৎ	মাঝে মাঝে	Occasionally, at times.
চাটাং-চাটাং, চ্যাটেং-চ্যাটেং	ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা,	Use of hard hitting or unpleasant words.
চায়া	চেয়ে,	Than

➢ **ক্রিয়াবাচক পদ:**

রাজবংশী ভাষার নিজস্ব কিছু ক্রিয়াবাচক পদের নমুনা তুলে দিলাম আমাদের অভিধান থেকে।

উথলা	উথলে পড়া,
উদিস, উদ্দিস	খোঁজ খবর করা,
উষা	সিদ্ধ করা,
উষুম	ডিমে তা দেওয়া,
উপতন হওয়া	জন্ম হওয়া,
উজ্জা, উবজান	জন্ম হওয়া,
উবা	পরিবহন করা,
উবুরা, উভুরা	দড়ির পাক খুলে যাওয়া
উষা	সিদ্ধ করা,
উসটা খাওয়া	হোঁচট্ খাওয়া,
ওকা	বমনের উদ্রেক হওয়া,
ওগলা	বমি করা,
ওচলা	ওপরে ওপরে পরিস্কার করা,
ওছা	বিছানো,
ওদলা, কদলা	মাটি খনন বা আলগা করা,
ওদা	অরুচি হওয়া,
ওদোরা	কোনও বস্তুর অংশ বিশেষ ভেঙে যাওয়া,
ওনে যাওয়া	সতেজ ভাব হারানো,
ওলা	উনুন থেকে নামানো,

- **বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**
- **বাক্য গঠন:**

কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া: এই প্যাটার্নে বাক্যের গঠন সাধারণত বিষয় + বস্তু + ক্রিয়া অনুসরণ করে।

উদাহরণ:

- মুই ভাই খাইম (আমি ভাত খাব)।

একটি ছকের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করছি।

রাজবংশী বাক্য	কলকাতার স্থানীয় কথ্য বাংলা
ক) মুই ভাই খাইম	আমি ভাত খাব
খ) মুই ভাই খাইম	আমি ভাত খাব

গ) মুই ভুইয়োত জল দিবার নাইগছোং	আমি জমিতে জল দিচ্ছি
ঘ) মুই/হামরা জল আনির যাবার নাইগছোং	আমি/ আমরা জল আনতে যাচ্ছি
ঙ) তুই/তোমরা গাও ধুইছেন	তুমি / তোমরা স্নান করেছো
চ) হামরা/মুই মাছ মারির যাং	আমরা / আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি
ছ) উমরা রোয়া গারির গেইছে	ওরা ধান লাগাতে গেছে

কর্ম + ক্রিয়া + কর্তা:

এই প্যাটার্নে বাক্যের গঠন সাধারণত বিষয় + বস্তু + ক্রিয়া অনুসরণ করে।

উদাহরণ:

- "টেকা দিবার চাইছিলুং হামরাও" (টাকা দিতে চেয়েছিলাম আমিও)।
- **কর্তৃবাচ্য:** এই প্যাটার্নে বিষয় বাক্যের শুরুতে আসে, পরে ক্রিয়া।

উদাহরণ:

- "মুই ভুইবাড়ি য্যাং" (আমি জমিতে যাচ্ছি)।

- **কর্তৃবাচ্যে**

রাজবংশী কথ্যভাষায় কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষ্য কর্তৃপদ রূপে প্রথমে বসে এবং কর্ম ও ক্রিয়া এর ক্রমানুযায়ী বসে। এ অঞ্চলের স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর হিন্দু ও মুসলিম এবং দাস জনগোষ্ঠী ও রঙপুর সীমান্তের জনগোষ্ঠীর কথ্য বাংলায় কর্তৃবাচ্যের গঠন রীতির মোটামুটি মিল রয়েছে।

কর্তৃপদ বিশেষ্য

রাজবংশী বাক্য	কলকাতার স্থানীয় কথ্য বাংলা
ক) মুই ভুইবাড়ি য্যাং	আমি জমিতে জাচ্ছি
খ) চ্যোংড়াটা ম্যেলাদিন হইলেক চলি গেইছে	ছেলেটা অনেক দিন হল চলে গিয়েছে
গ) গরু গুল্যা খ্যেড় খাবার নাইগছে	গরু গুলো খড় খাচ্ছে
ঘ) কুত্তাটা কি কামড়াইছে	কুকুরটা কি কামর দিয়েছে
ঙ) উমরা বায়রাত কামাই করির গেইছে	ওরা বাইরে কাজ করতে গেছে
চ) বিরিসটা গুঁতা মাইরলেক	ষাঁড়টি গুতো দিল
ছ) চ্যোংড়িটা ভালে গান কবার নাইগছে	ময়েটি ভালই গান করছে
জ) হামরা/মুই কামাই করির পাবার নং	আমরা / আমি কাজ করতে পারবনা
ঝ) মানষি হামার উপরা সেই রাগ দ্যেকের নাইগছিলেক	লোকটি আমাদের ভীষণ রাগ দেখচ্ছিল

দাস জনগোষ্ঠী ও রঙপুর সীমান্তের কথ্যবাংলা	কলকাতার স্থানীয় কথ্য বাংলা
ক) বুড়্যা এল্যাং মাছ মারে	বুড়ো এখনও মাছ ধরে
খ) চ্যেংড়াটা ভালে কামাই করে	মেয়েটি ভালই কাজ করে
গ) মুই নদীত গাও ধুয়্যা নিছোং	আমি নদীতে স্নান করে নিয়েছি
ঘ) উয়্যা কামলা খাটির নাইগছে	সে মজুর খাটছে
ঙ) হামার ভুই গারা হয়্যা গেইছে	আমাদের জমি লাগানো হয়ে গেছে
চ) ছাগলে খ্যায়া ফেলাইছে	ছাগলে খেয়ে ফেলেছে
ছ) খচ্ছরটা করে কি	বদমাসটা করে কি ?
জ) মড়াই বাড়িত নাই	মড়াই বাড়ি নেই
ঝ) তোমার কামাই একন্যাও ভাল নাগে না	তোদের কাজ মোটেও পছন্দ হয়না
ঞ) মুই ভূইবাড়ি যাইম	আমি মাঠে যাব

রাজবংশী স্থানীয় কথ্য বাংলা	কলকাতার স্থানীয় কথ্য বাংলা
ক) ভালমন্দ কতা কওয়্যা নাইগবে	ভালমন্দ কথা বলা লাগবে
খ) সুবিধা অসুবিধা দ্যেকা নাইগবে	শুবিধা অশুবিধা দেখতে হবে
গ) চালাক চতুর না হইলে হবার নয়	চালকচতুর হতে হবে তানাহলে হবেনা
ঘ) নাকোত কান্দোত দেকিরে মন না চায়	ছিঁচকাদুনেটাকে দেখতেই ইচ্ছে করেনা
ঙ) কুড়িয়্যাটা কামাই কইরবে না খালি বসি থাইকবে	কুড়েটা কাজ করবে না শুধু বসে থাকবে
চ) এইগল্যা ঢিলা মানষির কামাই নোয়ায়	এগুলো ঢিলে লোকের কাজ নয়
ছ) জোলা চ্যেংড়িটার কামাই কাও ভাল কবার নয়	বুদ্ধিহীন মেয়েটির কাজ কেউ ভাল বলবেনা

➢ **কর্মবাচ্য:**

এই অঞ্চলের রাজবংশী কথ্যবাংলায় কর্মবাচ্যের স্থানীয় কথ্যবাংলার ক্ষেত্রে কর্মপদে 'ক' এবং দাস জনগোষ্ঠী ও রঙপুর সীমান্তের কথ্যবাংলার ক্ষেত্রে কর্মপদে সাধারণত ‘রে’ বিভক্তির বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক রূপ লক্ষণীয়। এছাড়া রাজবংশী কথ্যবাংলায় কর্মবাচ্যে 'ঠেনা', ‘দ্বারা' অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।
নিচে একই বাক্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপভেদ আমাদের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়ক হবে। যেমন কথ্যভাষার ক্ষেত্রে:

ছেলেটা খুব মার খেল। **(কলকাতার স্থানীয় কথ্য বাংলা)**
চ্যেংড়াটা সেই ড্যাং খাইলেক। **(কোচবিহার রাজবংশী)**
বাউটা খিব ডাঙ খাইল। **(জলপাইগুড়ি রাজবংশী)**
ছুয়াটা খুবে মার খাল। **(সূর্যাপুরী)**

ছেড়া দা সেই মাইর খাইলো। **(কোচবিহারের দাসেদের ভাষা)**
ছোঁড়াটা খুব ম্যার খ্যাইলে। **(শেরশাবাদিয়া)**
টকাটা খুম মাইর খাইল। **(দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবন)**

➢ **কর্তৃপদ বিশেষণ:**

➢ **কর্তৃপদ ক্রিয়াবিশেষ্য -**

রাজবংশী স্থানীয় কথ্য বাংলা	কলকাতার স্থানীয় কথ্য বাংলা
ক) নাচ ভালে দেখালু	নাচ ভালই দেখালে
খ) এই নাখান চলন দেখির ইচ্ছা করেনা	এ রকম চলন দেখতে ইচ্ছে করেনা
গ) খাবার বেলাত পলু আর কামাইয়ের বেলাত কুড়িয়্যা	খেতে পটু কাজে কুড়ে
ঘ) ডাঙানি নাইগলেক হয়	পিটাতে হত
ঙ) গানের দল চলি আইসছে	গানের দল চলে এসেছে
চ) নিনটা ভালে হইলেক	ঘুমটা ভালই হল
ছ) কামাই যায় করে উয়্যা কামাই কইরছে	কাজ যে করে সে কাজ করছে
ঝ) ভ্যাতকান্দুরি আবার কান্দির নাইগছে	কাঁদুনে আবার কাঁদতে লেগেছে
ঞ) খাওয়া হয়্যা গেইলেক	খাওয়া হয়ে গেল

➢ **ক্রিয়ার কাল:**

➢ **পুরাঘটিত বর্তমান:**

এই ভাষায় পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্রিয়া হিসেবে 'করি থাকে', 'দিয়া থাকে' ইত্যাদির ব্যবহার আছে। উদাহরণস্বরূপ,

- হামার মেলা মানষি এলাও নানান মতন প্রকৃতির পুজা করি থাকে।

➢ **ঘটমান বর্তমান:** ঘটমান বর্তমান কালে রাজবংশী ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।
যেমন প্রথম পুরুষ ঘটমান বর্তমান রাঢ়ীতে যেখানে 'সে করছে' রাজবংশীতে তা ' উয়ায় করির নাইগছে'।

- আম খাবার জন্তে ছুটি দিছে মনে হবার নাইগছে।

➢ সামান্য অতীতে উত্তম পুরুষে ‘নু’ এবং প্রথম পুরুষে ‘ইল’ বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—সেবা কন্নু (সেবা করলাম), কহিল (বলল), ধরিল (ধরল)।_যেমন –

- মুই মোর মাক কয়হানু দে কাইল বাড়িত যাম।

➢ এখানে কয়হানু (বলেছিলাম) - ক্রিয়ায় ' নু' বিভক্ত যুক্ত হয়েছে।

একইভাবে-

- গারিনু > আশায় দোশায় কনেক বাইঘন গারিনু তে এখেরে ছাগল গোরুয়ে শ্যাষ করেছে, চাইরো পাখে চেকোয়ার নাদিলে হবারে নহয়।
- পারিনু > রাইরোফ্লাভিন জিনিসটা সেদিন কি যে বুঝাইল, বুঝিরে না পারিনু।
- ফেলানু > সেদিন এমন নাফার বিচি ফেলানু তামান বিচিয়ে পচা একটাও গাজায় নাই।

➢ **আ, ইয়া, অলে প্রত্যয়-যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া:**

জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষায় 'আ', 'ইয়া', 'অলে' প্রত্যয়যোগে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উদা:

- "চাখরি না করিয়াও চেংড়াটা আবাদ কৃষি করি সেই চলেছে।" [পুরাঘটিত সংযোজক ক্রিয়া]।

➢ বহুপদী ক্রিয়া রূপ

রাজবংশী ক্রিয়াকেই দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি—একপদী ক্রিয়া ও বহুপদী ক্রিয়া। যে ক্রিয়া একপদে গঠিত তাকে একপদী ক্রিয়া ও যে ক্রিয়া একাধিক পদে গঠিত তাকে বহুপদী ক্রিয়া বলতে পারি।

➢ **তিনপদী ক্রিয়া:** - রাজবংশী ভাষায় কখনো কখনো বাক্যে তিনপদী ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়।

উদাহরণ:

- নানা গেবাপই চাকরিত যাবার মোরে না অ্যাতুলা সয়সম্পত্তি পড়ি থাকিবে উলাকে উলাই-ছুলাই করি চলিতে না হয়।
- সগায় ভক্তি করে বাচ্চারসু দেবড়র ঘর যায় আইসে।

➢ কিছু কিছু ক্রিয়াপদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'অ' স্বরধ্বনির উচ্চারণ 'উ' এর মতো হয়। যেমন-

- হল > হলু, শুতব > শুতবু ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- তুই হলু আইজ্জের ডাঙ্গরআঈ।
- বাশের চ্যাংরাৎ অ্যাকেলাউ শুতিবু।

➢ **অসমাপিকা ক্রিয়া:**

জলপাইগুড়ির রাজবংশী ভাষায় আ, ইয়া, অলে প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন-

- করিয়া, ফিরিয়া, কইরলে, দেইখলে ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- চাখরি না করিয়াও চেংড়াটা আবাদ কৃষি করি সেই চলেছে।

- **প্রশ্নবাচক বাক্য:**

প্রশ্নবাচক বাক্যের গঠন মোটামুটি একইরকম হলেও প্রশ্নবাচক সর্বনামগুলি অঞ্চলভেদে কীভাবে বদলে যায় সে বিষয়ে সহস্রাধিক তথ্য আমাদের কাছে আছে। তার থেকে একটি নমুনা দেখাই-

কোচবিহারে যেখানে বলে: ক্যাং করি হইলেক তো; জলপাইগুড়িতে তা বলে: কেমন করি হইল তো।

কোচবিহারে যেখানে 'কোন দিকে' অর্থে বলে কুদি, জলপাইগুড়িতে বলে কুন পাখে, মালদার সূর্যাপুরীতে বলে কুন পিতি, কোচবিহারের দাসেদের ভাষায় বলে কুনে, আবার উত্তর দিনাজপুরের শেরশাবাদিয়া ভাষায় বলে কুনদিকে। আবার দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবনে 'কোনদিকে' শব্দটিকে বলে কুনমা।

নীচে একটি মান্য চলিত প্রশ্নবোধক ম বাক্যের আঞ্চলিক রূপভেদগুলি লক্ষ্য করুন-

> কোন দিকে গিয়ে ছিলে? অনেক দিন পর দেখা তাইনা? **(কলকাতার স্থানীয় কথ্য বাংলা)**
> কুদি গেছিলু, ম্যালা দিন পরে দ্যাকা তায়না; **(কোচবিহার রাজবংশী)**
> কুন পাখে গেসিত? ম্যালা দিন বাদে দেখা হয় না?; **(জলপাইগুড়ি রাজবংশী)**
> কুন পিতি গেসিল? বহুতদিন ভেট হোল হা-না? **(সূর্যাপুরী)**
> কুনে গেছিলা? মেলাদিন পরে দেহা হইলো তাই না? **(কোচবিহারের দাসেদের ভাষা)**
> কুনদিকে গেলছিল্যা? ম্যাল্যাই দিন পর দ্যাখা নাজি? **(শেরশাবাদিয়া)**
> কুনমা যাইতু? ম্যালা দিন পর দ্যাখা তাউনা ? **(দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবন)**

- **অধিকরণে বিভক্তি:** অধিকরণ কারকের ক্ষেত্রে, 'ত'-এর বিভক্তি এর স্থানে অৎ, ৎ, ইৎ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষনীয়। যেমন-

- মনে > মনৎ, পাড়ে > পাড়ৎ ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- কৈনার মনৎ কি আচপ তাকে ভাল না বোঝে।
- বাড়িত জিনিস লাথে আসনু।
- পদ্মাত চলেছে ইলিশ মাছ মারার মরসুম।

এখানে অধিকরণে কারকের ক্ষেত্রে 'বাড়ি' এর সাথে 'ত' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

অসমীয়া ভাষাতেও অধিকরণে 'ত' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। লক্ষনীয় চর্যাপদের ভাষাতেও আমরা এই লক্ষণ দেখেছি। এর ফলে অনেকেই চর্যাপদকে কেউ কেউ রাজবংশী বলে দাবী করেছেন। যদিও সারা পশ্চিমবঙ্গ-জুড়ে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য এ কথা পুরোপুরি সমর্থিত নয়। চর্যাপদের ভাষায় অনুনাসিক ও 'অ' ধ্বনির প্রাচুর্য প্রমাণ করে বেশ কিছু চর্যাপদের কবিরা পুরুলিয়া-সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আমাদের ক্ষেত্র-সমীক্ষাও প্রমাণ করেছে রাজবংশীর থেকে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে চর্যার ভাষার মিল পরিসংখ্যানগতভাবে অনেক বেশি।

চর্যাপদের ২২৩৮টি পদের মধ্যে তিনশ'টির বেশি শব্দ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের যেখানে জলপাইগুড়ি বা কোচবিহারের আজকের কথ্যভাষায় চর্যায় ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা একশ'র থেকেও কম। প্রায় দশ লক্ষ তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা এই পরিসংখ্যান তৈরি করেছি।

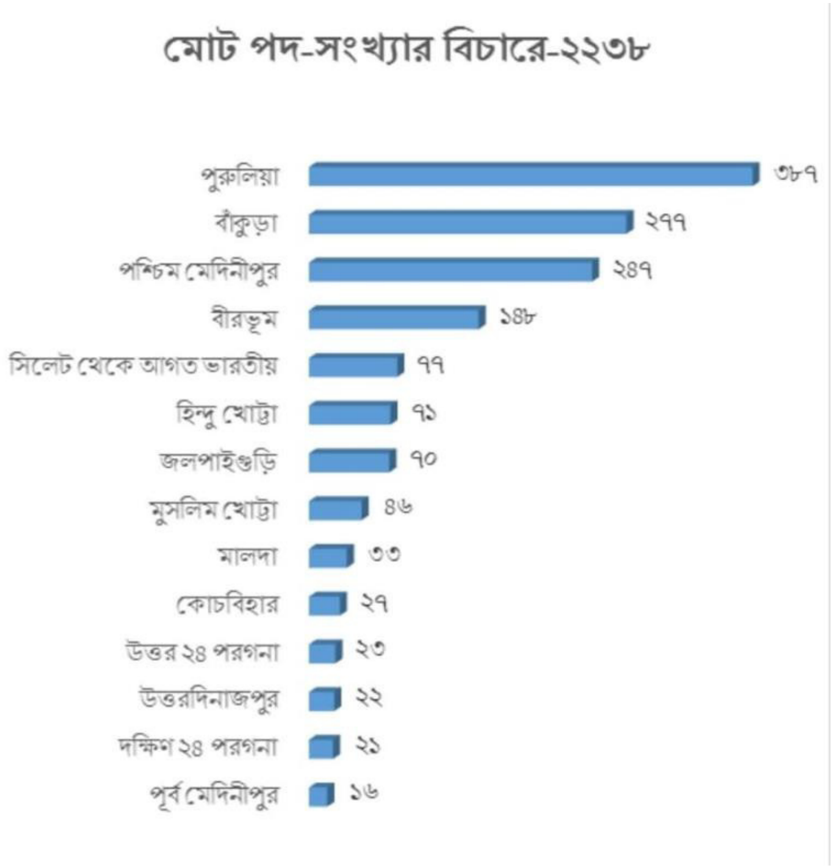

➢ **নঞর্থক বাক্যের গঠন:**

নঞর্থক পদ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা হলেও রাজবংশী নঞর্থক বাক্যের গঠন রাঢ়ী বাংলার মতোই। বিশেষ পার্থক্য নেই। অসম-সীমান্তের কোনো কোনো অংশে নঞর্থক পদ ক্রিয়াপদের আগে বসে। অসময়া ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-

- না পাইম্।

জলপাইগুড়ি রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ 'নহয়' কোচবিহারের রাজবংশী ভাষায় 'নোয়ায় ' শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

- নয় > নোয়ায় (কোচবিহারের রাজবংশী)।
- নয় > নহয় (জলপাইগুড়ি রাজবংশী)।

৬. উপসংহার:

রাজবংশী ভাষা, বিশেষ করে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে বিবেচিত হলে, একটি শক্তিশালী ভাষাগত পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ভাষা শুধুমাত্র স্থানীয় জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়, বরং তা একটি বিস্তৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বাহক। এই ভাষার মধ্যে বেশ কিছু প্রতিবেশী উপাদান এসে মিশেছে—যেমন অসমিয়া, নেপালি ও হিন্দির প্রভাব রয়েছে- তা শুধু ভাষার গঠনগত রূপান্তর নয়, বরং এটি একটি বহুভাষিক সমাজে বসবাসের প্রতিফলন। ভাষার এই পরিবর্তন ও অভিযোজনের ধারা দেখায় যে, রাজবংশী ভাষা একটি জীবন্ত ভাষা, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করতে সক্ষম। পাশাপাশি, রাজবংশী ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য আবার বাংলা ভাষার আদি রূপের প্রতিচ্ছবি বলেও মনে করা হয়, যার কিছু কিছু নমুনা আমরা দিয়েছি।

এই প্রবন্ধে রাজবংশী ভাষার বহুমাত্রিক দিকগুলি যেমন ভাষাবিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণার এক নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত করে দেয়, তেমনই তা স্থানীয় ভাষাভাষীদের কাছেও নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ভাষা যখন হারিয়ে যাওয়ার পথে, তখন এর সঠিক ভাষাতাত্ত্বিক চর্চা এবং সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান অত্যন্ত জরুরি। ভবিষ্যতে রাজবংশী ভাষার সংরক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি—এই তিনটি দিক ভাষাটিকে আরও দৃঢ় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই প্রবন্ধ তারই একটি ছোট্ট পদক্ষেপ।

আমাদের সংগৃহীত ভাষার এই তথ্যগুলি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে Dialect Detection Software এর কাজ যেমন চলছে, তেমনই ভবিষ্যতে এই আঞ্চলিক ভাষাগুলি যাতে ইংরেজি-সহ নানা দেশি ও বিদেশি ভাষায় সহজে অনুদিত হতে পারে, তার জন্য বিপুল গবেষণা চলছে। এই ভাষাগুলির থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে Text to Speech এবং Speech to Text Software এর গবেষণা চলছে বিশ্বজুড়ে, যা আগামী এক দশকের মধ্যে Artificial Intelligence এর গবেষণার জগতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বহন করবে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা সংরক্ষণে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। প্রথম খণ্ড (১৯৯১), দ্বিতীয় খণ্ড (২০০৫), তৃতীয় খণ্ড (২০০৫), চতুর্থ খণ্ড (২০১২)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

৩। গ্রিয়ারসন, জি. এ.। লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। কলকাতা: অফিস অফ দ্য সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ইন্ডিয়া, ১৯০৩–১৯২৮।

৪। রিসলি, এইচ. এইচ। দ্য কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস অফ বেঙ্গল। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৯২ – বেঙ্গল (ভারত)।

৫। সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১লা জানুয়ারি, ২০১৫।

৬। সেন, সুকুমার। ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ বাঙলা কোষ। প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

৭। মণ্ডল, নিরঞ্জন। সুন্দরবনের আঞ্চলিক শব্দকোষ। গাঙচিল, কলকাতা।

৮। রায়, কামিনীকুমার। লৌকিক শব্দকোষ (দুই খণ্ড)। কে. কে. রায় লোকভারতী, ৫/১ হরিদেবপুর রোড, কলকাতা-৪১, ১৯৬৭।

৯। দাস, ক্ষুদিরাম। বাংলা-সাঁওতালি অভিধান। ১৯৯৮।

১০। খান, কলিম ও চক্রবর্তী, রবি। বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ (ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান), ১ম ও ২য় খণ্ড। ভাষা বিন্যাস, আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪১৬ বি, পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা–৬০, ২০০৯, ২০১১।

১১। মুখোপাধ্যায়, অশোক। সংসদ ব্যাকরণ অভিধান। সাহিত্য সংসদ।

১২। করণ, সুধীরকুমার। সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ। দি এশিয়াটিক সোসাইটি।

১৩। বসু, রাজশেখর। চলন্তিকা: আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি.।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১ম ও ২য় খণ্ড। সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লি, ১৯৩২–১৯৫১।

১৫। সাহা, অজয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বীরভূমের বাংলাভাষা রূপ ও স্বরূপ। আশাদীপ, কলকাতা।

১৬। সাহা, অজয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বীরভূমের শব্দাভিধান ও বাক্ রীতি। আশাদীপ, কলকাতা।

১৭। সাহা, অজয়। বাংলা আগন্তুক শব্দকোষ। প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা।

১৮। https://respin.iisc.ac.in/team/suman%20ghosh

১৯। ঘোষ, সুমন। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ভাষাবৈচিত্র্য: একটি নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে প্রদত্ত আমন্ত্রিত ভাষণ।

https://www.youtube.com/watch?v=KiTWAGnmujU

https://www.bangladataconsortium.com

২০। শ', ডঃ রামেশ্বর। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২১। রাজবংশী ভাষা আকাদেমি। রাজবংশী ভাষার অভিধান: রাজবংশী-বাংলা-ইংরাজী ত্রিভাষিক অভিধান (প্রথম খণ্ড–অ > ঋ)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২২। বসুনিয়া, সুবলেন্দু। রাজবংশী শব্দের অভিধান।

২৩। মুরশিদ, গোলাম। বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান। (১ম+২য়+৩য় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩–২০১৪।

২৪। ভট্টাচার্য, সুভাষ। ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা। প্রথম প্রকাশ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৯।

২৫। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬। মোরশেদ, মনজুর ও আবুল কালাম। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা–৭০০০০৬।

২৭। ইসলাম, রফিকুল। ভাষাতত্ত্ব। প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৬০, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

২৮। চক্রবর্তী, বামনদেব। উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ। প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৬৩; পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ২০১৩, অক্ষয় মালঞ্চ, বি–৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা–৭০০০০৭।

২৯। ঘোষ, শ্রীজগদীশচন্দ্র। আধুনিক বাংলা ব্যাকরণাকরণ। প্রথম প্রকাশ, চৈত্র, ১৩৪০; সপ্তদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ৬৪ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।

৩০। মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ ডক্টর। বাঙ্গালা ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ, ১৩৪২ সন, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

প্রতিবন্ধকতার পরিচয় নির্মাণে ভাষাগত বিবর্তন: একটি পর্যবেক্ষণ

বুবাই বাগ

বাগনান কলেজ

ARTICLE INFO

Article history:
Received 09/09/2024
Accepted 03/03/2025

সূচক শব্দ:
প্রতিবন্ধকতা,
অন্যভাবে সক্ষমতা,
সম্মানজনক চেতনা,
মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তিকরণ

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

প্রতিবন্ধকতা ভাবনায় যে বিষয় নিয়ে গভীর অস্পষ্টতা রয়েছে তা হল উপযুক্ত শব্দচয়ন বা সঠিক পরিভাষার প্রয়োগ। আমরা জানি যে শারীরিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের খুব সহজে চিহ্নিত করা গেলেও পরিচয় বা সত্তা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত শব্দচয়ন বা ভাষাগত (language) আখ্যান গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ, ভাষা হল মত প্রকাশের অন্যতম ক্ষমতাশালী মাধ্যম। ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় বক্তার মনোভাব তথা মানসিকতা। তাই প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক পরিস্থিতির ধরণও ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অনেকে বলেন কথ্য ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বক্তা সর্বদা সচেতন থাকে না। তবে পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সাংস্কৃতিক চেতনা হিসাবে ভাষাগত ভিন্নতার ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার মধ্য দিয়ে অনেকাংশে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও এখনও পর্যন্ত অপ্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে সেই ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক বিভাজন রেখা স্পষ্টতর রয়েছে। অপ্রতিবন্ধী মানুষেরা ভাষা প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেমন প্রতিবন্ধী মানুষদের হীনতর বা কম ক্ষমতাশালী হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করে, একইসঙ্গে তাদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে এক ধরনের সীমারেখা নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত এক অন্যের থেকে স্বতন্ত্র বা আলাদা।

বিশ শতকের শেষ তিন দশকে প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করার ভাষাগত বিবর্তন লক্ষ করা যায়। আভিধানিক অর্থে বাংলা ভাষায় 'অন্যভাবে সক্ষম' বা 'বিশেষভাবে সক্ষম' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এই সময় পর্বে যেমন প্রতিবন্ধকতার প্রতি ঐতিহ্যগত ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, একই সঙ্গে তাদের পরিচয় নির্মাণে সম্মানজনক ভাষা প্রয়োগ শুরু হয়েছে বলে অনেকে মনে থাকেন। তবে এই পরিবর্তনের চরিত্র নিয়ে সর্বাগ্রে প্রশ্ন আসে। পশ্চিমি দেশের ভাষাগত বিবর্তনের সঙ্গে ভারতের ক্ষেত্রে সমরূপতা দেখা যায় কি? প্রতিবন্ধকতার শব্দগত চয়নে ভারতের মধ্যেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিয়েও বর প্রশ্ন দেখা যায়? বাংলা ভাষায়

Corresponding author's email ID: bubaibag086@gmail.com

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের উপযুক্ত শব্দচয়নের ক্ষেত্রে আড়ষ্টতা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

এই প্রেক্ষিত থেকেই থেকে বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিবন্ধী মানুষদের পরিচয় নির্মাণের ভাষাগত বিবর্তনের আখ্যান নির্মাণ করা যেতে পারে। বাস্তবিক পরিসরে অপ্রতিবন্ধী মানুষেরা অবচেতন মনে কতকগুলি শারীরিক ছবি এঁকে নেয় যার মাধ্যমে তাদের ভাষার প্রয়োগ করে থাকে এবং এই ভাষার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি আচরণ ব্যক্ত করে থাকে। যেখানে শারীরিক প্রতিচ্ছবির বিষয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ হয় ততটা বোধহয় সক্ষমতা বা অক্ষমতার চেতনা থাকে সক্রিয় থাকে না।

সমীক্ষাভিত্তিক এই প্রবন্ধে তথ্য ও তত্ত্বের সংমিশ্রণ করা হবে। উপাদান হিসাবে বেশ কিছু মাধ্যমিক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ওপর। সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষদের সম্মান, মর্যাদা ও মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভাষাগত অবয়বের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে।

ভূমিকা

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনায় কলকাতা শহরের আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেশের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর প্রথম প্রতিক্রিয়া "নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো"। রাজনীতির আঙিনায় কান পাতলেই শোনা যায়—"এটা বোবাকালাদের সরকার চলছে" অথবা "খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এই সরকার বেশীদিন চলতে পারবে না" অথবা "আমাদের দলই বড় কথা, কানা খোঁড়া যাকে প্রার্থী করা হবে তাকেই জেতাতে হবে"—উক্তিগুলি বাংলা ও বাঙালির ভাষা সংস্কৃতির চেতনায় একেবারে মজ্জাগত। তাই এইসব উক্তি গুলিকে বিচ্ছিন্ন চেতনার অংশ হিসেবে না দেখে বৈষম্যকরণের অংশ হিসেবে দেখলে বোধহয় খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

বাংলা তথা ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসরে শাসক-শাসিতদেরকে আক্রমণ করতে স্বাভাবিক পরিসরে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সচেতন বা অবচেতন মনে আঘাত করতে অভ্যস্ত। ভারতীয় গণতন্ত্রে অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণি বিশেষ করে তফশিলি জাতি বা উপজাতিদের আক্রমণে সেই চেতনা ততটা সক্রিয় থাকে না যতটা প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে ওঠে। এর কারণ কী? অনেকে বলবেন স্বাধীনতার সাত দশক পরেও ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা সেই অর্থে 'ভোটার' হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে তাদের প্রতি এহেন আচরণ প্রদর্শনে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ঝুঁকি একদমই থাকে না। পাশাপাশি সাধারণ অপ্রতিবন্ধী চেতনায় প্রতিবন্ধকতার প্রতি সার্বিক উদাসীনতা এই নিষ্পেষণের অন্যতম কারণ হতে পারে। এই প্রেক্ষিত থেকে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা নিয়ে যেমন ধোঁয়াশা রয়েছে তেমনই চিহ্নিতকরণে সঠিক ও উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগ নিয়ে গভীর অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

প্রতিবন্ধকতা কী?

প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝায় সেই প্রশ্নে সর্বাগ্রে চলে আসে। চিকিৎসীয় পরিমণ্ডলে স্থায়ী ক্ষতি বা বিনষ্টিকে অনেকে অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গণ্য হয়। সাধারণভাবে চিকিৎসীয় আঙ্গিকে প্রতিবন্ধকতা নির্ধারিত হলেও গত চার দশকে বিষয়গত পরিসরে রাষ্ট্রতত্ত্ব, আইনবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধকতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেখানে অনিবার্যভাবে মতাদর্শের চেতনা সংযুক্ত হয়েছে। মতাদর্শগতভাবে মার্কসীয় চেতনায় প্রতিবন্ধী মানুষদের 'অবহেলিত শ্রেণী' হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রচ্ছন্ন চেতনা দেখা গেলেও উদারনৈতিক চিন্তাধারায় কিছুটা ভিন্ন ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। উদারনৈতিক তাত্ত্বিকদের একাংশ মনে করেন সাধারণত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে একধরনের অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই ধরণের চেতনা অপ্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে অধিক দেখা যায়। এই ধরণের বক্তব্যে অবশ্য কিছুটা রাজনৈতিক কৌশল লক্ষণীয়। কারণ এই ধরণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেমন প্রতিবন্ধী মানুষদের সহজেই আকর্ষিত করা সম্ভব হয় একই সঙ্গে আনুগত্য অর্জন অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়। আবার কিছু উগ্রবাদী প্রতিবন্ধকতাযুক্ত তাত্ত্বিকেরা কিছুটা জোরের সঙ্গে বলেন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনেক সময় 'able-body'-দের পৃথক করা সম্ভব হয় না; ফলে 'disabled' নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে। শুধুমাত্র 'Body Image' কী প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণের প্রধান উপাদান হতে পারে? তাই আপাত প্রতিবন্ধকতা ও অপ্রতিবন্ধকতার বিভাজনের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। যার উত্তর এখনও অজানা। শুধুমাত্র দৃশ্যত কিছু অসুবিধা বা শারীরিক প্রতিচ্ছবি দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সীমারেখা নির্দিষ্ট হবে নাকি অন্য কোন সূক্ষ্ম রাজনীতি রয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে এই ধরণের ধোঁয়াশার কারণ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার অনুপস্থিতি। কারণ প্রতিবন্ধকতাকে কোন একটি সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ রাখা বেশ কঠিন। তবে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক প্রদত্ত চল্লিশ শতাংশ বা তার অধিক শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার পরিমাণসহ লিখিত সংশাপত্র থাকলে রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রতিবন্ধী মানুষ হিসেবে স্বীকৃত লাভে সক্ষম হয়। তবে একটা জিনিস স্পষ্টতই উঠে আসে প্রতিবন্ধকতা হল একধরণের অসুবিধা যা একান্তভাবে পরিবেশ পরিস্থিতি ওপর নির্ভর করে। এই চেতনা থেকে প্রতিবন্ধকতার সামাজিকীকরণে সূচনা হয়েছে যেখানে ব্যক্তি অপেক্ষা পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা বারেবারে পরিবর্তিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূর্বেকার ধারণার বেশ কিছু বদল ঘটেছে। চিকিৎসীয় ধরণ থেকে ক্রমে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা গুরুত্ব লাভ করেছে। যার সুস্পষ্ট চেতনা পাওয়া যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত (১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৬) প্রতিবন্ধকতার অধিকার বিষয়ক সনদে। সেখানে বলা হয়েছে প্রতিবন্ধকতা হল পারিপার্শ্বিক, পরিকাঠামোগত ও আচরণগত বাধা যা কোন মানুষকে সামাজিক পরিসরে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। আরও স্পষ্ট করে বললে শারীরিক মানসিক বা সংবেদনশীল চেতনার দ্বারা সৃষ্ট ব্যক্তির কার্যকরী ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। এই চেতনাকে অনুসরণ করে ভারতে ভারতের 'প্রতিবন্ধী মানুষ অধিকার আইনে' (২০১৬) প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সনদে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে আরও কয়েকটি উপাদানের সংযুক্তিকরণ ঘটেছে যেমন সুগম্যতাবৃদ্ধি, সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা অর্জন, সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান, সমাজের সর্বস্তরে পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে

অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ। সেখানে পূর্বেকার সাত ধরনের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে আরও চোদ্দ প্রকার অসুস্থতা বা বিনষ্টি যুক্ত হয়ে একুশ ধরনের স্থায়ী অসুস্থতা প্রতিবন্ধকতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রধান সাত ধারায় একুশ ধরণের অসুস্থতা যুক্ত হয়েছে যথা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার অন্তর্গত চলাফেরার অসুবিধা, সেরে যাওয়া কুষ্ঠ, সেরিব্রাল প্যালসি, বামন, পেশীজনিত অসুবিধা, অ্যাসিড আক্রমের শিকার, দেখাশোনার অসুবিধার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ ও আংশিক বা ক্ষীণ দৃষ্টি, শোনার অসুবিধার অন্তর্গত বধিরতা বা শ্রবণহীনতা এবং ভাষাগত অসুবিধা; বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ বুদ্ধিগত অসুবিধার মধ্যে ডিসলেক্সিয়া, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসর্ডার; মানসিক আচরণের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা; স্নায়ুঘটিত প্রতিবন্ধকতায় স্নায়ুতন্ত্রের আবরণ নষ্ট এবং পার্কিনসন এবং রক্তজনিত হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, হিমোলাইটিক ব্যাধি; একাধিক প্রতিবন্ধকতা উপস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা। উপরিউক্ত অসুবিধাগুলির মধ্যে কোন একটি অসুবিধা দৃশ্যমান হলে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ বা প্রতিবন্ধী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হবেন। তবে তাদের কেন্দ্র বা রাজ্যের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শংসাপত্র ও পরিচয় লাভ করতে হবে। যাদের জন্য উচ্চশিক্ষায় ন্যূনতম পাঁচ শতাংশ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই আইনে প্রথমবার সরকারি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেসরকারি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে অভিনব।

দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞার বিবর্তনের নিরিখে বলা যায় মানব জীবনে প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিবন্ধদশা হল প্রকৃতপক্ষে একটি স্তর বা অবস্থা মাত্র যা সাধারণভাবে স্থায়ী ক্ষতি বা বিনষ্টি থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে এবং তার মাধ্যমে তাদের অক্ষমতা বা সক্ষমতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে এই অক্ষমতা বা সক্ষমতার চেতনা অনেকাংশে পরিবেশ বা পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল (যেমন সম্পূর্ণ হাঁটাচলার অসুবিধাযুক্ত মানুষদের হুইল চেয়ার নিয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে র‍্যাম্প ও লিফটের সুবিধা)। তাই বলা যায় প্রতিবন্ধকতা হল এক প্রকার শারীরিক ও মানসিক পারদর্শিতার অভাব যা স্বাভাবিক জীবনযাপনে আংশিক বা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্ত অসুবিধাযুক্ত মানুষদের তথাকথিত প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ হিসেবে গণ্য হয়। তবে আভিধানিক পরিসরে এই প্রতিবন্ধকতা শব্দটা কততা প্রযুক্ত হতে পারে সে নিয়ে প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়।

প্রতিবন্ধকতার ভাষাগত আখ্যান: বিবর্তন না কী পরিবর্তন?

প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা মত চিহ্নিতকরণে ভাষার ক্ষেত্রেও বিবর্তন লক্ষণীয়। শারীরিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হলেও স্বীকৃতি বা সত্তা নির্ধারণে সঠিক বা সংবেদনশীল ভাষা (language) গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা জানি যে ভাষা হল মত প্রকাশের অন্যতম ক্ষমতাশালী মাধ্যম। ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় বক্তার মনোভাব তথা মানসিকতা। সমসাময়িক পরিবেশ পরিস্থিতি ভাষার মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়। ভাষার মধ্য দিয়ে ঘটে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। ভাষা শুধু ক্ষমতার প্রকাশ করে না, একই সঙ্গে সামাজিক 'অবয়ব'-এর (discourse) সৃষ্টি করে।

প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে সেই ধরনের অবয়ব দেখা যায়। নাট্যকার ব্রাত্য বসুর রচিত ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটকের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায় যেখানে নকশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ‘ল্যাংরা রাজেন’ যিনি পুলিশের অত্যাচারে প্রতিবন্ধী হয়েছিলেন। সেখানে বলেছিলেন মানুষের দুর্বলতা দিয়েই পরিচয় প্রদান করা হয়ে থাকে। তার জন্যই শোনা যায় ‘ঐ লোকটা কানা, খোঁড়া, মোটা, বেঁটে বিপরীতে শোনা যায় না লোকটি খুব মহৎ, খুব উদার....’। বোঝাই যাচ্ছে তথাকথিত অপ্রতিবন্ধী মানুষেরা ভাষা প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের হীনতর বা কম ক্ষমতাশালী হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। যার মধ্য দিয়ে একে অন্যের প্রতি বিচ্ছিন্ন বা পৃথক চেতনা স্পষ্ট হয়। তথাকথিত অপ্রতিবন্ধী মানুষেরা সচেতন মনে কতকগুলি ছবি কল্পনা করেন যার মাধ্যমে ভাষা প্রয়োগ করে থাকে। কারণ ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার প্রতি আচরণ ব্যক্ত হয়ে থাকে।

বিশ শতকের শেষ তিন দশকে প্রতিবন্ধকতার পরিচয় প্রদানে ভাষাগত বিবর্তনের ইতিহাস বেশ স্পষ্ট। এই সময় থেকে বিক্ষিপ্ত পরিসরে মার্জিত বা রুচিশীল ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় যা আপাতভাবে কিছুটা হলেও সম্মানজনক। তবে সেই চেতনাগত অবয়ব অনেকাংশে স্থান-কাল-পাত্র-র অপর নির্ভরশীল। শহুরে নিত্য চেতনায় যেমন ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায় গ্রামীণ পরিসরে তেমন লক্ষ করা যায় না। আবার শিক্ষিত ভদ্রলোকের বা এলিট শব্দকোষে যে ধরণের ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় তুলনামূলক ‘নন এলিট’দের শব্দকোষে তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না। একটি উদাহারণের সাহায্যে বিষয়টিকে সহজ করা যেতে পারে। কলকাতা শহরের একেবারে উত্তর দিকে বরানগরে গত চল্লিশ বছর ধরে ‘রাষ্ট্রীয় চলনজনিত প্রতিবন্ধী সংস্থা’ (১৯৭৮) নামে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেখানে চলনজনিত প্রতিবন্ধকতাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার উপযুক্ত চিকিৎসা ও সহায়ক সরঞ্জাম পাওয়া যায়। গত চল্লিশ বছর ধরে নির্দিষ্ট স্টপেজ বাসের কন্ডাক্টর ও চালকদের কাছে প্রতিবন্ধী মানুষদের যাতায়াতের সুবাদে স্থানটি পরিচিতি লাভ করেছে। কন্ডাক্টরগণ তাদের সুবিধার্থে বাস স্টপেজের নামকরণ করেছেন সম্পূর্ণ নন-এলিট ‘পঙ্গু হাসপাতাল’। যদিও শহুরে শিক্ষিত এলিট বা ভদ্রলোকের শব্দকোষে সেইভাবে এখন আর পঙ্গু’ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। বরঞ্চ তাদের অভিধানে ‘হ্যাণ্ডিক্যাপ’ শব্দের জনপ্রিয়তা রয়েছে। আবার গ্রামীণ পরিবেশে অবশ্য (নন এলিট) শব্দকোষে পঙ্গু ন্যাংরা, লুলো, কানা, বোবার মত চলিতভাষার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়।

ভাষাগত বিবর্তনের পর্যানুক্রমিক ইতিহাসটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৮০ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাতত্ত্বে প্রতিবন্ধকতার পরিচয় প্রদানে ‘Handicapped’ থেকে ‘Disabled’-তে উত্তরণ হয়। পরের দশকে ‘Disabled’-এর পরিবর্তে ‘Persons with Disabilities’ বা ‘Disability’ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই শব্দগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আসলে প্রতিবন্ধকতার প্রতি মনোভঙ্গি পরিবর্তনের ইঙ্গিত, তা অস্বীকার করা যায় না। ১৯৯০ দশকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিধানে ভাষাগত বা শব্দগত এই পরিবর্তন ক্রমে বিশ্বায়নের হাত ধরে সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে। ফলে ইংরেজী তর্জমায় ‘Persons with Disabilities’ বা ‘Disability’ যার বাংলা অনুবাদে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ বা প্রতিবন্ধকতা শব্দ প্রযুক্ত। ১৯৯০-এর দশকে বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধীদের আইনে দেখা যায় যেমন অস্ট্রেলিয়া’য় ‘প্রতিবন্ধকতা বৈষম্য বিরোধী আইন’ (১৯৯২), ব্রিটেনে ‘প্রতিবন্ধকতা বৈষম্য বিরোধী আইন’ (১৯৯৫) ও ভারতে ‘প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ আইনে’ (১৯৯৫) ‘প্রতিবন্ধকতা’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

একুশ শতকের সমাজমনস্তত্বের পরিসরে 'Differently Abled' বা 'Specially Abled' যার বাংলা তর্জমা 'অন্যভাবে সক্ষম' বা 'বিশেষভাবে সক্ষম' তর্জমা কিছু মানুষদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই ধরনের ভাষাগত প্রয়োগ নিঃসন্দেহে প্রতিবন্ধী মানুষদের কিছুটা গৌরবান্বিত করে দেখার চেষ্টা হয়। অনেক সমালোচক মনে করেন এই ধরনের ভাষাগত প্রয়োগ শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী মানুষদের বিশেষত্বকে প্রকাশ করে, কিন্তু মর্যাদার ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় না। ফলে এহেন ভাষাগত প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা অধিকারকর্মীরা কিছুটা দ্বিধান্বিত। তাঁরা মনে করেন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষম। সঙ্গীতে লতা মঙ্গেশকার যেমন বিশেষভাবে সক্ষম, ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকর বা ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো তেমনই বিশেষভাবে সক্ষম। আপন কার্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ বা একাগ্রতা প্রদান করলে যে কোন মানুষ সাফল্য অর্জন করতে পারে অর্থাৎ সাধারণীকরণের স্থলে বিশেষীকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে 'বিশেষভাবে সক্ষম' হিসেবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া প্রতিবন্ধকতার আখ্যানে বিশেষভাবে সক্ষম শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে জীবনসংগ্রামে জয়ী প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে যা সামগ্রিক প্রতিবন্ধকতার মুষ্টিমেয় এক ক্ষীণ অংশকে বোঝানো হয়ে থাকে। ফলে এই 'ক্ষুদ্র বিশেষ' সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাইরে থেকে যাওয়া বৃহৎ সংখ্যক প্রতিবন্ধীদের পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে 'বিশেষভাবে সক্ষম' শব্দ আদৌও যুক্তিসম্মত হবে কিনা তা প্রশ্নাতীত নয়।

শিক্ষার আঙিনায় বিশেষ করে 'বিশেষ শিক্ষা'র (Special Education) পরিপ্রেক্ষিতে 'physically challenged' বাংলা তর্জমায় 'শারীরিক সংগ্রামী বা প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং 'Special Needs' বাংলা তর্জমায় 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' শব্দে বন্ধনী করা হয়। আপন অস্তিত্বের লড়াইয়ে প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। প্রতিবন্ধদশায় সেই সংগ্রামের তীব্রতা যে বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে ব্যাপকতর অর্থে অর্থে সকলেই সংগ্রামী। আবার 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' শব্দ প্রয়োগেও আপত্তি রয়েছে। বিশেষ চাহিদার চেতনা শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিচ্ছবির ওপর নির্ভর করে না। শারীরিক, বৌদ্ধিক ও অন্যান্য পরিবেশগত অসুবিধার পাশাপাশি জাতিগত বা বর্ণগত এবং লিঙ্গগত প্রতর্ক চলে আসে। ফলে শব্দটি বিশেষভাবেই প্রতিবন্ধকতার পরিসরে সবসময় প্রযুক্ত নাও হতে পারে।

পাশ্চাত্য সঞ্জাত এহেন ভাষাগত পরিবর্তন ভারতীয় প্রতিবন্ধকতার পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে প্রতিবন্ধকতার উপযযুক্ত শব্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার প্রথম তিন দশকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদনে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবন্ধীদের 'সমাজের দুর্বল গোষ্ঠী' (weaker section of the society) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সমসাময়িক সরকারী নির্দেশনামাতে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের দুর্বল থেকে সবল করতে একাধিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৯৭০ দশকে বাংলাদেশ যুদ্ধের জয়লাভের পরবর্তীকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী' শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে তিন শতাংশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনামায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' (disabled persons) শব্দের প্রথম ব্যবহার ভারতে সরকারি পরিভাষায় দেখা যায়। ১৯৮০ দশকে ভারতে 'Handicapped' শব্দ কোন কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। আজকের দিনেও পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যমে (বাস, ট্রাম, লঞ্চ, ভ্যাসেল) 'হ্যান্ডিক্যাপড্' বা অপভ্রংশে 'হ্যান্ডিক্যাপ' লেখা চোখে পড়ে।

ইংরেজি ভাষায় বা তার বাংলা তর্জমায় প্রতিবন্ধকতার শব্দগত আখ্যান আলোচনায় রাষ্ট্রীয় হিন্দি ভাষায় উপযুক্ত শব্দচয়নের বিষয় অনিবার্যভাবে আসে। দীর্ঘদিন চলনজনিত প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণে 'বিকালঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হত। কথ্যভাষায় দৃষ্টিহীনদের সুরদাস (মধ্যযুগীয় দৃষ্টিহীন সঙ্গীতকার সুরদাসের অনুকরণে), বধিরদের 'গুঙ্গা' বলা হয়ে থাকে। এই ধরণের ভাষাগত অস্পষ্টতা দূর করতে শাসকদের তরফে বারেবারে একাধিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। ২০১২ সালে শাসক ইউপিএ বিকালঙ্গের পরিবর্তে 'নিস্কর্মা' শব্দ প্রয়োগে আগ্রহী ছিলেন। তার জনপ্রিয়তা খুব একটা দেখা যায় না। নিস্কর্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়ে প্রতিবন্ধকতা অধিকারকর্মীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিন বছর পরে ২০১৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর সম্প্রচারে বিক্যালঙ্গের পরিবর্তে তামসিকভাবে 'দিব্যাঙ্গ' শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। পৌরাণিক ঐতিহ্যের ভারতীয় হিন্দু প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ঐশ্বরিক চেতনায় 'দিব্যভাব'-এর প্রতিফলনে এরূপ নামকরণ হয়েছে কি না তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। প্রতিবন্ধকতা অধিকারকর্মী থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজের একাংশের প্রবল আপত্তি ও সমালোচনা সত্ত্বেও অতি দ্রুত সেই শব্দে সরকারী সিলমোহর লাগে। ট্রেন বিমানসহ পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমে, মন্ত্রণালয়ের নামকরণে দিবাঙ্গ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে সরকারে শাসকদলের পরিবর্তন ঘটলে প্রতিবন্ধকতার শব্দগত আখ্যানে পুনরায় পরিবর্তন দেখা যাবে কি না তা সময় বলবে। বলা বাহুল্য বাংলা অভিধানে 'প্রতিবন্ধকতা'-র মত জনপ্রিয় প্রতিশব্দের অনুসন্ধান হিন্দি অভিধানে সমানে চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বা আঞ্চলিক পরিসরে প্রতিবন্ধকতাকে বিভিন্ন কথ্য ভাষায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ তথা আপামর বাংলায় সাধারণভাবে 'প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ' হিসেবে হয়। কারণ বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি বা বিনষ্টিজনিত মানুষদের জীবনপ্রবাহে প্রতিনিয়ত বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এই চেতনা থেকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ শব্দের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তবে স্থানিক পরিসরে কথ্যভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অসুস্থতাকে 'কানা-খোঁড়া–হাবা-বোবা-পাগলা' তর্জমায় চিহ্নিত করা হয়। সাম্প্রতিক চেতনায় অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ চোখে পড়ে যা আপাতভাবে সম্মানজনক বলেও মনে হয়। 'কানা'-র পরিবর্তে অন্ধ বা দৃষ্টিহীন; 'বোবা' শব্দের পরিবর্তে বধির বা শ্রবণজনিত; 'খোঁড়া'-র পরিবর্তে চলনজনিত বা শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং পাগলা বা উন্মাদের পরিবর্তে মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক অসুস্থতা। তবে এই ধরনের শব্দগুলির প্রয়োগ অনেকাংশে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলার কথকতায় একাধিক প্রবাদ প্রবচন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে একপ্রকার নেতিবাচক চেতনা প্রদান করে তা অস্বীকার করা যায় না। 'পুকুরের শত্রু পানা আর দেশের শত্রু কানা', 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন', 'কানা খোঁড়া তিনগুন বাড়া', 'বোবার শত্রু নাই', 'পাগলে কিনা বলে!' ইত্যাদি প্রবাদগুলি আপাতভাবে বিরক্তিসূচক চেতনায় ব্যবহৃত হলেও তা প্রতিবন্ধী মানুষদের কাছে অনেক সময় কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে কারণ এগুলির মাধ্যমে হীনমন্যতাকে অধিক প্রকটিত করে।

অপ্রতিবন্ধী মানুষদের দ্বারা প্রতিবন্ধকতার পরিচয় প্রদানে ভাষাগত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী মানুষেরা নিজেদের কী ধরনের উপমায় দেখতে পছন্দ করে তা অনিবার্য ভাবে চলে আসে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের

ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু, হ্যান্ডিক্যাপ ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অসহয়তার প্রতীক হিসেবে দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বাস ট্রামের সংরক্ষিত আসন গ্রহণের ক্ষেত্রে 'হ্যান্ডিক্যাপ' শব্দের মাধ্যমে পরিচয় প্রদানে অনেকের আপত্তি থাকে না।

নিচের এই সারণির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের সাম্প্রতিক ভাষাগত পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যাবে। দীর্ঘকালীন প্রচলিত কথ্যভাষার পরিবর্তে আভিধানিক বা ব্যাকরণগত পরিসরে শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

সারণি ১

প্রতিবন্ধকতার ভাষাগত বিবর্তনের রূপরেখা (পশ্চিমবঙ্গ)

প্রতিবন্ধকতার ধরণ	কথ্যভাষায় চিহ্নিতকরণ	শুদ্ধ বা সম্মানসূচক ভাষা
চোখে দেখতে না পাওয়া	কানা	অন্ধ, দৃষ্টিহীন, দৃষ্টিহীনতাযুক্ত ব্যক্তি
শুনতে বা বলতে না পারা	হাবা, বোবা	বধির, শ্রবণজনিত প্রতিবন্ধী
চলতে না পারা	ল্যাংড়া, খোঁড়া, পঙ্গু, লুলো,	চলনজনিত বা প্রতিবন্ধী মানুষ
মানসিক অসুস্থতা	পাগল, মাথা খারাপ, উন্মাদ	মানসিক স্বাস্থ্যযুক্ত ব্যক্তি
স্প্যাস্টিক	অকর্মণ্য, পুরোপুরি অক্ষম	সেরিব্রাল প্যালসি

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত সমীক্ষা।

সাম্প্রতিক উত্তরাধুনিক সংস্কৃতিতে প্রতিবন্ধকতার চিহ্নিতকরণে ভাষার সঙ্গে বেশ কিছু 'চিহ্ন' (sign) বা 'প্রতীকে'র (symbol) প্রচলন লক্ষ করা যায়। লিঙ্গগত বিভাজনের ক্ষেত্রে এই ধরণের চিহ্নের ব্যবহার বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। গত দুই দশকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ট্রেন বা বিমান পরিসেবায় চিহ্নগুলি সম্পর্কে অনেকেই অবগত। বিমানবন্দর, শপিংমল, মাল্টিপ্লেক্সসহ একাধিক স্থানে উচ্চবিত্ত প্রতিবন্ধীদের যেখানে অধিক যাতায়াত, সেখানে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে (র‍্যাম্প, উপযুক্ত শৌচালয়) এই সমস্ত চিহ্ন চোখে পড়ে। প্রসঙ্গত কলকাতার কয়েকটি বৃহৎ শপিংমল বা মাল্টিপ্লেক্সে (ফোরাম, মেট্রোপলিস, সাউথসিটি, কোয়েষ্ট, অ্যাক্রোপলিস) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য সুবিধাগুলি চিহ্ন বা প্রতীকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে দ্বিবিধ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যথা, একদিকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা যেমন নিজেদের বিশ্বায়িত সঞ্চালিত পুঁজি বা অতিজাতিক বাজার সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে এবং শপিংমল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক এহেন উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য হয়েছে যা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে উন্মোচিত করে। তবে এই ধরণের উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বয়স্ক উপভোক্তাদের বিষয় অনিবার্যভাবে চলে আসে। তাছাড়া বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সদর্থক ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে চলেছে। আবার অনেক বহুজাতিক কোম্পানি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত উপভোক্তাদের জন্য বিশেষ ছাড় বা সাংকেতিক ভাষায় বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছে। যার মাধ্যমে কোম্পানিগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা অনেকাংশে দৃশ্যমান হয়েছে। তবে এহেন উদ্যোগ বাস্তবে প্রতিবন্ধী মানুষদের পুঁজিবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার দিক নির্দেশ করে।

দৃষ্টিহীন **চলনজনিত** **বধির বা শোনার অক্ষমতা**

উপসংহার

শব্দ-ই-ব্রহ্ম, শব্দের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়ে চিন্তা-চেতনা। প্রতিবন্ধকতার পরিচয় প্রদানে তাই উপযুক্ত শব্দ চিহ্নিতকরণে নানাবিধ দ্বিধাদ্বন্দ্ব এখনও সমানভাবে কাজ করে। এখন আমরা সচারচর কানা-খোঁড়া শব্দগুলো হয়ত শুনি না, বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিতের পরিসরে প্রবেশ করলে কিছুটা সচেতনভাবে শব্দচয়নের চেতনা জাগরণ ঘটে। তবে সার্বিক পরিসরে মানসিকতার পরিবর্তনের গতি যে খুবই শ্লথ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আশাহত হলে চলবে না। লড়াইয়ের অনেকটা পথ এখনও বাকি। পাথরের সঙ্গে পাথর ঘষে একদিন যেমন মানুষ আগুনের আবিস্কার করে সভ্যতার ধারণাকে আমুল বদলে দিয়েছিল, তেমনভাবে সমাজ সভ্যতার প্রতি মুহুর্তে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি ও তাঁদের সদর্থক কর্মকাণ্ডের আখ্যানের মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধকতার প্রতি চেতনাগত তমসা সরানো সম্ভব হবে।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: একটি এইচপিএসজি পর্যালোচনা

শুদ্ধ এম. তৌসিফ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 30/12/2024
Accepted 09/04/2025

সূচক শব্দ:
যুক্ত ক্রিয়া,
সহায়ক ক্রিয়া,
হেড-ড্রাইভেন ফ্রেস স্ট্রাকচার গ্রামার,
অর্থতত্ত্ব,
অর্থতাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতা,
কম্পিউটেশনাল ভাষাবিজ্ঞান।

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

যুক্ত ক্রিয়া হল বাংলা সহ দক্ষিণ এশীয় ভাষাগুলির একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য যেখানে বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া (N-V) এবং বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়া (A-V) গঠন লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধে বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক দিকটি হেড-ড্রাইভেন ফ্রেস স্ট্রাকচার গ্রামার (HPSG) এর কাঠামোর ভিত্তিতে এই দুই ধরনের গঠন আলোচনা করা হয়েছে। সহায়ক ক্রিয়াপদগুলোকে (Light verb) দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে এবং বিশেষ্য এবং বিশেষণগুলির সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ার ভাষাবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয়েছে। হিন্দি ওয়ার্ডনেট থেকে প্রাপ্ত বিশেষ্য ও বিশেষণের অন্টোলজিকাল বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃত করে, N-V ও A-V যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হেড-ড্রাইভেন ফ্রেস স্ট্রাকচার ব্যাকরণ কাঠামোতে দেখানো হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশ করে যে, বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া ও বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়ার যথাযথ সমন্বয় এ দুইটি উপাদানের পারস্পরিক অর্থতাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতার উপর নির্ভরশীল, যদি এ দুয়ের মাঝে এ সামঞ্জস্যতা না থাকে তবে যুক্তক্রিয়া অর্থগত ত্রুটি প্রদর্শন করে। অধুনা কম্পিউটেশনাল ভাষাবিজ্ঞানে এইচপিএসজি কাঠামোর আলোকে ব্যাপকতর গবেষণা চলছে, সেক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাটি বাংলা ভাষার কম্পিউটারায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক পাঠ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণাটির সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এখানে তথ্য-উপাত্তের জন্য প্রাথমিক উৎস ব্যবহার করা হয়নি ও উপভাষিক দিকটি বিবেচনা করা হয়নি। বাংলা যুক্রক্রিয়ার বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া (N-V) এবং বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়া (A-V) গঠনের উপভাষিক বৈচিত্র্য নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণা সম্ভব। বর্তমান আলোচনা প্রমিত বাংলা ভাষার আলোকেই যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিরূপণের মধ্যেই সীমিত থাকবে।

১. ভূমিকা

ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব (Syntax)। বাক্য গঠনের বিভিন্ন উপাদান, উপাদানসমূহের মধ্য পারস্পরিক ব্যাকরণিক সম্পর্ক, এবং বাক্যের সূক্ষ্মতর জটিল বিশ্লেষণ ইত্যাদি বাক্যিক প্রসঙ্গ নিয়েই বাক্যতত্ত্বের

Corresponding author's email ID: smtousif734@gmail.com

কাজ। বাক্য গঠনের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ক্রিয়া (Verb)। ক্রিয়া বাক্যতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ক্রিয়ার সাহায্যেই বাক্যে কর্তা কার্যসম্পাদন ঘটায়। তবে ক্রিয়া ছাড়াও বাক্য গঠন সম্ভব, উদাহরণস্বরূপ-সে আমার ভাই; এখানে ক্রিয়া বাক্যে অনুক্ত (covert) অবস্থায় আছে। বাংলা বাক্যক্রম সাধারণত কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম ধরনের হয়। তবে বাংলা বাক্যে এই গঠন সংরক্ষণ করা অবধারিত নয়, প্রাকৃতিক ভাষায় (natural language) বাক্যে এই ক্রম এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে পারে; যেমন-আমি বল খেলি > আমি খেলি বল > বল খেলি আমি > খেলি আমি বল। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা বাক্যতত্ত্বও বেশ বিচিত্রতা প্রকাশ করে। তাই বলা যায়, ক্রিয়াপদেরও রয়েছে হরেক রকমের বৈশিষ্ট্য। এ প্রবন্ধে বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাক্যতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করার জন্য ভাষাবিজ্ঞানে রয়েছে হরেক রকমের তত্ত্ব ও পদ্ধতি, যেমন—এলএফজি (LFG) তথা Lexical Functional Grammar, মিনিমালিস্ট প্রোগ্রাম (Minimalist Program), ক্যাটাগরিকাল ব্যাকরণ (Categorical Grammar), টিএজি (Tree Adjoining Grammar), এইচিপিএসজি (HPSG) তথা Head-driven Phrase Structure Grammar। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে এইচিপিএসজি কাঠামোর আলোকে বিশ্লেষণ করা। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশ করে যে, বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার গঠনে বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া ও বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়ার যথাযথ সমন্বয় এ দুইটি উপাদানের পারস্পরিক অর্থতাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতার উপর নির্ভরশীল, যদি এ দুয়ের মাঝে এ সামঞ্জস্যতা না থাকে তবে যুক্তক্রিয়া অর্থগত ত্রুটি প্রদর্শন করে।

২. বাংলা যুক্ত ক্রিয়া: তাত্ত্বিক পটভূমি

বাংলা যুক্ত ক্রিয়া মূলত বাংলা জটিল বিধেয় (Complex Predicate) তথা বহুশাব্দিক ক্রিয়ার একটি শ্রেণিবিভাগ। প্রমিত বাংলায় দুই রকম বহুশাব্দিক ক্রিয়া বিদ্যমান; একটি হচ্ছে যুক্ত ক্রিয়া (Conjunct Verb) ও অপরটি হচ্ছে যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verb) (সরকার, ২০১১, পৃ, ২৭২)। রূপতাত্ত্বিকভাবে এই দুই রকম ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যুক্ত ক্রিয়ার গঠনে বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া জটিল বিধেয় (N-V Complex Predicate) ও বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়া জটিল বিধেয় (A-V Complex Predicate) লক্ষণীয়। অপরদিকে যৌগিক ক্রিয়ার গঠনে ক্রিয়া-সহায়ক ক্রিয়া জটিল বিধেয় (V-V Complex Predicate) লক্ষণীয়।

যুক্ত ক্রিয়ার প্রথম অংশ বিশেষ্য বা বিশেষণ থাকে, আর দ্বিতীয় অংশে থাকে সহায়ক ক্রিয়া (Light Verb)। এই সহায়ক ক্রিয়ার ধাতুর সাথে নানা রকমের ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে সমাপিকা ক্রিয়াতে (অথবা প্রয়োজনমাফিক অসমাপিকা ক্রিয়া) রূপ দেওয়া হয় (সরকার, ২০১১, পৃ, ২৭২)। যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয় প্রথম অংশে অসমাপিকা রূপ আর দ্বিতীয় অংশে সহায়ক ক্রিয়ার (Light Verb) সমাপিকা রূপ দিয়ে (ইসলাম, ১৯৯৮, পৃ, ১২৬)। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অংশকে পূর্বক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন (সরকার, ২০১১, পৃ, ২৭২)। এখানে এই দুই ধরনের বহুশাব্দিক ক্রিয়ার গঠনের উদাহরণ দেওয়া হল:

১। যৌগিক ক্রিয়া

(ক) ক্রিয়া-সহায়ক ক্রিয়া জটিল বিধেয় (V-V Complex Predicate):

আমার বাবা অনেক দিন ধরে কবিতার বই **পড়ে আসছেন।**

এই বাক্যে 'পড়ে' হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া তথা পূর্বক্রিয়া (Matrix Verb) ও 'আসছেন' হচ্ছে সহায়ক ক্রিয়া (Light Verb)। উভয় ধরনের ক্রিয়া মিলে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কোনো কার্যসম্পাদন বোঝাচ্ছে।

২। যুক্ত ক্রিয়া

(ক) বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া জটিল বিধেয় (N-V Complex Predicate):

বাবা তার ছেলেকে **বিদায় দিল।**

এখানে, সহায়ক ক্রিয়া হল 'দিল' (দেওয়া) যা বিশেষ্য 'বিদায়' দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে এবং তাদের সম্মিলিত রূপটি একটি নির্দিষ্ট অর্থ বোঝাচ্ছে।

(খ) বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়া জটিল বিধেয় (A-V Complex Predicate):

তোমার ব্যবহারে আমি **অবাক হয়েছি।**

এখানে, সহায়ক ক্রিয়া 'হয়া' যা বিশেষণ 'অবাক' দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে এবং তাদের সম্মিলিত গঠন একটি নির্দিষ্ট অর্থ বোঝাচ্ছে।

যুক্ত ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য হল যুক্ত ক্রিয়াকে যৌগিক ক্রিয়াতে রূপান্তর করা সম্ভব, যেমন—'পছন্দ করা' থেকে 'পছন্দ করে ফেলা'। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়া 'ভেবে বসা'-র সাথে কিছু যুক্ত করে যুক্ত ক্রিয়াতে রূপান্তর করা যায় না।

২.১ সহায়ক ক্রিয়া (Light Verb)

ইতোমধ্যে যুক্ত ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সহায়ক ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উভয় ধরনের গঠনেই এর অর্থতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। 'Light Verb' অভিধাটি প্রথম উল্লেখ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী জেসপারসন (Jesperson, 1954)। এই সহায়ক ক্রিয়াগুলো ন্যূনতম অর্থ বহন করে, এরা ভাব প্রকাশের জন্য তার পূর্ববর্তী উপাদান (পূর্বক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ) এর উপর নির্ভরশীল। সহায়ক ক্রিয়াগুলো যুক্ত ক্রিয়ার সাথে বসে সাধারণত নিজের অর্থ বজায় রাখার চেষ্টা করে, আবার কখনও আভিধানিক অর্থের ব্যতিরেকে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ

করে থাকে (সরকার, ২০১১, পৃ, ২৭৩)। ভাষাবিজ্ঞানী মিরিয়াম বাট (Butt, 2005) সহায়ক ক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন—

ক) সহায়ক ক্রিয়াগুলো অগত্যা ভাষা জুড়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্যতাত্ত্বিক শ্রেণি গঠন করে না; প্রদত্ত ক্রিয়াটি পূর্ববর্তী উপাদান বা পূর্বক্রিয়ার বিপরীতে সহায়ক ক্রিয়া কিনা তা নির্ধারণের মানদণ্ড রয়েছে।

(খ) সহায়ক ক্রিয়াগুলোর অর্থ পৃথক হতে পারে, তারা সর্বদা ক্রিয়ার মূল ইভেন্ট (Event) গঠনে হস্তক্ষেপ করে।

(গ) সহায়ক ক্রিয়াগুলো সর্বদা ক্রিয়ার কাল (Tense) ও আসপেক্টের (Aspect) বিভক্তি (inflection) বহন করে।

(ঘ) প্রধান ক্রিয়াগুলোর মত তবে মোডাল (Modal) এবং অক্সিলিয়ারি (Auxiliary) ক্রিয়ার মত নয় , সহায়ক ক্রিয়া ক্রিয়াটি ক্রিয়ার প্যারাডাইমে (Paradigm) সমস্ত অংশে বিদ্যমান।

(ঙ) সহায়ক ক্রিয়ার জন্য ক্রিয়ার গঠনে একটি আলাদা স্থান বিদ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে, মূল ক্রিয়াপদের বা পূর্বক্রিয়ার (Matrix Verb) সাথে অবস্থানরত ক্রিয়াগুলোকে সহায়ক ক্রিয়া বলা হয়। সহায়ক ক্রিয়াগুলো প্রায়শই মূল ক্রিয়াপদের এবং বিশেষ্য কিংবা বিশেষণের সাথে একত্রে জটিল বিধেয় গঠন করে। প্রাথমিক অর্থ নির্দেশক হিসেবে এই মূল ক্রিয়াপদের এবং বিশেষ্য ভূমিকা পালন করে, যেখানে সহায়ক ক্রিয়াগুলো ক্রিয়ার কাল (Tense) ও আসপেক্টের (Aspect) বিভক্তি (Inflection) বহন করে।

৩. এইচপিএসজি (HPSG) তত্ত্ব ও বাংলা ক্রিয়া

হেড-ড্রাইভেন ফ্রেজ স্ট্রাকচার ব্যাকরণ (এইচপিএসজি) একটি বিস্তৃত তাত্ত্বিক কাঠামো যা প্রাকৃতিক ভাষার গবেষণায় বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থবিজ্ঞান উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এইচপিএসজি তত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থবিজ্ঞানের আন্তঃসংযোগের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বৈশিষ্ট্য (Features), পদ প্রকরণসমূহ (Categories), আভিধানিক প্রবেশ (Lexical Entry), নিয়ম (Rules) এবং নীতিগুলির (Principles) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত মৌলিক অনুসন্ধানে দৃষ্টিপাত করে। হেড-ড্রাইভেন ফ্রেজ স্ট্রাকচার ব্যাকরণ (এইচপিএসজি) কাঠামোর লক্ষ্য হল ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং বিশদ ব্যাখ্যা তৈরি করা (Abeille & Borsley, 2021)। এটি চমস্কির সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের (Generative Grammar) এর দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক কারণ এটি ব্যাকরণকে জন্য একটি সীমাবদ্ধতা-ভিত্তিক বাক্যতত্ত্বের (Constraint-based Syntax) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে, যা 'Model Theoretic Syntax' (Pullum & Scholz, 2001). এর নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এইচপিএসজি কাঠামো অনুসারে ভাষার অভিব্যক্তিগুলোকে একটি একক গঠনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়। এটি কেবল একটি একক অনুমান করে না, তা বাক্যিক গঠনকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। চমস্কির মিনিমালিজমের বিপরীতে, এটি সমস্ত বাক্যিক শাখায়নকে (Syntactic Branching) বাইনারি (Binary) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না; এইচপিএসজি সহজ কাঠামো মেনে চলে। মিনিমালিজমের বিপরীতে, এটি কেবল মাঝে মাঝে ধ্বনিতাত্ত্বিকমূলক সীমাবদ্ধ উপাদান ব্যবহার করে।

এইচপিএসজি ভাষাগত উপাদানগুলিকে চিহ্নভিত্তিক (Sign types) একটি সিস্টেম হিসেবে বিবেচনা করে। এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করতে ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য কাঠামোর একটি সেট ব্যবহার করা হয় (Moshier 1988; Pollard and Moshier 1990)। এইচপিএসজি ভাষাগত বস্তুর একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রেণিবিন্যাস, তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির একটি কার্যকরী সনাক্তকরণ এবং সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করে (Abeille & Borsley, 2021)। স্যাগ এবং পোলার্ড (1994) এইচপিএসজির দুটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: PHON এবং SYNSEM যারা সমস্ত ধরণের ভাষিক বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে। এখানে PHON বৈশিষ্ট্য ভাষিক চিহ্নের ধ্বনি এবং SYNSEM বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থবিজ্ঞানের আন্তঃসংযোগকে নির্দেশ করে।

বাংলা ক্রিয়া ও এইচপিএসজি নিয়ে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। উল্লেখযোগ্য গবেষণা হিসেবে সোমা পালের বাংলা যৌগিক ক্রিয়ার এসপিএসজি কাঠামো বিশ্লেষণ (Paul, 2004) রয়েছে। তিনি সীমাবদ্ধতার সূত্র-কৌশল অবলম্বন করে উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যৌগিক ক্রিয়ার পূর্বক্রিয়া (V1) ও সহায়ক ক্রিয়া (V2) কে এইচপিএসজি কাঠামোর AVM (Attribute-value Matrix) তে নিম্নোক্ত উপায়ে প্রকাশ করেছেন,

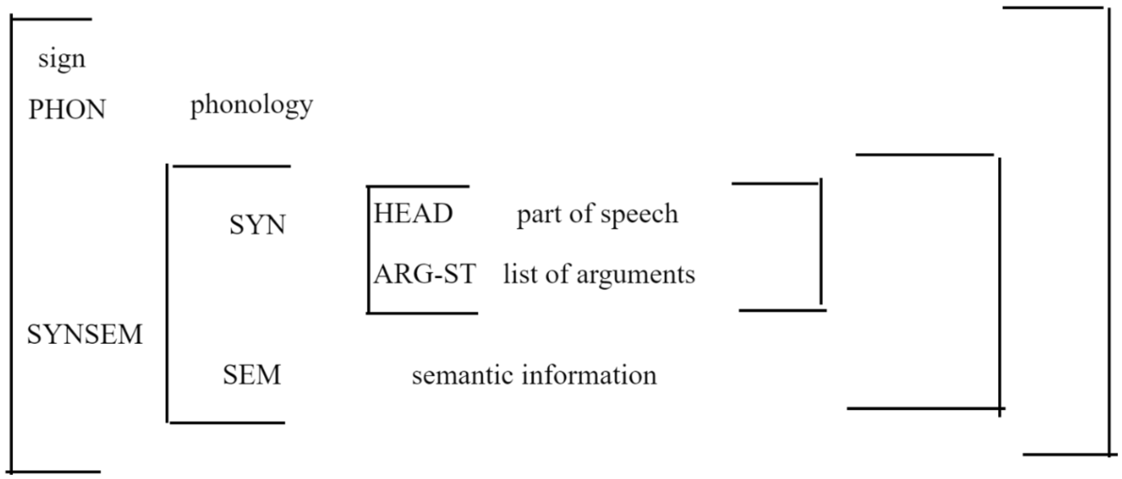

চিত্র-১

নিম্নে 'আমি ইলিশ দেখেছি' বাক্যের 'দেখা' (see) শব্দকে এইচপিসজির AVM (Attribute Value Matrix) পদ্ধতিতে দেখানো হল-

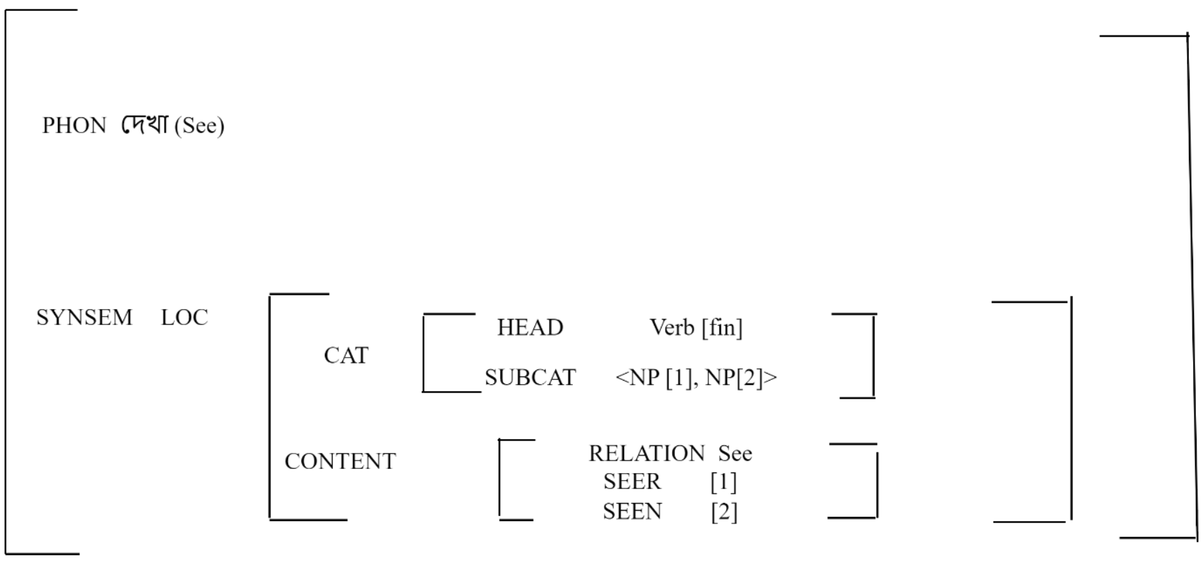

চিত্র-২

চিত্র-২-এ দেখা যায় যে, CAT বৈশিষ্ট্য (Attribute) HEAD এবং SUBCAT উভয় বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতীকটির প্রাথমিক বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাকরণগত ভূমিকা এবং উপশ্রেণিকরণ নির্দেশ করে। বাক্যের অর্থগত দিকটি CONTENT বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। CONTENT মানকে SYNSEM মানও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'দেখা' ক্রিয়াপদটি এমন একটি বিষয়বস্তুর মান ধারণ করে যা দেখার কাজের সাথে সম্পর্ককে নির্দেশ করে, যার মধ্যে পর্যবেক্ষক (SEER) 'আমি' এবং পর্যবেক্ষিতের (SEEN) 'ইলিশ' ভূমিকা জড়িত। এখানে লক্ষণীয় যে, CAT বৈশিষ্ট্যের উপশ্রেণী SUBCAT এ দুটো উপাদানই বিশেষ্য তথা Noun Phrase (NP) যাদেরকে ইনডেক্স (Index) [1] ও [2] দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। CONTENT বৈশিষ্ট্যে উক্ত ইনডেক্স [1], [2] বিদ্যমান। এছাড়া এইচপিএসজি গঠনে CONTEXT (CONXT) মান থাকে (জটিলতা পরিহার করার জন্য চিত্রে দেখানো হয়নি) যা ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্য, ডায়াক্সিস (Deixis) এবং প্রচলিত ইমপ্লিকেচারের (Conventional Implicature) মতো বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন প্রতীকটি একটি একক শব্দ নয় বরং একটি বাক্যাংশ হয়, তখন এটি DAUGHTERS (DTRS) বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে। এই বৈশিষ্ট্যের মান বাক্যিক উপাদান কাঠামোকে (Constituent Structure) কে প্রতিনিধিত্ব করে যা একটি CON-STRUC মান হিসেবে বিবেচিত, যা খণ্ডবাক্যকে (Phrase) নির্দেশ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, এইচপিএসজি কাঠামো মুখ্য দুইটি নীতিতে কাজ করে—

নীতি-১: মুখ্য ফিচার নীতি (HEAD FEATURE PRINCIPLE) (Pollard & Sag, p. 343)

যেকোনো মুখ্য খণ্ডবাক্যের (Headed Phrase) মুখ্য মান (HEAD VALUE) মুখ্য DAUGHTER এর মুখ্য মানের সাথে গঠনগত বন্ধনে (Structure Shared) আবদ্ধ হয়।

নীতি-২: উপশ্রেণীকরণ নীতি (SUBCATEGORIZATION PRINCIPLE) (Pollard & Sag, p. 343)

যেকোনো মুখ্য খণ্ডবাক্যের মুখ্য মানের (HEAD VALUE) SUBCAT মান উক্ত SUBCAT মানের তালিকার DAUGHTER এর SYNSEM মানের সমষ্টির সমান।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গেলে এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে হবে যার প্রকৃতি বর্ণনামূলক (Descriptive)। গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। তাই গবেষণাটি মূলত বর্ণনামূলক।

৪.১ তথ্য সংগ্রহের উৎস

এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য দ্বৈতীয়িক উৎস অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থ, উপন্যাস, পত্রিকা, প্রবন্ধ প্রভৃতি উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.১.১ নমুনাচয়ন

বর্তমান গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন (Purposive Sampling) প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নমুনাচয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়ক ক্রিয়াগুলোকে (পরিশিষ্ট-২) সনাক্ত করা হয়েছে। শুধুমাত্র যুক্ত ক্রিয়াকেই বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

৪.১.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণাটিতে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত সহায়ক ক্রিয়ার সাথে যুক্ত ক্রিয়ার বিশেষ্য ও বিশেষণকে যোগ করে নতুন বাক্য দেখান হয়েছে। হিন্দি ওয়ার্ডনেট থেকে প্রাপ্ত বিশেষ্য ও বিশেষণের জন্য অন্টোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের (Ontological features) সেট (পরিশিষ্ট **১** দ্রষ্টব্য) ব্যবহার করে বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। অতঃপর সেই অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে এইচপিএসজি কাঠামোতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৫.১ বাংলা যুক্ত ক্রিয়া ও অর্থতত্ত্ব

বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে হিন্দি ওয়ার্ডনেট থেকে প্রাপ্ত অন্টোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের (Ontological features) সেট (পরিশিষ্ট **১** দ্রষ্টব্য) ব্যবহার করা হয়েছে। এ অংশে তা বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৫.১.১ একশন, স্টেট, ও ইভেন্ট (Action, State & Event)

অন্টোলজি থেকে দেখা যায় যে, ক্রিয়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান: একশন, স্টেট, ও ইভেন্টকে নির্দেশ করে, যেমন—

(ক) আমার কাজ **শেষ হয়েছে।**
অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: STE [STATE]

(খ) আমি তোমার আচরণে বেশ **অবাক হয়েছি।**
অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: STE [STATE]

এখানে, উদাহরণগুলোতে যুক্ত ক্রিয়ার বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া (উদাহরণ-ক) ও বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়া (উদাহরণ-খ) গঠন লক্ষণীয়। এ দুটি গঠনেই 'স্থিরতাবাচক' অর্থ প্রকাশ পায়। তাই এ দুটি গঠনের অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে STE [STATE]।

(গ) লোকটি তার স্ত্রীকে **খুন করেছে**
অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: ACT[Action]
PHSCLACT [Physical Action]

এখানে উদাহরণ (গ) তে দেখা যাচ্ছে যে, বাক্যের যুক্ত ক্রিয়াটি শারীরিক কোনো ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করছে। তাই ক্রিয়াটির অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ACT [Action] দেখানো হয়েছে।

(ঘ) আমার কাজটা **শেষ হচ্ছে**
অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: EVENT [Event]

এখানে, সহায়ক ক্রিয়া 'হওয়া' এর অর্থতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। 'হওয়া' ক্রিয়ার স্থিরতাবাচকতা প্রকাশ পেয়েছে উদাহরণ (ক) ও (খ) তে, কিন্তু উদাহরণ (ঘ) তেই তার চলমান ঘটমানপ্রবাহ প্রকাশ পেয়েছে।

(ঙ) সন্ত্রাসীরা লোকটি **গুম করেছে**
অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: ACT [Action]
PHSCLACT [Physical Action

(চ) লোকটি **গুম হয়েছে**
অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: STE [State]

এখানে লক্ষণীয় যে, সহায়ক ক্রিয়া 'করা' (উদাহরণ-ঙ) একটি সকর্মক ক্রিয়া যেটির অকর্মক বৈপরীত্য হল 'হওয়া' (উদাহরণ-চ)। সুতরাং একশন, স্টেট, ও ইভেন্ট-এ উপাদানগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পর্ক লক্ষ করা যায়,

(ক) একশন > ইভেন্ট > স্টেট

(খ) ইভেন্ট > স্টেট

(গ) একশন>স্টেট

৫.১.১ এইচপিএসজি কাঠামো ও বাংলা যুক্ত ক্রিয়া

এইচপিএসজির এইচপিএস আর্গুমেন্ট কম্পোজিশন এপ্রোচ (Argument Composition Approach) (Hinrichs and Nakasawa, 1994) এর উপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার এইচপিএসজি কাঠামো দেখানো হয়েছে। আর্গুমেন্ট কম্পোজিশনাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্ত ক্রিয়ার গঠনে সহায়ক ক্রিয়ার সাথে বিশেষ্য ও বিশেষণের মিথস্ক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

নিচের দুটো উদাহরণ লক্ষ করা যাক,

(ক) আজ সকাল থেকে **বৃষ্টি হচ্ছে।**

(খ) *আজ সকাল থেকে **বৃষ্টি করছে।**

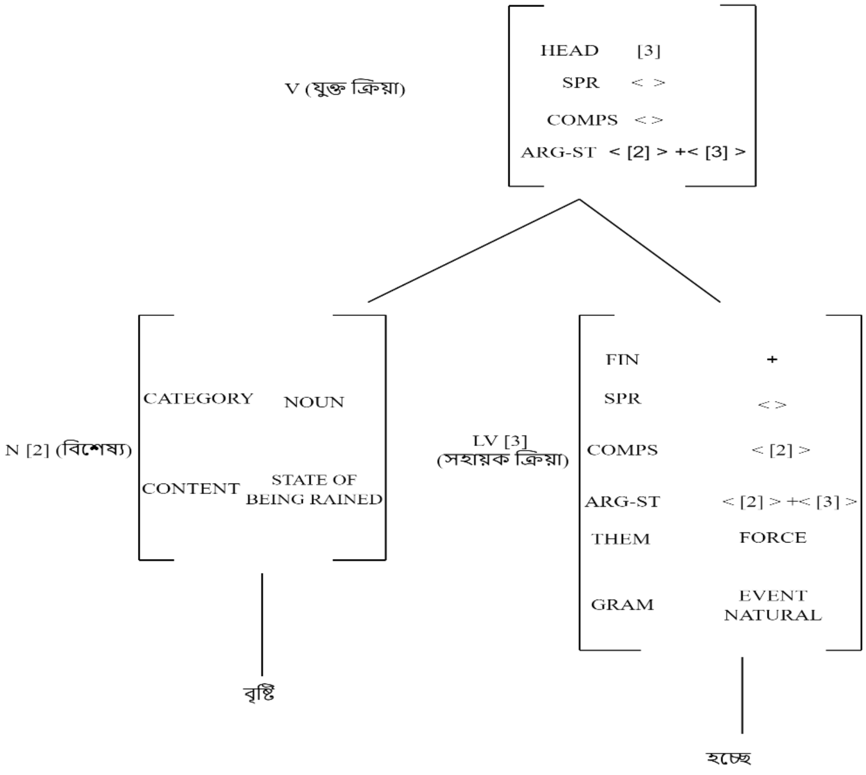

চিত্র-৩: বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার যথাযথ এইচপিএসজি কাঠামো

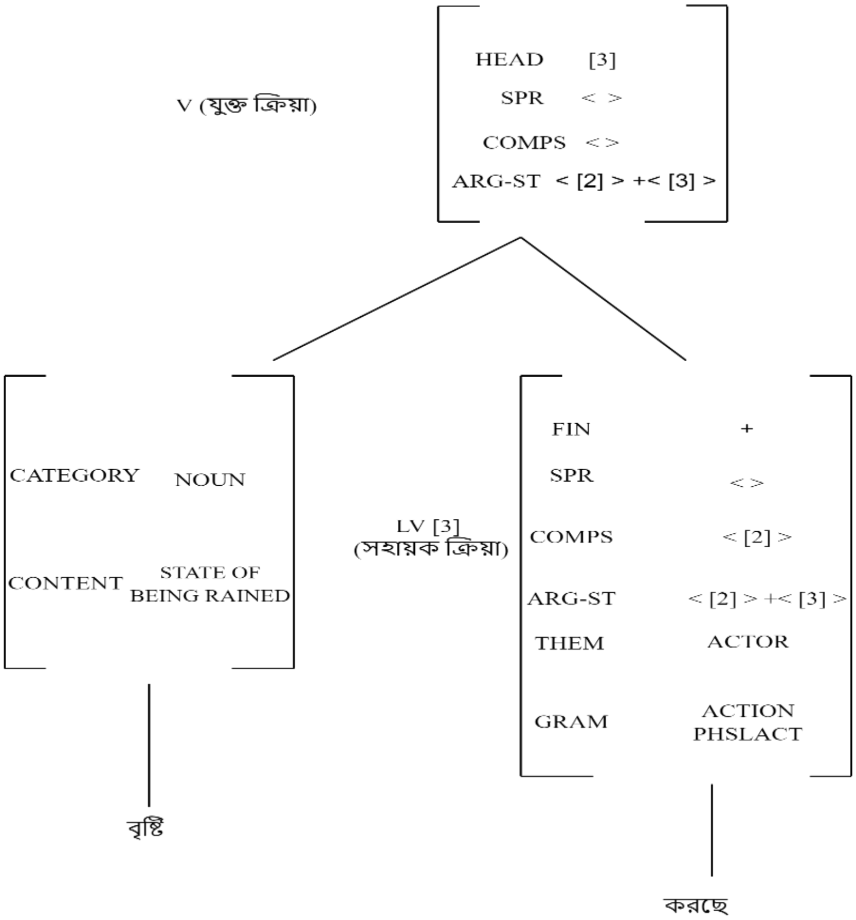

চিত্র-৪: অর্থগত ত্রুটিযুক্ত বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার এইচপিএসজি কাঠামো

উদাহরণ (ক) ও (খ) এযুক্ত ক্রিয়ার বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া গঠন যথাক্রমে চিত্র (৩) ও চিত্র (৪) এ দেখানো হয়েছে। চিত্র (৩) এ যুক্ত ক্রিয়া 'বৃষ্টি হওয়া' একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে নির্দেশ করে। তাই এই বাক্যের এই ক্রিয়া গঠনের অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এইচপিএসজি কাঠামোর THEM ও GRAM উপশ্রেণিতে দেখানো হয়েছে। আবার চিত্র (২) এ যুক্ত ক্রিয়া 'বৃষ্টি করা' অর্থগত ত্রুটি নির্দেশ করে, কেননা বাক্যে (খ) তে বিশেষ্য 'বৃষ্টি'র সাথে সহায়ক ক্রিয়া 'করা' গঠনে অর্থগত সামঞ্জস্যতা রক্ষা হয়নি; প্রাকৃতিক ঘটনা কেউ বলপূর্বক ঘটাতে পারে না। তাই চিত্র (৪) এ বিশেষ্যের CONTENT এর সাথে অর্থগত তথ্য নির্দেশক উপশ্রেণী THEM ও GRAM এর অসামঞ্জস্য সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। একই ঘটনা বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়া গঠনেও ঘটে থাকে, নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক,

(গ) সুমন এ কাজে আগ্রহী হয়েছে

(ঘ) *সুমন এ কাজে আগ্রহী করেছে

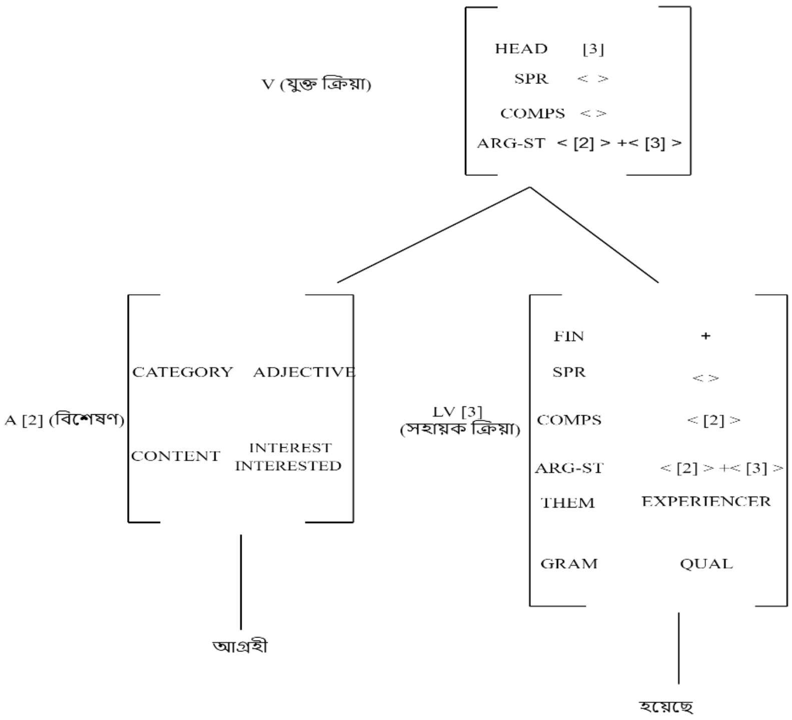

চিত্র-৫: বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার যথাযথ এইচপিএসজি কাঠামো

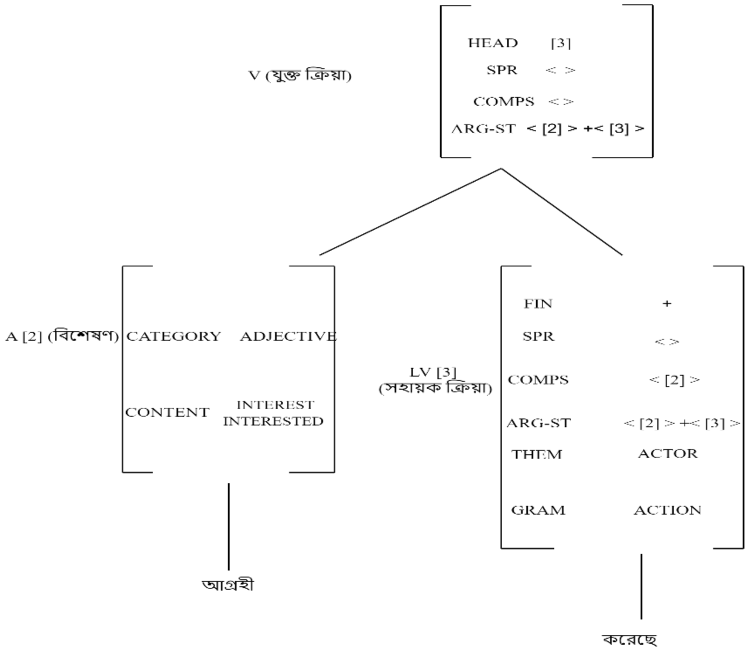

চিত্র-৬: অর্থগত ত্রুটিযুক্ত বাংলা যুক্ত ক্রিয়ার এইচপিএসজি কাঠামো

৬. গবেষণা ফল

(ক) সহায়ক ক্রিয়াই যুক্ত ক্রিয়ার উপাদানগুলোর সম্মিলিত অর্থ সৃষ্টির মূল চালিকাশক্তি।

(খ) সহায়ক ক্রিয়া ও যুক্ত ক্রিয়ার উপাদান বিশেষ্য ও বিশেষণের সাথে অর্থগত সামঞ্জস্যতা জরুরি, নতুবা অর্থগত ত্রুটির সৃষ্টি হয়। এ কারণে যেকোনো সহায়ক ক্রিয়ার সাথে যেকোনো বিশেষ্য কিংবা বিশেষণের সাথে সহসা যুক্ত হতে পারে না।

৭. উপসংহার

বাংলা ভাষার অন্যতম বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে বাংলা যুক্ত ক্রিয়া। এই প্রবন্ধে বিশেষ্য এবং বিশেষণগুলোর সাথে সহায়ক ক্রিয়াগুলোর মিথস্ক্রিয়ার ভাষাবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয়েছে। হিন্দি ওয়ার্ডনেট থেকে প্রাপ্ত বিশেষ্য ও বিশেষণের অন্টোলজিকাল বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃত করে, N-V ও A-V যুক্ত ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হেড-ড্রাইভেন ফ্রেস স্ট্রাকচার ব্যাকরণ কাঠামোতে দেখানো হয়েছে। হিন্দি ও বাংলা ভাষা সিস্টার ভাষা হওয়ার দরুণ হিন্দি ওয়ার্ডনেট ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনা করার সময়কালে বাংলা ওয়ার্ডনেট ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়টিকে গবেষণাটির সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই সিস্টার ভাষা হিন্দির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এছাড়া এখানে তথ্য-উপাত্তের জন্য প্রাথমিক উৎস ব্যবহার করা হয়নি ও উপভাষিক দিকটি বিবেচনা করা হয়নি। ভবিষ্যতে বাংলা ক্রিয়ার উপভাষিক বিচিত্রতা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে যা কম্পিউটেশনাল ভাষাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ

ইসলাম, রফিকুল। (১৯৯৮)। বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সরকার, পবিত্র এবং ইসলাম, রফিকুল (সম্পাদিত)। (২০১১)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ১ম খণ্ড*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

Butt, M. (2005). *Complex predicate compendium.* Tromso (May 2005).

Hindi WordNet. (n.d.). https://doi.org/10.35111/s81s-5n27

Hinrichs, E., & Nakazawa, T. (1994). Linearizing AUXs in German verbal complexes. In *German in head-driven phrase structure grammar* (Vol. 46, pp. 11–37).

Jespersen, O. (1954). *A modern English grammar on historical principles: Part III-syntax.* Routledge.

Müller, S., Abeillé, A., Borsley, R. D., & Koenig, J. P. (2021). *Head-driven phrase structure grammar: The handbook* (Vol. 9). Language Science Press.

Paul, S. (2004). *An HPSG account of Bangla compound verbs with LKB implementation* (Doctoral dissertation, University of Hyderabad).

Pollard, C., & Sag, I. A. (1994). *Head-driven phrase structure grammar.* University of Chicago Press.

পরিশিষ্ট-১

The set of ontological features for Nouns and Adjectives in Hindi Wordnet

2.1 Noun Ontology

The ontology of Hindi nouns is as follows:

- SEMANTIC Attributes
- ANIMT [Animate]
- INANI [Inanimate]
  OBJCT [Object]
- IMGN [Imaginary]
- PHSCL [Physical]
- ARTFCT [Artifact]
- MEDICINE [Medicine]
- CHML [Chemical]
- DRNKBL [Drinkable]
- EDBL [Edible]
- NAT [Natural Object]
- ANTM [Anatomical Object]
- MYTHO [Mythological Object]
- PLACE [place]
- IMGY [Imaginary Place]
- MYTHO [Mythological Place]
- PHSCL [Physical Place]
-
- EVENT [Event]
- FTL [Fatal Event]
- FTFL [Fateful Event]
- HIST [Historical Event]
- NAT [Natural Event]
- PLND [Planned Event]
- SCL [Social Event]
- abs [abstract]
- ACT [Action]
- ANTISCL [Anti-social]
- COMM [Communication]
- OCP [Occupation]
- SCL [Social]
- PHSCLACT [Physical Action]
- ART [Art]
- COGN [Cognition]
- COLOR [Color]
- CONCEPT [Concept]
- INFRM [Information]
- COMM [Communication]

- SYMBL [Symbol]
- MSRMNT [Measurement]
- OBJCT [Object]
- PRCP [Perception]
- POSS [Possession]
- PSYFTR [Psychological Feature]
- QUAL [Quality]
- QUAN [Quantity]
- STYL [Style]
- TIME [Time]
- PRD [Period]
- SSN [Season]
- TITL [Title]
- GRP [Group]
- SCTY [Society]
- ORGZN [Organization]
- POF [Part of]
- STE [State]
- MNTL [Mental State]
- FEEL [Feeling]
- EMOT [Emotion]
- NAT [Natural State]
- SSN [Season]
- WTHR [Weather]
- PHSCL [Physical State]
- PHSSLGCL [Physiological State]
- DIS [Disease]
- BIO [Biological State]
- SCL [Social State]
- PRCS [Process]
- MNTL [Mental Process]
- NAT [Natural Process]
- PHSCL [Physical Process]
- SLD [Solid]

2.2 Adjective Ontology

SEMANTIC ATTRIBUTES
o DESCRIPTIVE

- ACT [Action]
- APPR [appearance]
- CLR [color]
- DPTH [depth]
- DIRCTN [directional]
- EMOT [emotion]
- EXST [existence]

- MSRMNT [measurement]
- NUM [numeral]
- PLACE [place]
- QUAL [qualitative]
- QUAN [quantitative]
- RESP [respective]
- SHP [shape]
- SIZE [size]
- SND [sound]
- SPD [speed]
- STE [stative]
- STRNGTH [strength]
- TSTE [taste]
- TEMP [temperature]
- TIME [time]
- TCH [touch]
- WT [weight]
- DMON [demonstrative]
- INTRO [interrogative]
- REL [relational

পরিশিষ্ট-২

বিশেষ্য-সহায়ক ক্রিয়া গঠন	বিশেষণ-সহায়ক ক্রিয়া গঠন
বিশেষ্য + করা	বিশেষণ + করা
বিশেষ্য + দেওয়া	
বিশেষ্য + নেওয়া	
বিশেষ্য + পাওয়া	
বিশেষ্য + মারা	
বিশেষ্য + রাখা	
বিশেষ্য + তোলা	
বিশেষ্য + হয়া	বিশেষণ + হওয়া
বিশেষ্য + লাগা	বিশেষণ + লাগা
	বিশেষণ + দেখা
বিশেষ্য + নামা	
বিশেষ্য + বসা	
বিশেষ্য + পড়া	
বিশেষ্য + কাটা	

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

প্রজেকশন তত্ত্ব: বাক্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ

প্রণতি ঘোষ

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 07/09/2024
Accepted 08/03/2025

সূচক শব্দ:

চমস্কি,

বাক্য,

'Projection & Principle',
D-structure,
S-Structure,
alpha,
theta theory,
X-bar

অতিথি সম্পাদক

শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে দেখা যাবে, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নোয়াম আব্রাহাম চমস্কির "Syntactic Structurs" গ্রন্থটির প্রকাশ ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারা Generative Linguistics (সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান)-এর সঙ্গে জন্ম দেয়। ক্রমে এর ব্যাপ্তি ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, গণকযন্ত্র প্রভৃতি বিদ্যাচ্যার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। Universal Language-এর ধারণায় মাতৃভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান মস্তিষ্কে আগে থেকেই থাকে। কথা বলার জন্য কোন মানুষকে আলাদা করে ব্যাকরণ শিখে তারপর কথা বলতে হয় না। শিশুর ভাষা শিক্ষা, শব্দ শোনা, তার অর্থ অনুধাবন, সেটিকে গ্রহণ এবং বাক্যে যথাযথ স্থানে তার প্রয়োগ করতে পারা—এই সম্পূর্ণ বিষয়টি মস্তিষ্কের জটিল কলাকৌশলের বিষয়। নিউরো সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত মস্তিষ্কের সেসব নানান জটিল বিষয় আবিষ্কার করে চলেছেন। সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, চমস্কির ১৯৮১-এর "Lectures on Government and Binding" গ্রন্থের P&P বা 'Principles & Parameter' তত্ত্ব অনুযায়ী 'Projection & Principle' সূত্রের আলোকে পুরো বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যাবে, মস্তিষ্কের ভাষা এলাকায় শব্দ নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শর্তের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে একটি বাক্য মুখের ভাষায় সঞ্জনিত হয় অর্থাৎ D-structure থেকে S-structure-এ আসে এবং তারপর সেখান থেকে PF ও LF স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। এবং সেই বাক্য সর্বজনমান্য অর্থাৎ Particular Grammar হোক, কিংবা Universal Grammar সকল ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

আদিম বিচ্ছিন্ন বনচারী মানবজীবন থেকে সভ্যসমাজে পদার্পণকারী মানবের গোষ্ঠীবন্ধনের প্রধান সেতু হল তাঁর বাগযন্ত্র নিঃসৃত ধ্বনিময়, শ্রুতিগ্রাহ্য, অর্থবহ ভাষা। সমাজ গড়ার প্রবণতায় ব্যর্থ অন্যান্য প্রাণীর বিপরীতে ভাষা মানুষকে পরিণত করেছে সভ্য জীবে ও আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছে ক্রমোন্নতির পথে। এককথায় ভাষাই মানুষকে মানুষ করেছে। পৃথক ও স্বতন্ত্র করেছে ইতর প্রাণীর থেকে। ভাষার দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে মানবের বৈশিষ্ট্য মনুষ্যত্ব, মানবিকতা।

Corresponding author's email ID: pronatighosh7@gmail.com

আবহমান কাল ধরে ভাষার মাধ্যমেই মানুষ নিজের মনোগত অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করেছে অন্যের কাছে। অন্যের চিন্তা-ভাবনাকেও গ্রহণ করছে ভাষারই মাধ্যমে। প্রতিনিয়ত মানুষ ভাষার অক্ষসূত্রেই গেঁথে চলেছে তাঁর আবেগ অনুভূতি ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে।

ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী জন লায়েন্স তাঁর 'Chomsky' গ্রন্থে বলেন যে, পৃথিবীর অন্যন্য প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে চিন্তা এবং বুদ্ধিমত্তার যে প্রধান পার্থক্য তা কেবল এই ভাষার দ্বারাই চিহ্নিত করা সম্ভব। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানুষ ব্যতীত অন্যান্য আরও বেশ কিছু প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তাশক্তির ক্ষমতা প্রমানিত হলেও কেবলমাত্র তাদের ভাষাহীনতার জন্যই মানুষ আজ উন্নত প্রাণী।

> "It has often been suggested that man is most clearly distinguished from other animal species, not by the faculty of thought or intelligence, as the standard zoological label 'homo sapiens' might indicate, but by his capacity for language." (John Loyns, 1981, P. 10)

যে ভাষা নিয়ে এত আলোচনা সেই ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, তার সংজ্ঞা নির্ধারণ, ব্যাকরণ নির্মাণ ও আরও বহুবিধ নানান দিক নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা ক্রমাগত বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে নিরন্তর। ভাষা আলোচনার সেই বহুবিধ দিকের মধ্যেকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'বাক্য' সংক্রান্ত আলোচনা। কেননা, আচার্য সুনীতিকুমার প্রদত্ত ভাষার সংজ্ঞাতেই আমরা দেখেছি,

> "মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিস্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, সবতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২০২১, পৃষ্ঠা-০২)

অর্থাৎ ভাষার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে 'বাক্য'। বাক্যের আধারেই পুঞ্জীভূত হয় ভাষার জীবনীশক্তি। তাই প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই প্রাচীনকাল থেকেই 'বাক্য' সংক্রান্ত আলোচনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই 'বাক্য' বা 'Syntax' সংক্রান্ত আলোচনার ধারায় 'বাক্য'-কে কেন্দ্র করে যেমন গড়ে উঠেছে একের পর এক মতবাদ। তেমনি গড়ে উঠেছে 'প্রথানুসারী (Traditional) ব্যাকরণ', 'বর্ণনামূলক (Descriptive) ব্যাকরণ', 'সংগঠনমূলক (Structural) ব্যাকরণ', 'এককালীন বা সমকালীন (Synchronic) ব্যাকরণ', 'বিবর্তনমূলক (Diachronic) ব্যাকরণ', 'সঞ্জননী (Generative) ব্যাকরণ' ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাকরণের ধারা।

ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে, বিশ শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্যে প্রথানুসারী বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আঙ্গিনার বাইরে চার্লস ফার্গুসন, ব্লুমফিল্ড, ফার্দিনান্দ দ্য স্যশুর, নেসফিল্ড, ইয়েসপার্সেন, লায়ন্স, হ্যারিস, নোয়াম আব্রাহাম চমস্কি প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীদের হাত ধরে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নিত্যনতুন দিক উন্মোচিত হতে থাকে। এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায়ও পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে।

পাশ্চাত্যে বিশ শতকের শুরুতে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রাণপুরুষ ফার্দিনান্দ দ্য স্যশুর ভাষা বিশ্লেষণের প্রাচীন পদ্ধতির দিকটি পরিহার করে ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের দিকটিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা শুরু করেন। স্যশুর

প্রবর্তিত ভাষা বিশ্লেষণের এই নতুন ধারাটি প্রতিষ্ঠার জন্য এডওয়ার্ড সাপি (Edward Sapir) এবং লিওনার্ডো ব্লুমফিল্ড (Leonardo Bloomfield) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁদেরকে বলা হত সংগঠনবাদী বা গঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানী। কিন্তু এই সংগঠনমূলক (Structural) ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যেহেতু যে কোন ভাষায় ধ্বনি ও রূপ সসীম কিন্তু বাক্যের পরিমান অসীম তাই বাক্য বিশ্লেষণ এই ব্যাকরণ দ্বারা সম্ভবপর হচ্ছিল না। বাক্য সংক্রান্ত আলোচনার এই পর্যায়ে আবির্ভূত হলেন নোয়াম আব্রাহাম চমস্কি।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নোয়াম আব্রাহাম চমস্কির "Syntactic Structurs" গ্রন্থটির প্রকাশ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। নতুন একটি ধারা Generative Linguistics (সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান)-এর সঙ্গে পরিচিত হন পন্ডিতমহল। যার ব্যাপ্তি ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, গণকযন্ত্র প্রভৃতি বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। এবং পরবর্তীকালে এই সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

সঞ্জননী-ভাষাবিজ্ঞান অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে ভাষা অধিগ্রহণ কৌশল (Language Acquisition Device বা LAD) থাকে। যার ফলে, Universal Language-এর ধারণায় মাতৃভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান তৈরি হয়। কথা বলার জন্য কোন মানুষকে আলাদা করে ব্যাকরণ শিখে তারপর কথা বলতে হয় না। শিশু যখন প্রথম ভাষা শেখে, তখন সে প্রথমে বড়দের মুখের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য শোনে ও তারপর তার অনুকরণ করতে করতে ভাষা শেখে। শব্দ শোনা, তার অর্থ অনুধাবন, সেটিকে গ্রহণ করা এবং বাক্যে যথাযথ স্থানে তার প্রয়োগ করতে পারা—এই সম্পূর্ণ বিষয়টি মস্তিষ্কের জটিল কলাকৌশলের বিষয়। শিশুর babbling-কে আপাতভাবে বাদ দিলেও ধ্বনি উচ্চারণের কিছু কৌশল তার মধ্যে থেকে যায়। নিউরো-সায়েন্সের তাত্ত্বিকগণ ক্রমাগত মস্তিষ্কের সেসব নানান জটিল বিষয় আবিষ্কার করে চলেছেন।

সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, চমস্কির ১৯৮১-এর "Lectures on Government and Binding" গ্রন্থের P&P বা 'Principles & Parameter' তত্ত্ব অনুযায়ী 'Projection & Principle' সূত্রের আলোকে যদি এই পুরো বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব, মস্তিষ্কের ভাষা এলাকায় শব্দ নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শর্তের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে একটি বাক্য মুখের ভাষায় সঞ্জনিত হয়। অর্থাৎ D-structure থেকে S-structure -এ আসে। তারপর সেখান থেকে PF ও LF স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। সেই বাক্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে কিনা, তার থিটা ভূমিকা এবং গঠন স্তর পরস্পর মিলছে কি না, সেটিই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রজকেশন তত্ত্ব বা Projection Principles-এর ক্ষেত্রে চমস্কি মনে করেন যে, শব্দকোষ থেকে নেওয়া উপাদানগুলির শ্রেণি বৈশিষ্ট্য যা থাকবে তা যেন LF-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শর্ত পালিত না হলে বাক্য সুগঠিত (Well formed) হবে না।

> "Representation at each syntactic level i.e., and D-and S-Structure are projected from the lexicon, in that they observe the subcategorization properties of lexical items." [Chomsky. 1981. 29]

সাধারণভাবে Projection বলতে আমরা বুঝি কোন কিছু চোখের সামনে তুলে ধরা। যেমন, কম্পিউটার প্রোজেক্টর মেশিনের এর কাজ হল তার মধ্যে থাকা কোন তথ্যকে প্রজেকশন ওয়াল-এ (Projection wall) ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ প্রোজেক্টর হল একটি হার্ডওয়্যার, সেটিকে দিয়ে একটি সফট্ কপি সফটওয়্যার-এর (soft copy software) মাধ্যমে প্রোজেক্ট (project) করা হয় অন্য একটি জায়গায়। কিন্তু কাজ করছে আসলে হার্ডওয়্যার মেশিনটি (hardware machine)। এই মেশিনটি প্রোজেক্ট করছে কতকগুলি সফটওয়্যার-কে। হার্ডওয়্যারটি হল যন্ত্র। raw materials বা প্রধান উপাদান হিসেবে সফট্ কপিটি (soft copy)-টি হার্ডওয়্যার এর মধ্যেই রয়েছে। সেটিই স্ক্রিন-এ যখন প্রোজেক্ট হচ্ছে সেটিই প্রজেকশন। যা মেশিনের ভিতরে আছে তা কতকগুলি Binary code 0 এবং 1। কিন্তু সেটি যখন কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রোজেক্ট হচ্ছে তখন সেটি লেখা হয়ে সামনে আসছে। ঠিক তেমনি আমাদের মস্তিস্কে প্রত্যেকটি massege এর জন্য programming করা আছে। ফলে এই মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা programming-টি বিষয়টিকে পাঠাচ্ছে। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি শব্দপ্রতীক আছে যেগুলিকে বলা হয় lexicon। এই Lexicon-এর মধ্যেই শব্দগুলির আন্বয়িক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শব্দগুলি কোন উপাদান শ্রেণিভুক্ত সেই পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্যে সেগুলির অবস্থানগত (Contextual) পরিচয় অর্থাৎ কোন প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে সেটিও পাওয়া যায় lexicon বা শব্দকোষের মধ্যে। এই lexiconটিকে একটি structurised অর্থাৎ একটি গঠনের মধ্যে আনা হচ্ছে। সেই শব্দকোষের structure এর নাম হল X-বার।

D-Structure থেকে alpha movement বা আলফা স্থানান্তরণের সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায় S-Structure। S-Structure-এর দুটি প্রকাশগত দিক, PF এবং LF। PF হল Phonetic Represtation বা ধ্বনিতত্ত্বগত প্রকাশ। আর LF বলতে চমস্কি বুঝিয়েছিলেন:

"ব্যাকরণ সম্মত গঠনের ভিতর দিয়ে যে আংশিক অর্থ নির্ধারণ করা যায়"। (চক্রবর্তী, ১৯৯৮)

এই LF বা Logical Form প্রকাশের সময় যে Logic বা যুক্তি প্রকাশ করা হয় তা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, এর একদিকে রয়েছে ব্যাকরণসম্মত গঠনের মাধ্যমে অর্থ নির্ধারণ আর অপরদিকে রয়েছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। D-Structure থেকে S-Structure বাক্য সঞ্জনন এবং সেখান থেকে S-Structure-এর PF ও LF স্তরে যাওয়া ও একটি আদর্শ গ্রহণযোগ্য বাক্য সঞ্জনন এই সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি বেশ কিছু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়েই সম্পাদিত হয়। চমস্কি যাকে বলছেন 'The subsystems of principles'।

সহজ করে বলতে গেলে, ধরা যাক আমরা কোন একটি বিষয়ে কাউকে চিঠি লিখছি, সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যটি যথাযথ ভাবে সেখানে তুলে ধরতে গেলে বাক্যগঠনের, শব্দ ব্যবহারের বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। আবার সেই সঙ্গে চিঠি লেখারও নির্দিষ্ট একটা নিয়ম আছে সেটিকেও মেনে চলতে হয়। তাই ST-র তত্ত্ব অনুযায়ী S-Structure সঞ্জনিত হওয়ার সময় যে সমস্ত সংবর্তনগুলি হত যেমন Passivization, relativization, question formation ইত্যাদি বিষয়গুলিকে P & P তত্ত্বে 'মুভ আলফা' হিসেবে দেখা হতে লাগল। আর এই সংবর্তনের সূত্রগুলিকে চমস্কি ব্যাকরণের মূলসূত্রের অন্তর্গত হিসেবে দেখালেন। একে ব্যাকরণের subsystem বা অবর-পদ্ধতি এবং শর্ত বা principles বলা হয়।

বাক্য গঠনের প্রত্যেকটি আন্বয়িক স্তর, এবং সর্বোপরি সেখান থেকে তা প্রকাশের স্তর এই পুরো বিষয়টি হল Projection। অর্থাৎ আমাদের মস্তিস্কে থাকা Lexicon বা শব্দকোষ থেকে Projection Rule বা প্রজেকশন সূত্র এবং X-bar সূত্রের মাধ্যমে আমরা প্রথমে পাই D-structure বা ডি-গঠন। এখানেই কাজ করে Core Grammar এর থিটা তত্ত্ব। যে বাক্যটি অধোগঠন বা D-structure -এ তৈরি হয় বাক্যের সেই thematic role টি সকল স্তরে বজায় থাকে। এরপর আলফা মুভমেন্টের মাধ্যমে S-structure বা অধিগঠন পাই। মুভ আলফার মধ্যে কাজ করে Bounding theory বা আবদ্ধ করার তত্ত্ব। এই স্তরের মধ্যেই Binding theory, Case theory, Theta theory, Government Theory সমস্ত তত্ত্বগুলিই কাজ করে। এবং Lexicon থেকে থেকে নেওয়া উপাদানগুলির শ্রেণি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ স্তর ও তারপর LF, PF স্তর পর্যন্ত একই থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে D-Structure থেকে বাক্য প্রকাশের স্তর S- Structure -এ আসে। এবং এই পুরো বিষয়টি সম্পন্ন হয় Projection সূত্রের মাধ্যমে। সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি চিত্রের মাধ্যমে এখানে তুলে ধরা হল—

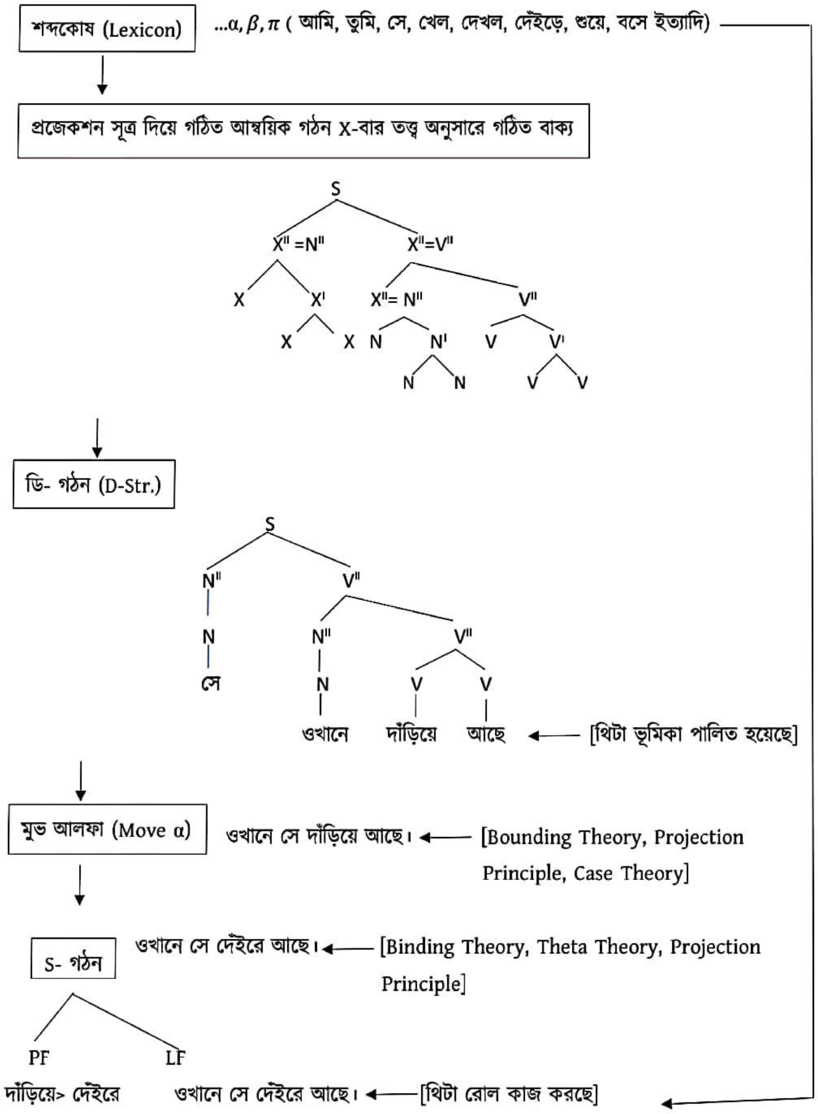

আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে আছে Lexicon বা শব্দকোষ। এবং ভিত্তিকক্ষের মাধ্যমে অধোগঠন সঞ্জনিত হয়। এরপর Syntax-এর মধ্যে আমারা পাচ্ছি দুটি category বা উপাদান শ্রেণি। দুটি category প্রধান হল শব্দ। শব্দ হল কতকগুলি ধ্বনির বিন্যাস। শব্দগুলিকে বলা হচ্ছে lexical category। শব্দকোষে শব্দের অর্থ আর LF-এ পাওয়া বাক্য থিটা ভূমিকা পালন করছে।

এখানে D-গঠনে আমরা বাক্যটি পাচ্ছি, 'সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে' এখানে থিটাতত্ত্ব কাজ করছে। থিটা তত্ত্ব বলতে বোঝায় বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি পদের একটি করে thematic role বা বিষয়বস্তুগত ভূমিকা থাকে। অবশ্য পরবর্তীকালে চমস্কি তাঁর Core Grammmar -এর ক্ষেত্রে এই ধারনাকে নতুনভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি বলেন, শুধু পদের নয়, প্রত্যেকটি argument বা যুক্তির সঙ্গে এক বা একাধিক থিটা ভূমিকা যুক্ত থাকে এবং তা নির্দিষ্ট। থিটা ভূমিকা যুক্ত থাকে বাক্যের Lexical Head-এর সঙ্গে। অর্থাৎ বাক্যের Projection Principle -এর ক্ষেত্রে এই থিটা ভূমিকা সর্বত্র একই থাকবে অর্থাৎ D-Structure -এ থিটা ভূমিকা যা ছিল S-Structure-এ থিটা ভূমিকা তাই থাকবে। যেমন—

D-Structure = 'আমার নাম হয় অনাথ'।

এই বাক্যটি S-Structure-এ এই একই থাকবে। কিন্তু D-Structure থেকে S-Structure-এ বাক্য সঞ্জনিত হওয়ার সময় যদি deletion, addition কিংবা অন্য কোন সংবর্তনের ফলে বাক্যটি হয় 'আমি অনাথ' সেক্ষেত্রে বাক্যটির থিটা ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও বাক্যটি D-Structure-এ 'সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে'-এর পর LF-এ যদি 'টেবিল সে দাঁড়িয়ে আছে' জাতীয় হত তাহলে বাক্যের আন্বয়িক গঠন ঠিক থাকলেও অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া বাংলা বাক্যের এই আন্বয়িক গঠন মানা হলেও পরিচালনার ক্ষেত্রে থিটা ভূমিকা পালিত হত না।

এরপর দেখা যাচ্ছে, D-গঠনে থিটা ভূমিকা পালিত হয়েছে এবং এখানে দেখা গেছে যে, S-গঠনে যে বাক্যটি মুভ আলফা (Move α)-র মাধ্যমে পেয়েছি সেখানে প্রজেকশন প্রিন্সিপল-এর সবকটি দিক পালিত হয়েছে। এখানে কীভাবে পালিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে দেখানো হল।

প্রথমত, S-গঠনে কাজ করছে Bounding theory। Bounding theory হল উপাদান সীমাবদ্ধ করার তত্ত্ব। উপাদানগুলিকে জুড়ে জুড়ে একটি বাক্য তৈরি করে bounding theory। অর্থাৎ একটি বাক্য গঠন করতে গেলে কোন উপাদান কোন স্থানে বসবে সেটি bounding theory-র মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। bounding theory-র দ্বারাই বাক্যে যে কোন উপাদানের স্থানও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে সেটিকে আর অন্য কোথাও movement করানো যায় না। ফলে বাক্যের মধ্যে ওই উপাদানটির স্থান সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আর Binding Theory হল আবদ্ধ করার তত্ত্ব। Bounding Theory-তে আমরা দেখেছি দুটি উপাদান যেখানে জুড়ে যেতে বাধ্য সেখানে উপাদানগুলি একে অপরকে control করছে। যেমন—'খা + আ = খাআ' কখনই বলব না। খুব স্বাভাবিকভাবে মাঝখানে একটি 'ওয়া' শ্রুতি এসে যায়। উচ্চারিত হয় 'খাওয়া'।

Binding Theory-র ক্ষেত্রে সর্বনাম, অ্যানাফর, নামপদ ইত্যাদি পদের সঙ্গে তার সম্ভাব্য পূর্ববর্তী স্তরের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ একটি বিশেষ্যগুচ্ছ অন্য বিশেষ্যগুচ্ছের সঙ্গে কোন অবস্থায় সমসূচক হয় তা Binding Theory-র মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

যেমন—'সে নিজেকে দোষ দিল'

এখানে 'সে' এবং 'নিজেকে'-র মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটি হল Binding Theory। আর 'খা + আ= খাওয়া' এটি হল Bounding Theory। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে 'না' ক্রিয়ার শেষে বসে। ইংরেজি বাক্যের মত সেটি ক্রিয়ার আগে বসতে পারে না। এটি হল Bounding Theory। অর্থাৎ Bounding Theory হল বাধ্যতামূলক আর Binding Theory হল ইচ্ছামূলক।

যেমন—'সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে' এই প্রত্যেকটি উপাদানের স্থান নির্দিষ্ট। এখন এই বাক্যটির যদি আমরা আলফা মুভমেন্ট ঘটাই তাহলে দেখব—

১। ওখানে সে দাঁড়িয়ে আছে।
২। দাঁড়িয়ে আছে সে ওখানে। (marked sentence)
৩। আছে দাঁড়িয়ে সে ওখানে।

এখানে Binding Theory-র শর্ত অনুযায়ী অব্যবহিত একটি উপাদান স্থানান্তরণ সম্ভব হলেও পরবর্তী বাক্যগুলি আর আন্বয়িক শর্ত পালন করছে না। সেখানে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। একে চমস্কি blocking হিসেবে না দেখে barrier হিসেবে দেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, 'ওখানে' শব্দটির বদলে কর্ম হিসেবে যদি 'টেবিল' শব্দটি ব্যবহৃত হত, সেক্ষেত্রে থিটা ভূমিকা পালিত হত না। তার প্রধান কারণ হল, ক্রিয়া অনুসারে নামপদের কারক ভূমিকার শর্তটি পালিত হচ্ছে না। অর্থাৎ ক্রিয়াপদ 'আছে'-র সঙ্গে টেবিল শব্দটি কোন থিটা ভূমিকা তৈরি করে না এবং সেই কারণে কারক-তত্ত্ব সক্রিয় হয় না। তার প্রধান কারণ 'দাঁড়িয়ে আছে' ক্রিয়ার গঠনটি বাক্যের কর্ম হিসেবে অপ্রানীবাচক উপাদান 'টেবিল'-কে পরিচালিত করে না। এই ক্রিয়াপদ সরাসরি কর্ম ছাড়াও কর্তাকে পরিচালিত করতে পারে। অর্থাৎ 'দাঁড়িয়ে আছে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে আমরা কখনই কর্তা হিসেবে 'আমি', 'তুমি', 'আপনি', 'তিনি' এই কর্তাগুলি প্রয়োগ করতেই পারব না। কিন্তু অনেক সময়ই মুখের ভাষায় বিশিষ্ট প্রয়োগ হিসেবে,

'তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে'।
'টেবিল দাঁড়িয়ে আছে'।
'গাছ দাঁড়িয়ে আছে'।
'সময় দাঁড়িয়ে আছে'।

ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োগ হয়। মুখের ভাষায় এই ধরনের অজস্র ব্যবহার আমরা পাই যেখানে শব্দার্থতত্ত্বের ভূমিকাটি আন্বয়িক গঠনের মধ্যে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। যেমন-

‘ও ফ্ল্যাট কেনা যাবে না, অনেক টাকার গল্প’।

এখানে ‘গল্প’ শব্দটি শব্দার্থতত্ত্বের সঙ্গে আন্বয়িক সূত্রের সমসূচক সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে Island বা বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে চমস্কি প্রবর্তিত প্রজেকশন সূত্র দিয়ে বাক্যের আন্বয়িক বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে লোকের মুখের ভাষার ব্যবহারকে মিলিয়ে দেখতে চাইলে নানা ধরনের α-Movement-গত সমস্যা দেখা দেয়। Minimalist Programme অনুযায়ী α-Movement-এর যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার সঙ্গে কারক-তত্ত্ব এবং Projection Principle সমানভাবে যুক্ত থাকে।

বাক্য গঠনের একদম শেষ স্তর অর্থাৎ S-গঠন থেকে PF ও LF। এক্ষেত্রে D-structure এর ‘দাঁড়িয়ে’ S-structure-এ এসে অর্থাৎ মুখের ভাষায় তা ‘দেঁইরে’ তে পরিণত হয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে LF বা অর্থ বোধগম্যতার জায়গায় কোন সমস্যা তৈরি হয়নি।

চমস্কি P&P তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে শব্দকোষের শব্দগুলির ভিতরে বাক্যের আন্বয়িক ভূমিকা যুক্ত থাকে এবং সেখানে শব্দকোষ থেকেই আন্বয়িক বিশ্লেষণের সূত্র নির্মিত হয়। একেই Projection Principle হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন । এখানে বক্তব্য এই যে, সাধারণ আভিধানিক শব্দ আর শব্দকোষে প্রাপ্ত শব্দের পার্থক্য আছে। আংশিক স্ব-বিভক্তিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার শব্দকোষের ব্যাকরণগত শব্দ বা পদ হিসেবে চিহ্নিত হয়, সুতরাং ‘খা’ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন পদ যেমন—‘খায়’, ‘খেল’, ‘খাব’, ‘খাবেন’, ‘খাবি’, ‘খেয়েছিল’ ইত্যাদি পদ নির্বাচনের মাধ্যমেই বাক্যের আন্বয়িক সম্ভাব্য গঠন তৈরি করে দেয়। অর্থাৎ বাক্যের কর্তা কী হবে বাক্যে কর্ম থাকবে কি থাকবে না তা আমরা এখান থেকেই নির্ধারণ করতে পারি। Projection সূত্র সেই নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং বাক্যের PF ও LF গঠন পর্যন্ত স্তরে স্তরে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে থাকে। α-স্থানান্তরণের ফলে D-গঠনের সঙ্গে চূড়ান্ত রূপের PF বা বিন্যাসগত পার্থক্য তৈরি হয়। এই পার্থক্যের ফলে যদি শব্দার্থতত্ত্বগত ঐক্য না থাকে তাহলে সেই α-স্থানান্তরণ ঘটবে না এবং Projection সূত্র লঙ্ঘন করবে।

সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রস্তাব করা যায় যে—

এইভাবে স্তরে স্তরে বাক্য বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে তা Projection সূত্র লঙ্ঘন করছে না, তখনই বাক্যটিকে গ্রহণযোগ্য বাক্য বলা যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Bloomfield, L. Language, London: Allen and Unwin.
Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge: MIT Press. 1965
Chomsky, Noam. Barriers, Cambridge: The MIT Press. 1986

Chomsky, Noam. Language and Mind. UK: Cambridge University Press
Chomsky, Noam. Lectures on Government and Binding, Holland: Foris Publications. 1984
Chomsky, Noam. Syntactic Strucrures Mouton: The Houge. 1957
Chomsky, Noam. The Minimalist Program, Cambridge: The MIT Press. 1995, 2001
Cullicover, Peter W. Principles & Parameters. An Introduction to Syntactic Theory. Oxford: Oxford University Press.
D. Borsley, Robert. Syntactic Theory, A Unified Approach, London: New York
D. Steinberg, Danny. V. Natalia. An Introduction to Psycholinguistics. Taylor and Francis Books India Pvt. Ltd-Manohar. 2020
Edmonds, J.E. A Transformational Approach to English Syntax. New York: Academic Press.
Garman, Michael. Psycholinguistics Cambridge: Cambridge University press. 2000
Garnham, Alan. Psycholinguistics, London: Central Topics. Methuen & Co. Ltd. 1985
Granham, Alan. Psycholinguistics, London: Central Topics, Methueu & Co. Lt d. 1985
Greene Judith. Psycholinguistics, Britain: Penguin Books. 1972, 1979
Greene, Judith. Psycholinguistics, Chomsky and Psychology, Britain: Penguin Books. 1979
Harris, Zelling. S. Structural Linguistics, Phoenix Books. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1966
Harris, Zelling. S. Structural Linguistics. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1996
Horrocks, G. Generative Grammar, Longman. 1993 ,1987
Jespersen, Otto. Language Its Nature Development And Origin, New York: Henry Holt And Company. 1922
Loyns, John. Chomsky, 13^{th} ed, Glasgow: William colins sons and co.Ltd. January 1981
Potter, Simeon. Our Language, Great Britain: Pelican Books. Penguin Books. 1979
Radford, A. Transformational Grammar, Cambridge University Press. 1988
Skinner, B.F. Verbal Behavior, William James Lectures Harvard University. Harvard University Press. 1948
আজাদ, হুমায়ুন. বাক্যতত্ত্ব, ঢাকা: বাংলা একাডেমী. ১৯৮৪
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. চক্রবর্তী, নীলিমা. ভাষাচর্চা-ভাষাপ্রস্থান. শ্রীময়ী প্রকাশনী. জুলাই ২০২২
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা: ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স. ডিসেম্বর ২০০৬
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. মে ২০১২।
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, কলকাতা: এন. চক্রবর্তী আরবিন্দ পাবলিকেশন. ১৫ আগস্ট ১৯৯৮।
চক্রবর্তী, উদয়কুমার. চক্রবর্তী, নীলিমা. ভাষাবিজ্ঞান, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. নভেম্বর ২০১৯।
চক্রবর্তী, নীলিমা. বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব, কলকাতা: ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স. নভেম্বর ২০০৬।
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, একাদশ সংস্করণ. কলকাতা: রূপা পাবলিকেশন ইণ্ডিয়া লিমিটেড. এপ্রিল ২০২১
জানা, শুভেন্দু. সাগরদ্বীপে প্রচলিত ভাষা, কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী. আগস্ট ২০১৮
ভট্টাচার্য, শিশির. সঞ্জননী ব্যাকরণ, ঢাকা: চারু প্রকাশনী. ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮
মজুমদার, পরেশচন্দ্র. বাংলা ভাষা পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. এপ্রিল ২০১৯
মজুমদার, পরেশচন্দ্র. বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. এপ্রিল ২০১৯

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. বাংলা ভাষা পরিক্রমা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. এপ্রিল ২০১৯

মফিজউদ্দীন. ভাষাবিজ্ঞানের পরিধি. কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স. জুলাই ২০১৪

মিশ্র, দিব্যাংশু. সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব পরিভাষাকোষ, T/4, বিধান নগর, মেদিনীপুর. অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ. কলিকাতা পুস্তকমেলা. জানুয়ারি ২০০১

শ', রামেশ্বর. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা: পুস্তক বিপনি. কলকাতা. ফেব্রুয়ারি ২০২০

সেন, সুকুমার. প্রবন্ধ সংকলন ১. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. ডিসেম্বর ২০১৪

সেন, সুকুমার. ভাষার ইতিবৃত্ত. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. আগস্ট ২০১৮

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

চাঁই টেন্সের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি টেন্সের তুলনা

পরিমল মন্ডল

সাহাবাজপুর উমাচরণ হাই স্কুল (উ: মা:)

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 12/09/2024
Accepted 10/03/2025

সূচক শব্দ:

চাঁই,
টেন্স,
সিডিউল কাস্ট,
প্রেজেন্ট,
পাস্ট,
ফিউচার

অতিথি সম্পাদক

শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

চাঁই নামে এক পিছিয়ে পড়া সিডিউল কাস্ট শংসাপত্র প্রাপ্ত জাতি রয়েছে। এদের প্রধান পেশা জমিতে চাষ আবাদ করে ফসল ফলানো। এরা রয়েছে কিছু সংখ্যক বাংলাদেশে, বিহারে, ঝাড়খন্ডে এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দুই দিনাজপুর জেলায়। এই জাতির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, রীতি নীতি আদব কায়দা রয়েছে। বিশেষ করে এদের ভাষা-সংস্কৃতি চোখে পড়ার মতো। চাঁই জাতির ভাষা ব্যাকরণ মেনেই হয়। চাঁইদের ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। চাঁইদের ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি গ্রামারের অনেক মিল লক্ষ করা যায়। বাংলা ও ইংরেজিতে যেমন কাল বা টেন্স তিন প্রকার, তেমনি এই বিশেষ উপজাতির ভাষায়ও কাল তিন প্রকার। এই কালগুলি হল—প্রেজেন্ট টেন্স বা বর্তমান কাল, পাস্ট টেন্স বা অতীত কাল এবং ফিউচার বা ভবিষ্যাৎ কাল। এই প্রধান তিন প্রকারের টেন্সের আবার চারটি করে ভাগ। সুতরাং চাঁইয়েও টেন্স মোট বারো প্রকার। প্রেজেন্ট টেন্সের চারটি ভাগ হলো—(ক) নিত্য বর্তমান (Present Indefinite/Simple Present) (খ) ঘটমান বর্তমান (Present Continuous/Progressive Present) (গ) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect) (ঘ) বর্তমান অনুজ্ঞা (Present Order Command /Injunction, Permission /Advice /Request, Prayer)। পাস্ট টেন্সের চারটি ভাগ হল—(ক) নিত্য অতীত (Past Indefinite /Simple Past), (খ) ঘটমান অতীত (Past Continuous /Past Progressive), (গ) পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect), (ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past)। ফিউচার টেন্সের চারটি ভাগ রয়েছে—(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ (Future Indefinite /Simple Future), (খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Continuous / Progressive Future), (গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (Future Perfect), (ঘ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Imperative Future)।

Corresponding author's email ID: parimalmandal198@gmail.com

কাল (Tense)

ক্রিয়াকে “কাল” কেক্রাকে ক্যাহ্যায়? (What is called the Time /Tense of verb?)
(ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?)

সংজ্ঞা: কোনো কাম (work) ঘ্যট্টাকে স্যাম্যায়কে (time) ক্রিয়াকে কাল ক্যহ্যায়। (The time of happening any work is called Tense or time of Verb.) (ক্রিয়া সংঘটিত হবার সময়কে বলে ক্রিয়ার কাল।)

ভাগ (Division)

ক্রিয়াকে কালকে ক্যা ভাগে ভাক ক্যর‍্যাল যাহ্যাই? কাল-কে তিন ভাগে ভাক ক্যর‍্যাল যাহাই—

১. বর্তমান কাল (Present Tense)
২. অতীত কাল (Past Tense)
৩. ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense)

(১) বর্তমান কাল (Present Tense)

সংজ্ঞা: বর্তমানম্যা যে ক্রিয়া ঘ্যট্যাহ্যায় বা ঘ্যাট্টি গেল্যাহ্যাই বা স্যাপ স্যাম্যায়ে ঘ্যাট্যাহ্যাই, ওক্যার কাল বা স্যাম্যায়কে বর্তমান কাল ক্যাহ্যায়। (বর্তমানে যে ক্রিয়া ঘটে বা ঘটেছে, কিংবা সব সময়েই ঘটে, তার কালকে বলা হয় বর্তমান কাল।) (An action that occurs at present time or has occurred or has been always occurring is called Present Tense.) যেম্যাত্যান,

হ্যাম্ম্যা বই প্যাহ্যাড়িহি (I read book.)
য়ু খেল্যাহ্যাই। (He/She is playing.)
সুরুজ ডুব্যাহ্যাই। (The sun sets.)

চাঁইম্যা “বর্তমান কাল” চার র‍্যাখ্যাম —

(ক) নিত্য বর্তমান (Present Indefinite /Simple Present)
(খ) ঘটমান বর্তমান (Present Continuous /Progressive Present)
(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect)
(ঘ) বর্তমান অনুজ্ঞা (Present Order Command /Injunction, Permission /Advice /Request, Prayer)

(ক) নিত্য বর্তমান (Present Indefinite/Simple Present):

সংজ্ঞা: জানামানাক্যারিকে যে ক্রিয়া বর্তমানম্যা ঘ্যাট্ট্যাহ্যায় বা ঘ্যাটতেয়ে র‍্যাহ্যায়, ওক্রাকে ক্যাহ্যায় নিত্য বর্তমান। (Usually an action that occurs or daily occurs at present is called Present Indefinite Tense.) (সাধারণভাবে যে ক্রিয়া বর্তমানে ঘটে, বা নিত্যই ঘটে, তাকে বলা হয় নিত্য-বর্তমান।)

অ্যাই কাল বুঝাব্যালা ক্রিয়াকে জ্যাড়কে (root of verb/ধাতু) স্যাঙে ‘ইহি’, ‘অ্যাহ্যান’, ‘হ্যায়’ ক্রিয়াবিভক্তি যোক ক্যর‍্যা হোহ্যায়। বাংলাতে ‘ই’, ‘অ’, ‘এন’, ‘ইস’, ‘এ’ ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেম্যাত্যান,

হ্যাম্মা ভাত খাহি। (I eat rice.)-আমি ভাত খাই।
হামরা বই প্যহ্যাড়িহি। (We read book.)-আমরা বই পড়ি।
ত্যাঁই ফুটবেল খেল্যাহ্যান। (You play football.) – তুমি ফুটবল খেলো।
তোরা ঘাস ক্যাট্ট্যাহ্যান। (You mow/cut grass.) – তোমরা ঘাস কাটো।
য়ু রোইচ দ্যাউড়্যহ্যায়। (He/She runs daily.) – সে প্রতিদিন দৌড়ায়।
সুরুজকে চারোকোড়ে পৃথিবী ঘুর‍্যহ্যায়। (The earth moves round the sun.) – সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে।
নেতাজী সুভাষ আজাদ হিন্দ ফ্যাউজ ব্যন্যালক্যহ্যাই। (Netaji forms /builds the Azad Hind Fouz.) – নেতাজী সুভাষ আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন করেন।

(খ) ঘটমান বর্তমান (Present Continuous/Progressive Present):

সংজ্ঞাঃ- বর্তমানম্যা যে ক্রিয়াকে কাম শুরু হোকেও শেষ ন্যায় হোল্যহ্যায়, ম্যানে, যে ক্রিয়াকে কাম অ্যাখনিও চ্যাললে যাহায়, ওক্রাকে ক্যহ্যায় “ঘটমান বর্তমান”। (An action continues in the present for some time) (বর্তমানে যে-ক্রিয়ার কাজ আরম্ভ হয়েও শেষ হয়নি, অর্থাৎ যে-ক্রিয়ার কাজ এখনও চলছে, তাকে বলা হয় ঘটমান-বর্তমান।)

বিভক্তি গালা হোল্যায় ‘হি’, ‘হান’, ‘অ্যাহায়’।

‘নিত্য বর্তমান কাল’কে স্যাঙম্যা খ্যালি “অ্যাখনি” (now) কাথাটা জোড়িকে (adding) অ্যাই Tense বা কাল হোহ্যায়।

বাংলা বিভক্তি হল – ছি, ছ, ছে। উদা:

হ্যাম্মা অ্যাখনি ভাত খাহি। (I’m eating rice now.) - আমি এখন ভাত খাচ্ছি।
তোরা অ্যাখনি হ্যাল চাষ্যহ্যান। (You’re ploughing now.) - তোমরা এখন লাঙল দিচ্ছ।
য়ু অ্যাখনি পোরলা তোড়্যহ্যায়। (He’s plucking parble now.) - সে এখন পটল ভাঙছে।
ওকরা মাঠম্যা অ্যাখনি কুসিয়ার গাড়্যহ্যাই। (They’re planting sugarcane in the field now.)- তারা এখন মাঠে আঁখ লাগাচ্ছে।

(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect Tense):

সংজ্ঞাঃ- ত্যান্টি ক্ষুন আগে যে কাম হোল্যহ্যাই বা হোগেল্যহ্যাই, কিন্তো যেক্যার ফ্যাল অ্যাখনিও বর্তমান, ওক্যার স্যাম্যায়কে ক্যাহ্যায় পুরাঘটিত বর্তমান। (The action has already finished but its effect still exists is Present Perfect Tense) (কিছুক্ষণ আগে যে-ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে, অথচ যার ফল এখনও বর্তমান, তার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান।)

অ্যাই কাল বুঝাব্যা জুন্নে ক্রিয়াকে জ্যাড়কে শেষে কোড়ে "অ্যাইলি", "অ্যাইলে", "অ্যাই " বা "হো গেল্যাই", "হো গেল্যাউ" লাগাব্যলা হোহ্যাই। বাংলায় ক্রিয়ার শেষে – এছি, এছ, এছে। উদা:

হ্যাম্ম্যা ভাত খ্যাইলি/হাম্ম্যার ভাত খাল হোগেল্যাই। (I've eaten rice.) - আমি ভাত খেলাম।
হামরা ভাত খ্যাইলি/হাম্ম্যারক্যান ভাত খাল হোগেল্যাই। (We've eaten rice.) - আমরা ভাত খেলাম।
ত্যাঁই ভাত খ্যাইলে/তোর ভাত খাল হোগেল্যাউ। (You've eaten rice.) - তুমি ভাত খেলে।
তোরা ভাত খ্যাইলে/তোরক্যান ভাত খাল হোগেল্যাহ্যাউ। (You've eaten rice.) - তোমরা ভাত খেলে।
য়ু ভাত খ্যালক্যাই। (He's /She's eaten rice.) - সে ভাত খেলো/খেয়েছে।
দেবনা ম্যাচ্ছি মারক্যাহ্যাই। (Debna has caught fish.) - দেবেন মাছ ধরেছে।
ওক্যারক্যান ভাত খাল হোল্যাই। (They've eaten rice.) - তারা ভাত খেয়েছে।

(ঘ) বর্তমান অনুজ্ঞা:

সংজ্ঞা: আদেশ (order/command) ওনুরোত (request/prayer); নিষেত (injunction) অ্যাইগ্লাকে জুন্নে যে ক্রিয়াকে বেবোহার হোহ্যায় ওকরাকে বর্তমান অনুজ্ঞা ক্যহ্যায়। (আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, প্রার্থনা প্রভৃতি অর্থে যে-ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে অনুজ্ঞা। ঐ ক্রিয়া বর্তমান কালের হ'লে তাকে বর্তমান অনুজ্ঞা বলে।

আদেশ (order/command):
অ্যাখনিয়ে যো (Go now.) – এক্ষুনি যাও।
চ্যাল যো ক্যাইহ্যাউ। (I say, go.) - চলে যাও, বলছি।
উপদেশ (Advice):
আচ্ছাসে চ্যাল। (Behave well.) - ভালো হ'য়ে চলো।
ওনুমতি (Permission/Consent):
আব্যা পারিক। (May I come in.) - আসতে পারি।
ওনুরোত (Request /Prayer):
দায়া ক্যারিকে হামরাকে বাচ্যা। (Please, help me/Kindly, save me.) - অনুগ্রহ করে, আমাকে রক্ষা করো।

নিষেত (Injunction):

হুঁম্যা যাঁমু। (Don’t go there.)-সেখানে যেওনা।

ঝুটঠা কাথা বোল্যামু। (Don’t tell a lie.)-মিথ্যা বলো না।

(২) অতীত কাল (Past Tense)

ওতীতকালকে চারভাকম্যা ভাক ক্যার‍্যাল যাহায়। যেম্যাত্যান—

(ক) নিত্য ওতীত (Past Indefinite/Simple Past),
(খ) ঘটমান ওতীত (Past Continuous/Past Progressive),
(গ) পুরাঘটিত ওতীত (Past Perfect),
(ঘ) নিত্যবৃত্ত ওতীত (Habitual Past)

(ক) নিত্য অতীত (Past Indefinite/Simple Past):

সংজ্ঞা: যে ক্রিয়াকে কাম আগে হোগেল্যাহ্যায়, ওক্যার কালকে নিত্য ওতীত ক্যাহ্যায়। (Past Indefinite tense is used when the work was done in the past) (সাধারণভাবে যে-ক্রিয়ার কাজ পূর্বে অর্থাৎ, অতীতে সম্পূর্ণ হয়েছে তার কালকে বলা হয় নিত্য-অতীত।)

অ্যাই কাল বুঝাব্যলা ক্রিয়াকে জ্যাড় (root of verb) বা ধাতুকে শেষে কোড়ে “ইহ্যায়”, “ল্যাহ্যান”, “লেলক্যাহ্যায়” ক্রিয়াবিভক্তি লাগাব্যা হোহ্যায়।

বাংলায় বিভক্তি হল – লাম, লে, ল। উদা:

হ্যাম্ম্যা স্কুল ছোড়ি দেলিহ্যায়। (I left the school.) - আমি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম।
হামরা হ্যাম্ম্যারক্যান ঠাকুরদাদাকে ন্যায় দেখলিহ্যায়। (We didn’t see our grandfather.) - আমরা আমাদের ঠাকুরদাদাকে দেখিনি।
ত্যাঁই স্কুল গেল্যাহ্যান। (You went to school.) - তুমি স্কুল গিয়েছিলে।
মেল্লেদিন আগে রামকে মা ম্যারি গেল্যাহ্যায়। (Ram’s mother died long ago.) - রামের মা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছিল।

(খ) ঘটমান অতীত (Past Continuous/Progressive Past):

সংজ্ঞা: আগে যে ক্রিয়াকে কাম হোতে হ্যাল্যায় আর ত্যাখনিও যেটা স্যাম্পূর্ণ ন্যায় হোল্যাহ্যায় ওক্যার কালকে ক্যাহ্যায় ঘটমান ওতীত। (Past Continuous Tense is used when the work was continued for a period in the past.) (পূর্বে যে-ক্রিয়ার কাজ হচ্ছিল এবং তখনও যা সম্পূর্ণ হয়নি, তার কালকে বলা হয় ঘটমান-অতীত।)

ক্রিয়াকে জ্যাড়কে শেষম্যা “হ্যালি”, “হ্যাল্যাস”, “হ্যাল্যায়” ক্রিয়াবিভক্তি যোক ক্যারিকে অ্যাই কাল বুঝাল যাহায়।

বাংলা বিভক্তি হল—ছিলাম, ছিলে, ছিল। উদা:

হ্যাম্ম্যা ভাত খ্যাইতে হ্যালি। (I was eating rice.) - আমি ভাত খেতে ছিলাম/খাচ্ছিলাম।
তোরা ভাত খ্যাইতে হ্যাল্যাস। (You're eating rice.) - তোমরা ভাত খেতে ছিলে।
ওকরা ভাত খ্যাইতে হ্যাল্যায়। (They're eating rice.) - তারা ভাত খেতে ছিল।

(গ) পুরাঘটিত ওতীত (Past Perfect Tense):

সংজ্ঞাঃ- ম্যাল্লে আগে যে ক্রিয়াকে কাম হোগেল্যাহ্যাই, ওকরাকে ক্যাহ্যায় পুরাঘটিত ওতীত। (An action that had occurred in the long past.) (অনেক পূর্বেই যে ক্রিয়ার কাজ ঘটেছিল, তাকে বলা হয় পুরাঘটিত-অতীত।)

“হোগেল্যাহ্যায়”, “হোগেল্যাহ্যাউ” ক্রিয়াবিভক্তি যোক ক্যার্যালা হোহ্যাই।

বাংলা বিভক্তি হল – এছিলাম, এছিলে, এছিল। উদা:

ত্যাখনি হ্যাম্মার ভাত খাল হোগেল্যাহ্যায়। (Then I had eaten rice.) - তখন আমার ভাত খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।
তোর ভাত খাল হোগেল্যাহ্যাউ। (You had eaten rice.) - তোমার ভাত খাওয়া হয়েগিয়েছিল।
ডোমনাকে ব্যাইগ্যান বেচ্যাল হোগেল্যাহ্যাই ত্যাখনি। (Domna had sold brinjal then.) - ডমেন-এর তখন বেগুন বিক্রি করা হয়ে গিয়েছিল।
ওক্যারক্যান র‍্যামপোরলা তোড়্যাল হোগেল্যাহ্যায়। (They had plucked ladies finger.) - তাদের ঢ্যাঁড়স ভাঙা হয়ে গিয়েছিল।

(ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past):

সংজ্ঞা: আগে যে ক্রিয়াকে কাম কুচ্ছু স্যম্যায় ধ্যারিকে চ্যল্ল্যাইক বা নিয়োমম্যাত্যান যে কাম হোইক বা হোতিয়ে র‍্যাহ্যাইক, ওক্যার কালকে ক্যহ্যায় নিত্যবৃত্ত -ওতীত। (It refers a habit that regularly happened in the past.) (পূর্বে যে-ক্রিয়ার কাজ কিছুকাল ধরে চলত বা নিয়মিত ভাবে যে-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হত, তার কালকে বলা হয় নিত্যবৃত্ত-অতীত।)

“ইক”, “অ্যাস”, “অ্যাইক” ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুকে (root of verb জ্যাড়) শেষেকোড়ে লাগাকে অ্যাই কাল হোহ্যাই।

বাংলায় বিভক্তি হল- তাম, তে, ত। উদা:

রোইচ ভোরকে হ্যাম্ম্যা ইংরেজি প্যাহ্যাড়িক। (Daily I used to read English in the morning.) - প্রতিদিন সকালে আমি ইংরেজি পড়তাম।

হামরা ভাটিয়াবেলা আমকে বাগানম্যা চিতপ্যাট খেলিক। (We used to play Chitpat at afternoon in the mango grove.) - আমরা আমের বাগানে চিৎপট খেলা খেলতাম।

ত্যাঁই রাতকেবেলা অঙ্ক ক্যার‍্যাস। (You used to solve mathematics at night.) - তুমি রাত্রিবেলা অঙ্ক কষতে।

লোতকি বিছ্যাউনাম্যা রাতকে মুতি দেইক। (Lotki used to urinate in the bed at night.) - লতিকা রাত্রিবেলা বিছানায় প্রস্বাব করে দিত।

ওকরা স্কুলম্যা কাবাটি খেল্যাইক। (They used to play Kabadi at school.) - তারা স্কুলে কবাডি খেলত।

(৩) ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense)

ভবিষ্যৎ কালকেও চারটা ভাকম্যা ভাক ক্যার‍্যাল যাহাই। যেম্যাত্যান —

(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ (Future Indefinite /Simple Future),
(খ) ঘটমান – ভবিষ্যৎ (Future Continuous/ Progressive Future),
(গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (Future Perfect),
(ঘ) ভবিষ্যৎ – অনুজ্ঞা (Imperative Future)।

(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ (Future Indefinite /Simple Future):

সংজ্ঞা: যে ক্রিয়াকে কাম প্যারে বা ভবিষ্যৎম্যা হোত্যাই, ওক্যার কালকে ক্যহ্যায় সাধারণ ভবিষ্যৎ। (Future Continuous tense is used when the doer will do the work in future.) (পরে যে-ক্রিয়ার কাজ অনুষ্ঠিত হবে, তার কালকে বলা হয় সাধারণ-ভবিষ্যৎ।)

অ্যাই কাল বুঝাব্যলা ধাতুকে (root of verb জ্যাড়) শেষম্যা “প”, “ইবে”, “ত্যাই” ক্রিয়াবিভক্তি যোক হোহ্যাই। বাংলায় বিভক্তি হল–ব, ইবে, বে। যেম্যাত্যান:

হ্যাম্ম্যা ক্যালখিনা স্কুল যাপ। (I shall go to school tomorrow.) - আগামীকাল আমি স্কুল যাব।

হামরা পূজা ক্যর‍্যাপ। (We shall worship.) - আমরা পূজা করব।

ত্যাঁই ভাত খ্যাইবে। (You will eat rice.) - তুমি ভাত খাবে।

তোরা মানুষকে ম্যাত্যান মানুষ হোবে। (You will be man like man.) - তোমরা মানুষের মতো মানুষ হবে।

য়ু একটা প্রফেসার হোত্যাই। (He/She will be a professor.) - উনি একজন অধ্যাপক হবেন।

রাম আর জ্যামি চাষ ন্যায় ক্যারত্যাই। (Ram will not till land more.) - রাম আর জমি চাষবে না।

ওকরা বেটাবেটিকে বিহা সাদি দেত্যাই। (They'll give marriage of their sons and daughters.) - তারা ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেবে।

(খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Continuous /Progressive Future):

সংজ্ঞা: প্যারে যে ক্রিয়া (কাম) ঘ্যাটতে র‍্যহ্যাত্যাই, ওক্যার কালকে ক্যহ্যায় ঘটমান – ভবিষ্যৎ। (Future Continuous tense is used when the doer will be doing a work.) (পরে যে-ক্রিয়া ঘটতে থাকবে, তার কালকে বলা হয় ঘটমান ভবিষ্যৎ।)

অ্যাই কাল বুঝাব্যলা অ্যাসস্যাল ধাতুকে স্যাঙম্যা "ইতে" (তে), আর ওক্যার প্যার" র‍্যহ্যা" ধাতুকে শেষম্যা "প", "ইবে", "ত্যাই" ক্রিয়াবিভক্তি যোক ক্যর‍্যা হোহ্যাই।

বাংলা ক্রিয়া-বিভক্তি হল- ব, বে, বি। উদা:

হ্যাম্ম্যা ব্যাখরি চ্যর‍্যাইতে র‍্যহ্যাপ। (I shall be grazing goat.) - আমি ছাগল চরাতে থাকব।
ত্যাঁই চাখরি ক্যারতে র‍্যহ্যাইবে। (You will be doing service.) - তুমি চাকরি করতে থাকবে।
য়ু ঘোঁড়াকে ঘাস ক্যাটতে র‍্যহ্যাত্যাই। (He/She will be mowing grass for horse.) - সে গোড়ার ঘাস কাটতে থাকবে।
কালুয়া ভিক্কা চ্যহ্যাইতে র‍্যহ্যাত্যাই। (Kalua will be begging /will be asking for alms.) - কালু ভিক্ষা চায়তে থাকবে।
ওকরা হাম্ম্যারক্যান কুটুম হোকে র‍্যহ্যাত্যাই। (They will be our relative.) - তারা আমাদের আত্মীয়-স্বজন হয়ে থাকবেন।

(গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (Future Perfect):

সংজ্ঞা: আগে যে ক্রিয়া ঘ্যাট্টিকে র‍্যহ্যত্যাই, ওক্যার কালকে (time) ক্যহ্যায় পুরাঘটিত – ভবিষ্যৎ। (Future Perfect tense is used when the doer will have done the work.) (পরে যে-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে, তার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত-ভবিষ্যৎ।)

মূলধাতুটাকে স্যাঙম্যা "কে" আর প্যারেকে ধাতু "র‍্যহ্যা" কে স্যাঙম্যা "প", "ইবে", "ত্যাই" লাগাব্যলা হোহ্যাই।

বাংলায় ক্রিয়া-বিভক্তি হল- ব, বে, বি। উদা:

ত্যাঁই হামরাকে ঐদিন ভুল বুঝিকে র‍্যহ্যাইবে। (You will have misunderstood me that day.) - তুমি সেদিন আমাকে ভুল বুঝে থাকবে।

(ঘ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative):

সংজ্ঞা: ভবিষ্যৎ কালম্যা আদেশ, ওনুরোত অ্যাইগ্লা বুঝাব্যলা যে ক্রিয়া ল্যগ্যহ্যাই, ওক্রাকে ক্যহ্যাই ভবিষ্যৎ – অনুজ্ঞা। (It is referred order, request, advice etc. in the future.) (ভবিষ্যৎ কালে আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা প্রভৃতি অর্থে যে-ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞা।) উদা:

আদেশ (order):

> ক্যাল হ্যম্ম্যার স্যাঙে দেখা ক্যারবে । (You will have to meet with me tomorrow.) - আগামীকাল আমার সাথে দেখা করবে।

ওনুরোত (request):

> বইটা ক্যাল লেকে অ্যাইবে। (Kindly, you'll bring the book.) - অনুগ্রহ করে বইটি আগামীকাল নিয়ে আসবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বসু, মনোজিৎ এবং চৌধুরী, ড. প্রদীপ; রচনা ভারত; পুনর্মুদ্রণ মার্চ, ২০০৪.
২. মুখোপাধ্যায়, ড. বৈদ্যনাথ এবং মৈত্র, সুদেষ্ণা; প্রান্তিক মাধ্যমিক ভাষা ভাবনা বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (প্রথম ভাষা); পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারী, ২০২২.
৩. চক্রবর্তী, বামনদেব; উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ; পরিবর্ধিত অষ্টাদশ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১৩
৪. Concise Oxford Dictionary; O. U. P.
৫. Nesfield, J. C. & Others; Compiled by Dr. R. P. Paul, S. M. Tribedi; A Unique English Grammar, Composition & Translation; Fourth Edition, April 2002.
৬. চাঁই কবি প্রকাশ মন্ডল – মোবাইল নং – ৮৬৩৭০৮৭০৩৫/৯৮৫১০৩৫০৯৪
৭. চাঁই আদি কবি চন্দন মন্ডল – মোবাইল নং – ৭৬০২৭৫৪৪৮৮
৮. মন্ডল, ড. সুনীল চন্দ্র; পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা – সাহিত্য ও সংস্কৃতি; ১৯৮৪
৯. An Open Discussion with Dr. Biju Chain, a retired Prof. of North Bengal University, Darjeeling.
১০. পাল, ড. অনিমা; পশ্চিমবঙ্গের চাঁই উপভাষার সমীক্ষা।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL
Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

ভাষা দ্বারা রহস্যের আবহ নির্মাণ: প্রসঙ্গ পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল

দেবলীনা সেন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 03/12/2024
Accepted 03/04/2025

সূচক শব্দ:
তুর্কি আক্রমণ,
প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা ভাষা,
মঙ্গলকাব্যের ভাষা,
অপরাধমূলক আখ্যানের ভাষাশৈলী।

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

প্রীতম বসুর *পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল*-এর প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০১৫। একুশ শতকে লেখা এই উপন্যাসের ভেতরে লেখক নির্মাণ করতে চাইলেন ১৪০০ সালের বাংলাদেশকে। উপন্যাসের মধ্যে দেখা গেল ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবাংলার পাঁচমুড়ো নামক এক গ্রামের চয়নবিলের তলা থেকে আবিষ্কৃত হল পাথরে খোদাই করা ১৪০০ সালের কথ্য বাংলা ভাষা ও লিপিতে রচিত *পঞ্চাননমঙ্গল।* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের অল্পবিস্তর পড়াশোনা রয়েছে তারা জানেন, ১২০০ থেকে ১৪৫০ অব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য কেমন ছিল, তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কারণ এক বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ। দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে পূর্ব-ভারতে তুর্কি আক্রমণ শুরু হয়। দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলি সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হয়, বুদ্ধি-বিদ্যায় যে সব মানুষেরা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় তাঁরা বিপন্ন হন। মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর অধীনে তুর্কি সওয়ার অতর্কিতে বাংলা আক্রমণ করলে রাজশক্তি বা জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেদিন আক্রমণকারীকে হটিয়ে দিতে পারল না, যার ফলে পরবর্তী দুশ বছর ধরে বাংলাদেশ অনিশ্চয়তা এবং অরাজকতার ঝড়ে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। নালন্দার পাশাপাশি ধ্বংস হতে লাগল বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যের উপাদানগুলি বা এককথায় নষ্ট হল বাঙালির আত্মপরিচয়। *চর্যাপদ*-এর পরে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ছাড়া মাঝে আর কোনো সাহিত্যিক টেক্সট আমাদের হাতে নেই। প্রীতম বসু তাঁর এই উপন্যাসে ওই অন্ধকার যুগটিতে আলো ফেলতে চাইলেন। আমরা পূর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে দেখতে চাইব একুশ শতকে দাঁড়িয়ে লেখক কীভাবে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নির্মাণ করছেন এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। সেকালের আবহটিকে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে লেখকের ভাষা প্রকল্পটি ঠিক কেমন? আমরা দেখতে চাইছি, *পঞ্চাননমঙ্গল*, যার উপরের তলে দেবতা পঞ্চাননের বন্দনার আড়ালে সাংকেতিক ভাষায় লুকিয়ে রাখা আছে উচ্চ গণিত, দর্শন, বিজ্ঞানের নানান সব সূত্র—সেই কাল্পনিক মঙ্গলকাব্যটি তার ভাষিক এবং সাহিত্যিক গুণে কি আদৌ সার্থক বাংলা মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে? আদৌ কি এই কাব্য ছুঁতে পেরেছে সেই হারিয়ে যাওয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন কালকে?

Corresponding author's email ID: debolinasen740@gmail.com

এই উপন্যাস কেবল ইতিহাস-আশ্রিত নয়, সাথে সাথে একে অপরাধমূলক আখ্যানও বলা চলে, তবে গোয়েন্দা কাহিনির পর্যায়ভুক্ত একে করা যায় না। বাংলা অপরাধমূলক আখ্যানের ধারায় যেখানে দেখা গেছে প্রাচীন পুথি চুরি, পুথি জালের মত অপরাধ, সত্যজিৎ যেখানে লিখে ফেলেন হত্যাপুরী, তার সঙ্গে এই উপন্যাসটিকে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি। বাংলার সমস্ত প্রাচীন মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুথি, এককথায় বাঙালির নিজস্ব আইডেনটিটি কীভাবে একদল লোভী, স্বার্থপর বাঙালির হাত দিয়ে দেশের বাইরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে তার একটা চেহারা দেখা যাবে এ উপন্যাসে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে দেখা হবে কীভাবে শব্দের মাধ্যমে রহস্যের জাল তৈরি করেছেন লেখক। অপরাধের এই আখ্যানটি তৈরি করতে গিয়ে লেখক কী ধরনের ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন, তা আমাদের গবেষণা প্রশ্ন। ভাষার দ্বারা লেখক কীভাবে এই অপরাধমূলক আখ্যানের গঠন কৌশলটি তৈরি করেছেন তা দেখতে চাইছি। সাধারণত বাংলা অপরাধমূলক আখ্যানে অপরাধীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। কিন্তু এখানে লেখক কালুর মত একজন ছিঁচকে ছোটো চোর, অন্যদিকে ধাড়ার মত ভদ্রলোক চোর এই দুয়ের কথনভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছেন। শুধু এই দুজন নয়, উপন্যাসে উপস্থিত প্রতিটি পৃথক পৃথক শ্রেণির প্রতিনিধিদের ভাষা একে অপরের থেকে আলাদা। শ্রেণি ও পেশা বিশেষে একই বাংলা ভাষার এই পৃথক পৃথক হয়ে যাওয়াকেও আমরা দেখতে চাইছি এখানে।

১৯৭৮ এ সত্যজিৎ লিখেছিলেন *হত্যাপুরী,* যেখানে সিধু জ্যাঠা বলেছিল, 'পুঁথি জিনিসটা যে আমাদের আর্টের একটা বড় অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে রাখেনা।'[i] ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপাদান পুঁথি বা ম্যানুস্ক্রিপ্ট কীভাবে মি. সরকারের মত দেশীয় স্মাগলার এবং মি. হিঙ্গোরানির মত ধনী লোভী আমেরিকানদের হাতে বিনষ্ট হচ্ছিল, তাকেই এই রহস্যগল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন সত্যজিৎ। সেখানে দেখা গিয়েছিল সিধু জ্যাঠা বা দুর্গাপদ সেনদের মত মানুষ, যাদের 'হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের লোকেরা' বিশাল অঙ্কের লোভ দেখালেও স্বদেশি সম্পদ তারা বিক্রয় করে দেয়নি ওই গোষ্ঠীর হাতে। আর অন্যদিকে রয়েছেন মি. সরকারের মত ভারতবর্ষের একদল লোভান্ধ মানুষ, ফেলুদা যাকে বলেছিল, 'আপনার পেশা পাসপোর্টে লেখা যায় না। আপনার পেশা স্মাগলিং। নিজে সব সময় চুরি না করলেও, চোরাই মাল পাচার করেন আপনি।'[ii] 'কনসাইস অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশানারি' বলছে, স্মাগল এই ক্রিয়াপদটির অর্থ—'*move (goods) illegally into or out of a country, convey secretly and illicitly.*'[iii] উইকিপিডিয়ার সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে—

> Smuggling is the illegal transportation of objects, substances, information or people, such as out of a house or buildings, into a prison, or across an international border, in violation of applicable laws or other regulations. More broadly, social scientists define smuggling as the purposeful movement across a border in contravention to the relevant legal frameworks. These include the participation in illegal trade, such as in the drug trade, illegal weapons trade, prostitution, human trafficking, kidnapping, heists, chop shops, illegal immigration or illegal emigration, tax evasion, import restrictions, export restrictions, providing contraband to prison inmates, or the theft of the items being smuggled.[iv]

বাস্তবে আমাদের দেশীয় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, ভাস্কর্যের কীভাবে ভারত থেকে বহির্গমন ঘটছিল একদল অর্থলোভী ভারতবর্ষীয় এবং বিত্তশালী স্বার্থান্ধ বিদেশিদের দ্বারা তা সত্যজিতের *হত্যাপুরী, বাদশাহী আংটি, কৈলাসে কেলেঙ্কারি* ইত্যাদি গল্পের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এটি কেবল স্বাধীন ভারতের কিংবা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্যা ছিল এমন নয়, তুর্কি, শক, হুণদল, পাঠান, মোঘল প্রভৃতি বহিরাগত জাতির যখন ভারতে আগমন-শাসন-শোষণ ঘটেছে, তখন হয় বিদেশি বিধর্মী শাসকেরা অগ্নিদগ্ধ করেছে আমাদের দেশীয় সম্পদকে, নয় লুঠপাঠ চালিয়েছে নির্মমভাবে। স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, বিশ শতকের নয়ের দশকে ভারতীয় অর্থনীতি যখন বিশ্বায়নের দুনিয়ায় প্রবেশ করছে, তখন কীভাবে প্রাচীন পুথি ভারতবর্ষ থেকে চোরাই পথে বেরিয়ে যাচ্ছে, কীভাবে আদিমধ্য বাংলার সম্পদ চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে, তাকে বিষয়বস্তু করলেন প্রীতম বসু তাঁর থ্রিলার *পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল* এর (প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫)। আখ্যান বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এখানে বইয়ের চতুর্থ প্রকাশটি (১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) গ্রহণ করা হচ্ছে। চৈতন্য পূর্ববর্তী অর্থাৎ ১৪৮৬ পূর্ববর্তী বাংলার বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* পূর্ববর্তী বা তার সময়ের, ১২০০ থেকে ১৪৫০ সালের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন *পঞ্চাননমঙ্গল* কীভাবে চোরাইদ্রব্য পাচারকারীদের দ্বারা বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছিল, তা এই থ্রিলারের আলম্বন। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েছে। আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ এর পূর্বী শাখার অন্তর্গত বঙ্গ-অসমিয়া থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। বিবর্তন অনুসারে আনুমানিক ৯০০ খিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে স্থূলভাবে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন বাংলা (আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত), মধ্য বাংলা (আনুমানিক ১৩৫০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত), যাকে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় — আদি মধ্য বাংলা (১৩৫০ থেকে ১৫০০ খিস্টাব্দ) এবং অন্তমধ্য বাংলা (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০) এবং আধুনিক বাংলা (১৭৬০ থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহিত)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাগীতি*, যার রচনাকাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রচনাকাল নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে তা বাংলার আদিমধ্যপর্বের নিদর্শন। কিন্তু সমস্যা হল ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০, যা বাংলায় অন্ধকারযুগ নামে চিহ্নিত, এই সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। কারণ তুর্কি আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা। মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ারের অধীনে তুর্কি সওয়ার বাংলা দেশে অতর্কিতে আক্রমণ চালালে সেদিন রাজশক্তি বা জনসাধারণ ওই আকস্মিক আঘাতের সামনে কোনো প্রত্যাঘাত গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ থেকে প্রায় দুশ বছর ধরে বাংলায় অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার তাণ্ডব চলে। বৌদ্ধবিহার, মন্দির, পুথি — বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যগুলি শাসকের রোষানলে পুড়তে থাকে। শিক্ষা সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত হয়। বুদ্ধি বিদ্যা কৌশলে যারা শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তারা বিপন্ন হন, যে কারণে কেমন ছিল সেদিনের বাংলাদেশ, কেমন ছিল সে সময়ের বাংলা ভাষা, কীভাবে ভাষার বিবর্তন ঘটছিল, কেমন ছিল সেদিন বাংলার সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি তা আজও অনাবিষ্কৃত। বিধর্মী শাসকের লুঠতরাজে সেই কাল হারিয়ে গেছে চির অন্ধকারে। প্রীতম বসু তাঁর এই রহস্য উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সেই হারিয়ে যাওয়া কালকে অনুসন্ধান করতে চাইলেন। উপন্যাসের প্রাককথনে দেখা গেল লেখক নির্মাণ করছেন ১৪২৬ সালের বাংলাকে, যেখানে সুলতানের আদেশে বাংলার বল্লালগ্রামের সঙ্ঘারাম বিহার অগ্নিদগ্ধ হয়, মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ভারী বর্ষণের সঙ্গে লড়াই করে আকাশের বাদল মেঘের দিকে ধুম্রকুণ্ডলীর স্পর্ধা ছুঁড়ে দেয়, খড়, বাঁশ, পুঁথির শুকনো তালপাতা অগ্নিতে ইন্ধন জুগিয়ে অমানিশা মুছে চড়চড় করে ফাটতে লাগে,

জ্বলতে লাগে কয়েক'শ বছরের বাঙালির দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য। ২০১৫ এর প্রকাশিত এই থ্রিলারধর্মী উপন্যাসের মধ্যে সমান্তরালভাবে চলছে দুটো সময়কাল। একদিকে লেখক নির্মাণ করতে চাইছেন ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের বাংলাকে, গণেশ, যদু, বারোভুইএঞা প্রভৃতি ঐতিহাসিক রাজাদের সমকালীন বাংলা কেমন ছিল, তার একটা ধারণা দিতে চাইছেন। পাশাপাশি লেখক রাখছেন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দকে যে সময়ে পাঁচমুড়ো গ্রামের চয়নবিলের তলা থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে ১৪০০ সালের শিলালিপি, সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এর কাছাকাছি সময়ে লেখা 'পঞ্চাননমঙ্গল' নামক এক বাংলা মঙ্গলকাব্যের। গল্প বলার আগে লেখক যদিও বলে দিয়েছেন, পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল এর সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক, তবুও এই প্রবন্ধে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা কীভাবে ভাষার দ্বারা চৈতন্য পূর্ববর্তী বাংলার পরিবেশ পুনঃনির্মাণ করেছেন লেখক। সেখানে কোনো কালানৌচিত্য দোষ ঘটে যায়নি তো? ইতিহাসকে আশ্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে লেখককে এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হয়েছে তিনি থ্রিলার রচনা করছেন, যা একান্তভাবে এক আধুনিক সাহিত্যে প্রকরণ। সেসূত্রে দেখা হবে থ্রিলারের সাসপেন্স বজায় রাখার জন্য লেখক কী ধরনের ভাষাকৌশল ও গঠনকৌশল ব্যবহার করেছেন।

ভাষার প্রশ্নে ঢোকার আগে একটি তুলির টানে অতি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক গল্পবস্তু। পাঁচমুড়ো গ্রামের অধিবাসীরা ছেলেবেলা থেকে বড় হয় চয়নবিলের রূপকথা শুনে, যার মধ্যে আছে 'পঞ্চাননমঙ্গল'-এর পুথির গল্প, বিধর্মী শাসকেরা যার নাম দিয়েছিল 'শয়তানের পুঁথি'। ১৯৯৬ সালে প্রতাপাদিত্যের বংশধর জমিদার সদানন্দ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে চয়নবিলের জলে বাগদিদের নামিয়ে জাল ফেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই সেই রূপকথা সত্য হয়ে দেখা দিল, বেরিয়ে পড়ল রাশি রাশি পাথর, যা ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ। তার গায়ে নিদর্শন রয়েছে ১৪০০ সালের বাংলার। আসলে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি চোদ্দোশো সালের বাংলার বল্লালগ্রামের পঞ্চানন দেবতার মন্দিরগাত্রের অংশ। অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে দেশীয় সম্পদকে রক্ষা করতে সেকালে মন্দিরের গায়ে লিখে ফেলা হয়েছিল গোটা 'পঞ্চাননমঙ্গল' কাব্যটি, যেমন তাজমহলের দেওয়ালে লেখা আছে গোটা কোরাণটি। আধুনিক সময়ে তা আবিষ্কৃত হলে ধাড়াদের মত স্মাগলার, কিংবা শেখের মত মিডল ইস্টের ধনী বিধর্মী দেশীয় ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করতে দ্বিধা করেনা। দেশীয় সংস্কৃতিকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে সদানন্দ ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ, বদন প্রভৃতিদের সিদ্ধান্তে হরু ঠাকুর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বসে আবিষ্কৃত ওই শিলালিপিগুলির সাহায্যে এক জাল 'পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য' লিখে ফেলেন। এর সূত্র ধরে প্রীতম বসু আলো ফেলতে চান সেই পুরোনোকালের বাংলায়। দেখা যাবে, একালের পুথি নকলকারী হরু ঠাকুর যখন সেকালের ভাষায় একটা গোটা মঙ্গলকাব্য লিখতে বসছেন, সদানন্দ ভট্টাচার্য তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেবেন, 'ওই চোদ্দোশো সালে লোকে গেরস্থালি কেমন ভাবে করত, কী খেত, কী পোশাক পরত, তাদের অলংকার কেমন ছিল, তাদের ধর্মকর্ম, শাস্ত্র, জীবিকা—সব কিছু লেখার মধ্যে একদম ঠিকঠাক লিখতে হবে।' (*পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল*, পৃষ্ঠা ১১২)। এ কাজের সুবিধার জন্য সদানন্দ তাকে বারবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা, তার শব্দপ্রয়োগ, তার ব্যাকরণ অনুসরণ করতে বলেন। নকল মঙ্গলকাব্যটিতে যাতে কালানৌচিত্য দোষ না ঘটে, তার জন্য সদানন্দ হরু ঠাকুরকে ভাষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বারবার বলবেন। থ্রিলারটি থেকে দেখা যাচ্ছে, 'পঞ্চাননমঙ্গল কাব্য' যে সময়ে রচিত হয়েছিল, বাংলায় তখন গণেশ, যদুদের রাজত্ব। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গণেশ হলেন সেই অবিস্মরণীয় বাঙালি হিন্দু শাসক, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে

কয়েক বছরের জন্য ব্যাতিক্রম করে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের ভাতুড়িয়া অঞ্চলের শক্তিশালী জমিদার গণেশ ৮১৭ হিজরার শেষ দিকে ইংরাজীর ১৪১৪-১৫ খিস্টাব্দে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসন চ্যুত করে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। এদিকে ইব্রাহিম শর্কী তখন অভিযান শুরু করে বাংলায় উপস্থিত হলে গণেশের পক্ষে তার বিপুল সামরিক শক্তির সামনে দাঁড়ানো সম্ভব হল না। তার উপরে গণেশের রাজনীতিচতুর রাজ্যলোভী পুত্র পিতার পক্ষ এবং হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে পিতার বিপক্ষের পাশে দাঁড়াল। ইব্রাহিম যদুকে সিংহাসনে বসালেন। ৮১৮ হিজরার মাঝামাঝি সময়ে যদু জলালুদ্দিন নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করল। তার সিংহাসনে উত্তরণের ফলে বাংলায় আবার হিন্দুপ্রাধান্যের অবসান ঘটে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। প্রীতম বসু তাঁর থ্রিলারে বাংলার এই সময়টিকে তুলে ধরতে চাইলেন এবং সে উদ্দেশে শব্দ নির্বাচন থেকে শুরু করে বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনামের ক্ষেত্রে এককথায় ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হয়েছেন। কীভাবে শব্দ দিয়ে লেখক প্রাচীন বাংলাকে জীবন্ত করে তুলেছেন থ্রিলারে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। থ্রিলারের প্রাককথন অংশে যেখানে ১৪২৬ সালে বাংলার বল্লালগ্রামে সুলতানের আক্রমণের ছবি চিত্রিত হয়েছে, সেখানে লেখক প্রাচীন আবহকে তৈরি করতে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব দেখালেন—

> ১. 'অত্যাধিক বর্ষণে বেগবতীতে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছে। দোনা, দুনি, ছিপ, ভেলা, বালাম কারও চিহ্নমাত্র নেই কূলপ্লাবী বেগবতীর স্ফীত তরঙ্গায়িত শরীরে। দু-চারজন পাটাবুক ধীবর এ পরিস্থিতিতে দুর্বার ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করে দোদুল্যমান নৌকার ভিজে চুবুচুবু পিয়াল পাটায় দাঁড়িয়ে বেগবতীর গর্জনের দিকে ঝাঁকিজাল ছোড়ে বটে', (*পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল*, পৃষ্ঠা ৭)

প্রাচীন নদীমাতৃক বাংলায়, যেখানে নৌপথ ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম, লেখক তাকে ফুটিয়ে তুললেন শব্দের দ্বারা। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি দেখা যাক—

> ২. 'রণতরী থেকে বেরিয়ে সহস্রাধিক বর্মাকৃত পদাতিক সেনা তির, ধনুক, ঢাল, কুঠার, ভল্ল, বল্লম, কুকরি, কৃপাণ, মশাল, ধ্বজাদণ্ড, রণবাদ্য হাতে গ্রামের জলমগ্ন পথে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে চলে উপস্থিত হল চয়নবিলের পাড়ে। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭)

নজরটানচিহ্নিত অংশগুলি খেয়াল করার। সেসময়ের বাংলায় কেমন অস্ত্র ব্যবহৃত হত, তার নিদর্শন দেওয়া হল এখানে। এর পরিবর্তে যদি লেখক রাইফেল, রিভলবার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতেন, তা হলে কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হত উপন্যাস। সেকালের মানুষের পেশার ও বিভিন্ন জাতের কথা বলতে গিয়ে লেখক আনছেন — করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র মাগধ, তন্তুবায়, গান্ধিক-বণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৌলিক, কুম্ভকার, শাঙ্খিক, দাস, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সুত, রাজপুত, তাম্বুলী, মলেগ্রহি, কুড়ব, চণ্ডাল, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, গণক, কাহল বাদক, ঢক্কাবাদক, দ্রাগড়িক, বেট্টিক, দোলাবাহী, মল্ল, ব্যাধ, ডোম, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হাড্ডি, বাগতীত, ব্যালগ্রাহী, ডোম, শবর প্রভৃতিদের কথা। লেখক যদি তন্তুবায়-এর বদলে তাঁতি কিংবা মলেগ্রেহির পরিবর্তে মেথর অথবা অম্বষ্ঠ-এর বদলে ডাক্তার বলতেন, তাহলে কিন্তু ১৪০০ সালের পরিমণ্ডল সার্থকভাবে তৈরি করা যেত না। আবার একুশ শতকের পাঠক মলেগ্রেহি অথবা ব্যালগ্রাহী শব্দের সঙ্গে পরিচিত নয়, তাই অর্থের দুর্বোধ্যতার কারণে যাতে একুশ শতকের সঙ্গে

প্রাচীন বাংলার দূরত্ব তৈরি না হয়, সে উদ্দেশে লেখক শব্দার্থগুলির উল্লেখ করে দিয়েছেন কাহিনি চলতে চলতে। যেমন লেখক জানিয়ে দেন দ্রাগাড়িকের অর্থ যারা চার প্রহরে সময় জ্ঞাপন করে, বেট্টিক শব্দের অর্থ যারা বেগার খাটে। আবার আধুনিক পাঠকের সামনে 'রোমথা'র মত বেশ কিছু অপরিচিত শব্দও রেখে যান লেখক পাঠককে আরও পিপাসু করে তুলতে। পাঠক যখন অপরিচিত শব্দের অর্থ খুঁজতে মাথা খুঁড়ছে, তখন লেখক দু-পাতা পরেই সেই শব্দের রহস্য উন্মোচন করে দিয়ে জানান সেটি প্রাচীন বাংলার একপ্রকার শাস্তি। প্রাচীন সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে লেখক ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, পটমঞ্জরী, গবরা, শীবড়ি, বল্লাড়ি, অরু, গুঞ্জরি ইত্যাদি রাগরাগিণীর নামের উল্লেখ করে লেখক পুরাতনকালকে ধরতে চেয়েছেন। *চর্যাপদ*-এর পাঠকেরা এই শব্দগুলির সঙ্গে সুপরিচিত। সেকালের বাংলার রেশম-মসলিন শিল্পের কথা বলতে গিয়ে লেখক ভাষা দিয়ে কীভাবে সেই সমৃদ্ধির কালকে আঁকলেন তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

> ৩. 'সোনার গাঁ-র প্রসিদ্ধ মলমল, কুচবিহারের মৃগনাভি, ঢাকার মলমলখাস, ঝুনা, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা, আলাবলী, তঞ্জেব, তরন্দম, সরবন্দ, সরবতী, ডোরিয়া, জামদানি বস্ত্রাদি এবং শাঁখের তৈরি অলঙ্কার, হিজলীর তৃণজ বস্ত্রের সঙ্গে বল্লালগ্রামের রেশমজাত কাপড় সপ্তগ্রামের বন্দরের ইউরোপগামী জাহাজে রপ্তানি হওয়া শুরু হল।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫, ১১৬)।

নজরটানচিহ্নিত শব্দগুলির মায়ায় আমরা যেন একাল থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করি সেকালে। শব্দচয়নের এরকম আরও কিছু উদাহরণ দেখা যাক—কুলব্যাপ, স্বর্ণ দীনার, বানক, ডলন কাঠি, ইষ্টক, শালতি, গোধা-নৌকো, সারেঙ্গা-নৌকা, বাক, কাহন। ইরাক, সুকানবিলা, গুদস্তা, রাদ, মাস্তুল, ইসকা, চন্ন, চীবর, পাটক, উর্নিচাদর, উথালজাল, বাখেরজাল, খেতজাল, সঙ্গাজাল ইত্যাদি। আসলে প্রাচীন বাংলার গাছ থেকে শুরু করে নদী, বাসস্থান থেকে সাহিত্য সমস্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক ১৪০০ এর বাংলার আবহকে ধরে রাখতে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক। সেখানে লেখক সাহায্য নিয়েছেন *সুভাষিতরত্নকোষ* এর, সাহায্য নিয়েছেন *অ্যান অ্যান্থলজি অব সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি*। দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজন অনুসারে লেখক তৎসম, অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাই আজকের পাঁচমুড়ো গ্রামের নাম সেকালের ভাষায় হয় পঞ্চমুন্ডো। আবার ১৯৯৬ এ দাঁড়িয়ে যে গ্রামে চোদ্দোশো সালের বাংলার শিলালিপি উদ্ধার হয় বিলের তলা থেকে লেখককে মাথায় রাখতে হয়েছে তার পরিবেশ ঠিক কল্লোলিনী তিলোত্তমার মত হবে না। কলকাতা থেকে খানিক দূরবর্তী সেই গ্রামের ছবি লেখক আঁকেন শব্দের রঙেই—

> 'পাঁচমুড়ো গাঁয়ের স্টেশন রোডেই একমাত্র কালেভদ্রে পিচ ঢালা হয়, গাঁয়ের বাকি সব রাস্তা ইটখোলার পরিত্যক্ত ভাঙা ইট, ঘেঁস, খোয়া ফেলা নড়বড়ে। খড় বা উলুর ছাউনি দেওয়া মাটির কুঁড়ে তাতে দরমার আগড়, কঞ্চির বেড়া, বোটকা গন্ধে ভরা কচুরিপানায় ঢাকা পুকুর, রাস্তার পাশে হেলায় বেড়ে ওঠা বনঝামা, ফণিমনসা, আশ-শ্যাওড়া, হরকোচের ঝাড়। খরিশকেউটে, পদ্মগোখরোর বাস সেখানে।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯)।

সেকাল থেকে একালে যে পার্থক্য ঘটে গেছে, সদানন্দের পৈতৃক পুরুষের জমিদারি আড়ম্বর যে আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে, সে ছবিও লেখক এঁকে দেন শব্দ দিয়ে—

‘আগেকার দিনে এই পাঁচমুড়োর জমিদার বাড়িতে নাকি পালকি, সুসজ্জিত অশ্ব, হস্তী, ঝুমঝুমি লাগানো ঘোড়ায় টানা টমটম, উর্দি পড়া সহিস ইত্যাদি থাকত; আজ সদানন্দ ভটচাজের জমিদারবাড়ির গতাড়ম্বর সদর ফটকের পাশে দণ্ডায়মান সাইকেল রিকশা।’ (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭)।

একটা বিষয় খেয়াল করার, এখানে ১৪০০ সালের বাংলার বর্ণনা বিবৃত হয়েছে কখনো ১৯৯৬ এর জমিদার সদানন্দ ভট্টাচার্যের মুখ দিয়ে, কখনো একালের পুথি নকলকারী হরু ঠাকুরের চোখ দিয়ে। তাই সেই বর্ণনার ভাষা আধুনিক বাংলা, সেখানে সাধু বাংলারও প্রয়োগ ঘটেনি। চলতি বাংলাতেই তারা সেকালকে বর্ণিত করেছেন, কিন্তু সেই বর্ণনার মাঝেমাঝে শব্দের জোরে নির্মিত হয়েছে প্রাচীনকালের পরিবেশ। দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

‘পঞ্চাননবাবা এখানে কোথায়?’ কালাচাঁদ বলল।

‘দাঁড়া, অত উতলা হোস না, সবাই ঠিক মতো আসবে,’ সদানন্দ মৃদু বকুনি দিলেন। ‘একদিন সকালে এই বেগবতীর ঘাটে নৌকা এসে ভিড়ল। সেই নৌকায় ছিলে একজন পুণ্যাত্মা, . . . তাঁর নাম নন্দীধন, বাড়ি শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টের লস্করপুরের ‘উর্নিচাদর’, ‘মাহুলিয়ার ‘এন্ডি’, গায়ে দেবার গেলাপ, এবং ৭০ হাত লম্বা মাছ ধরার জাল — ঝাঁকিজাল, উথালজাল, বাখেরজাল, খেতজাল, সঙ্গাজাল — এসবে শ্রীহট্টের মানুষের বিশাল পারদর্শিতা। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬)

আবার হরু ঠাকুরের ভাবনার সূত্র ধরে পাঠক দেখতে পায় — ‘একসময়ে নন্দীধন নামে এক পুরোহিত এ গাঁয়ে ছিল — সে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে অঙ্কে ছন্দ মিশিয়ে তালপাতার পুঁথিতে লিখত।’ (পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২১)। দুটি দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেই ভাষা কিন্তু চলতি বাংলা।

এবার চলে আসা যাক প্রীতম বসু তাঁর থ্রিলারে যে কাল্পনিক মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ আনলেন, তার ভাষা বিচারে। ১৪০০ নাগাদ নন্দীধনের লেখা ‘পঞ্চাননমঙ্গল’ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় পরে একজন আধুনিক কালের মানুষ হরু ঠাকুর বসলেন তার জাল তৈরি করতে। যদিও এর আগে তিনি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসদের নকল করেছেন, কিন্তু তার পক্ষেও ‘পঞ্চাননমঙ্গল’ লেখা খুব সহজ হয়নি। কারণ আদিমধ্য বাংলা থেকে ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের ভাষার বহু যোজন পার্থক্য ঘটে গেছে। প্রথমত কালের সঙ্গে ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে বিবর্তিত হয়েছে, দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষা আরবি ফারসি ইংরাজীর প্রভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। দেখা যাবে এই ভাষাগত কারণেই হরু ঠাকুরের লেখাকে প্রথমদিকে নাকচ করে দিচ্ছে পুথি বিশেষজ্ঞ সদানন্দ ভট্টাচার্য —

‘সুরধনী নদী তীরে আঁকাবাঁকা পথ।
দুধারে বনানী ঘন বিশাল বৃহৎ।।
নবনীত দধি আদি হাড়ি লয়ে মাথে।
বনপথে গ্রামবালা চলে এক সাথে।।
দ্রুতপায়ে চলে তারা আঁধারের বাটে।
দুধ দধি বেচে রোজ নগরের হাটে।।’
এই পর্যন্ত বলে হরু ঠাকুর থামল — ‘ঠিক হচ্ছে?’

‘ঘোড়ার ডিম হচ্ছে,’ সদানন্দ চোখ না খুলে বলল। ‘এটা যদি চোদ্দোশো সালের বাংলা হয় তবে আমি ফকির সদানন্দ নই, আমি বাংলার রাজা গণেশ।’ . . . বাঙালি তখন মোটেই আজকের বাংলায় কথা বলত না। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১০)।

কেবল পঙক্তির শেষে অন্ত্যমিল এবং এক দাঁড়ি দু-দাঁড়ি দিলেই যে আদিমধ্যবাংলা ভাষা লেখা যায় না, তার প্রমাণ সদানন্দের এই মন্তব্য। সদানন্দের নির্দেশ এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের দিশায় হরু ঠাকুর এবার সতর্ক হয়ে হাত দিলেন কাব্য রচনায়। শেষপর্যন্ত যে কাব্যটি বের হল তার লেখনী থেকে তার ভাষাকে একবার আদি মধ্য বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক বিশেষত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক তা যথার্থ সেকালের ভাষা হল কি না—

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১. সুকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখরা ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, আ-কারের পরস্থিত ই-কার এবং উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা ও পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির স্থিতি আদি মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য। সাধারণত পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয়টি বিশেষত যদি পদের শেষ ধ্বনি হয়, তা হলে ক্ষীণ উচ্চারিত হতে পারে এবং তার ফলে পাশাপাশি অবস্থিত ওই দুটি ধ্বনি মিলিয়ে যৌগিক স্বর বা ‘ডিপথং’ এর সৃষ্টি হতে পারে। এরকম পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরের সংযোগ আদি মধ্য বাংলার নিদর্শনে শুধু ‘আই’, ‘আউ’ কেন, অন্যান্য স্বরের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর সমূহ দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু সেখানে সবসময় দুই স্বরের স্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষীণতা সম্বন্ধে নিসংশয় হওয়া যায়নি। অনুমান করা যায়, এসব ক্ষেত্রে যে স্বরসংযোগ ঘটেছে, তা থেকেই পরবর্তী সময়ের বাংলায় বিভিন্ন যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হয়েছে। হরু ঠাকুরের ‘পঞ্চাননমঙ্গল’ এর একটি অন্যতম বিশেষত্ব — দুই স্বরের পাশাপাশি অবস্থান। যেমন — মাঙ্গএ (অএ), ছান্দএ (অএ), পূজএ (অএ), গাএ (আএ), বাএ (আএ), পাএ (আএ), রআনী (অআ), লুড়িআঁ (ইআঁ), হিআ (ইআঁ), ধায়িআঁ (ইআঁ), পসিআঁ (ইআঁ), ধেআই, পোড়াআঁ (আআঁ), ধাআঁ (আআঁ), পাঁও (আঁও), শিঅরে (ইঅ),গঅন (অঅ), লাগাএঁ (আএঁ), কোঁঅলী (ওঁঅ), রসাউণ (আউ) ইত্যাদি।

২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ অথবা ক্ষীণতা দেখা গেলেও অর্থাৎ হ-কার যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন থেকে হ-কার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোপ পেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় ‘কানু’, ‘আমি’ এর থেকে ‘কাহ্নু’, ‘আহ্মি’র প্রয়োগ অধিক। সেখানে ‘হ্ন’, ‘হ্ম’ প্রভৃতি ধ্বনিসংযোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এই মহাপ্রাণ বর্ণের প্রাচুর্যতার দিকে খেয়াল রাখেন হরু ঠাকুর—তোহ্মার, তুহ্মি, তোহ্মা আহ্মি, ‘সহ্মে’ ইত্যাদি।

৩. হরু ঠাকুর পঞ্চাননমঙ্গল এর জাল পুথি রচনার সময় অপিনিহিতি পক্রিয়ার বিরলতার দিকে খেয়াল রেখেছেন।

৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত এখানেও স্বরসংগতির বাহুল্য দেখা যায়। যেমন এখণী/এখুণী।

৫. হরু ঠাকুরের কাব্যে কোথাও কোথাও বড়ু চণ্ডীদাসের মত ‘অ’ এর বিবৃত উচ্চারণ দেখা গেছে — আতি, আকারণ, আন্তর ইত্যাদি।

৭. *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এর মত এখানে সম্ভবত ‘ণ’, ‘ল’ ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ সংরক্ষিত হয়েছে।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১. কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি বা বিভক্তিহীনতা আদিমধ্য বাংলার একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য — 'পঞ্চানন দেউলত পুজএ **নন্দীধন'** (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০), 'দীর্ঘ রাএ **রোমথা** আগত আইলো' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪), 'ণাম্বিল হাথীর পিঠে **বীরদাস** চালে' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫) ইত্যাদি।

২. আদি মধ্যযুগে মুখ্য কর্মেও বিভক্তিহীনতা দেখা যায়—**'কনক কঙ্কন** আহ্মি দিলু তোহ্মাএ' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৯), 'কুবেরবন্ধু পঞ্চাননে দিলেঁ সাত সাগরের **ফুল**' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮) ইত্যাদি।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত এখানেও গৌণকর্মে এবং সম্প্রদান কারকে 'ক', 'কে', 'রে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে — **'হাথীরে** যে বশ করে/ তার জনম বঙ্গ ঘরে' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৭), **'দেবতারে** স্মরি কান্দিয়া' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮)

৪. পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের দ্বারা অপাদানের অর্থ প্রকাশ আদি মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য, যা এখানে দেখা যায় — 'কোথা **হৈতে** পথ রহাইল এক দুরুবার' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪২), 'পাহাড় **হৈতে** ণাম্বিলা এক নর জন' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩)।

৫. সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্য আদি মধ্য বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল 'এর', 'র', ক, 'কের', যার প্রয়োগ করেন হরু ঠাকুর — 'শিশুমতী **কণ্যার** ঠাঁঠী ওঠ আধর' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০), 'সিন্দুর আঁকিব **তোহ্মার কণ্যার** শিশে' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫), **'শবরের** ঘর গেহ পোড়াআঁ ছারখার।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪২) ইত্যাদি।

৬. আদিমধ্যবাংলায় অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হত 'ত', 'তঁ', 'তে', 'এ'। হরু ঠাকুর কাব্য লেখার সময় সে বিষয়ে সচেতন থাকেন — **'মন্দিরত** নন্দীধন আইলেঁ ধির ধির' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮১), **'পাথরত** ঝাঁট ইহা লিখহ বলরাম' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৮), **'রাজদরবারে** তুহ্মি পাইবেক থান' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৮), 'পড়িলাহা **ধরণীতে** বলরাম বীর' (পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮২)।

৭. উত্তম পুরুষের সর্বনাম — আহ্মে-মোঁ, মধ্যম পুরুষের সর্বনাম — তোঁ-তোহ্মে। হরু ঠাকুরের 'পঞ্চাননমঙ্গল' এও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় — **'তোহ্মে আহ্মে** এই খনে ফিরিব কৈলাসে' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮১), 'বলরাম কহিল আদেশ **তোহ্মা** মাথে' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৮)।

৮. এখানে সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে, যা আদি মধ্য বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য — আহ্মারা, তোহ্মারা।

৯. আদিমধ্য বাংলায় ক্রিয়াবিভক্তির মধ্যে উত্তমপুরুষের বর্তমানকালে দেখা যেত 'ওঁ', 'ই', যা প্রয়োগ করছেন হরু ঠাকুর। অতীতকালে দেখা যেত 'লোঁ', 'ইল' — 'পঞ্চানন পাণী তারেঁ **করায়িল** পান' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২), 'কালাজ্বর হৈতে **জিআইল** সংসার' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৩)। ভবিষ্যৎকালে কর্তৃবাচ্যে 'ইব' বিভক্তি যোগ করা হত — **'সজাইবোঁ** তিলে তিলে' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭), 'সিন্দুর **আঁকিব** তোহ্মার কণ্যার শিশে।/পাছেত **মারিবোঁ** তোহ্মায় সাপের বীষে।।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫)।

১০. অসমাপিকার সঙ্গে 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিক ক্রিয়া গঠন এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। যার প্রয়োগ হরু ঠাকুরের লেখা 'পঞ্চাননমঙ্গল' দেখা যায়। এখানে প্রাচীন (ইঅ) বিকরণযুক্ত কর্মভাববাচ্যের অপ্রচলন দেখা যাচ্ছে এবং 'যা', 'ভূ' ইত্যাদি ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাববাচ্যের প্রচলন দেখা যাচ্ছে।

১১. ধাতুর সাথে 'ই', 'ইআঁ', 'ক', 'ইতেঁ' ইলে প্রভৃতি যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ রচনা আদিমধ্য বাংলার বিশেষত্ব, যা হরু ঠাকুরের লেখায় দেখা যায় — '**পড়িআঁ** আখর খানি কাম্পিল হিআঁ' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৮), 'কৰ্দ্দম **মাখিআঁ** গাএ ঘোর দরসন' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩), 'পঞ্চানন পাণী কত **লৈলেঁ** সাথে।/বেজরাজ জড়িবুটি **লৈলেঁ** হাথে।।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২), 'ঘর ঘর **লুড়িআঁ**/পাঁজী পুথী **জালিআঁ**' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১), 'সাধুজনা সঙ্কো **দিলেঁ** শুখা বাস' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৪) ইত্যাদি।

১২. আদিমধ্য বাংলায় বক্তার প্রতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বোঝাতে 'গিয়া' ও 'সিয়া'র প্রয়োগ হত, যা এখানে রয়েছে।

ছন্দের বৈশিষ্ট্য:

১. আদিমধ্য বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর চতুর্দশাক্ষর পয়ারের আধিক্য লক্ষ করা যায়। হরু ঠাকুর যখন 'পঞ্চাননমঙ্গল' লিখছেন, তখন তিনি পয়ার ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত দেখা যাক —

ক. 'ইহা শুণী অসুর জেন রোষিল অতি।
বিহা করিবেহেঁ মোরেঁ তোহ্মা ভানুমতী।।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫)

খ. 'ণাম্বিছে দ্রুত পাএ পাথর বাটে।
বাঘ যেহ্ন ছুটি আহে শিলাপাটে।।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩)।

গ. 'আজী বিহাণে শয়ানেঁ জাগে বলরাম।
হাতাইড়া টঙ্কী লৈআঁ শুরু কৈলেঁ কাম।।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭১)।

হরু ঠাকুর মধ্যযুগের আবহ রাখতে প্রতি ক্ষেত্রে পঙক্তির শেষে অন্ত্যমিল রেখেছেন এবং এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ির বিন্যাসটিও ভোলেননি। চয়নবিলের তলা থেকে উদ্ধার করা শিলালিপি, যেখানে নন্দীধনের 'পঞ্চাননমঙ্গল' খোদিত করা ছিল, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে এই কাব্যে তোটক, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত ইত্যাদি সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ আছে। বাংলা ছন্দ সেসময়ে সংস্কৃতের প্রভাব ধীরে ধীরে কাটিয়ে নিজের গতিতে চলতে হাঁটি হাঁটি পা পা করলেও সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। তাছাড়াও নন্দীধনকে এখানে সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তাই তাঁর রচিত কাব্যের ছন্দের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটা অস্বাভাবিক নয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর ভাষা বাংলা হলেও, সেখানে মাঝেমাঝে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদ দেখা যায়। প্রীতম বসু তাঁর থ্রিলারে কাল্পনিক এক মঙ্গলকাব্য রচনার সময়ে সেই বিষয়টি ভোলেননি। সেখানেও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত শ্লোক মাঝে মাঝে উঁকি মারছে — 'রূপ প্রক্ষেপপদে পৃথগিষ্টক্ষেপ্যাশোধ্যামূলাভ্যাম/কৃত্বাহহত য়ে প্রক্ষেপোবনে।'—এরকম দৃষ্টান্ত বেশ কিছু পাওয়া যাবে।

'পঞ্চাননমঙ্গল' এর ভাষা নিয়ে আরও একটি খেলা খেললেন প্রীতম বসু। কাব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে এর ভাষাকে দ্ব্যার্থবোধক করা হল। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* -এর ভাষা দ্ব্যার্থবোধক না হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন উপাদান *চর্যাগীতি* -এর ভাষা দ্ব্যার্থবোধক। উপরিতলে সাধারণ লৌকিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবির তলে সেখানে বৌদ্ধ সিদ্ধচার্যেরা লিখে রাখেন সহজিয়া ধর্মের গুপ্ত কথা। একইভাবে এই কাল্পনিক মঙ্গলকাব্যেও ছন্দবদ্ধ ভাষায় মানুষের নিত্যদিনের ছবির আড়ালে ধরা রইল উচ্চতর গণিতের নানান সূত্র, লিপিবদ্ধ রইল জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতের বিভিন্ন নিয়ম, বৈদিক যুগের নান গুপ্ত কথা। হরু ঠাকুর এই কাব্যের ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'আমার ঠাকুরদা বলতেন পঞ্চাননমঙ্গলে নাকি ছন্দ আর অঙ্ক যেন পাখির দুই পাখার মতো কাব্যটাকে নিয়ে উড়ত, সকলে সেটা বুঝতে পারত না, যারা রসিক তারা ঠিক ছন্দ আর অঙ্কটা দেখতে পেত।' (*পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল*, পৃষ্ঠা ৩৮)। আবার এই অঙ্কের বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে লেখক আর্যভট্টকে প্রামাণ্য হিসাবে এনেছেন এবং যেখানেই আর্যভট্টের শ্লোক দিয়ে 'পঞ্চাননমঙ্গল' এর অঙ্ককে সমর্থন করা হয়েছে, সেখানে মূল সংস্কৃতেই শ্লোকগুলিকে রাখা হয়েছে। যেমন—'ত্রিভুজস্য ফলাশরীরম সমদলকোটি ভুজার্ধ্বসমবর্গহ।' কাল্পনিক মঙ্গলকাব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তার উপরিতলে চিত্রিত হয় নন্দীধন-ভানুমতী-বলরামের গল্প, বর্ণিত হয় প্রাচীন বাংলার হস্তী চিকিৎসা প্রসঙ্গ, সমৃদ্ধ মূর্তি শিল্প, মন্দিরশিল্প, বৌদ্ধ বিহারের কথা, কামান ব্যবহারের প্রসঙ্গ, হিন্দু-বৌদ্ধ সম্পর্ক, আর তার ভেতরে বোনা হয় আলোর গতি, পাই এর ভ্যালু, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের নিয়মাবলী। আরও একটি বিষয় বাংলা মঙ্গলকাব্যের একটা বিশেষ গঠন পদ্ধতি আছে—সাধারণত মঙ্গলগানের এক একটি সুদীর্ঘ গীতিকাহিনী কতগুলি পালায় পালায় বিভক্ত হয়ে রচিত হয়। প্রথমে সেখানে দেবতার বন্দনা থাকে। পুরাণ পাঠ এবং শ্রবণ করলে যে কী ধরনের পুণ্য লাভ হয়, মঙ্গলগানেরও সেরকম ফলশ্রুতি বর্ণিত হয়। সাধারণত ফলশ্রুতি অংশের মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাঁদের কাব্যরচনার কাল হেঁয়ালির মত করে বর্ণনা করেন। ফলশ্রুতি অংশ বা অন্যত্র কবিরা তাদের বিস্তৃত আত্মপরিচয় দেন। ভণিতা থাকে সেখানে। দৈবাদেশে যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, সেই দেবতার আদেশের বক্তব্য এবং কবিরা কখন সেই আদেশ পেয়েছেন তার উল্লেখ থাকে। মঙ্গলকাব্য দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড দুই খণ্ডে বিন্যস্ত হয়। প্রীতম বসু তাঁর থ্রিলারে কাল্পনিক মঙ্গলকাব্য রচনার সময়ে এই বিষয়গুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। হরু ঠাকুর কাব্য বিন্যস্ত করছেন এভাবে—গণেশ বন্দনা—সরস্বতী বন্দনা—লক্ষ্মী বন্দনা—সূর্যবন্দনা। খেয়াল করার, চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কাব্য বলে লেখক চৈতন্য বন্দনা বাদ দিয়েছেন। বন্দনা অংশের পরে রয়েছে যথাক্রমে গ্রন্থারম্ভ, রাজার অত্যাচার, ভানুমতীর কাহিনী, রোমথার কাহিনী, ভানুমতীর বিহা . . . —এভাবে 'পঞ্চাননমঙ্গল' এর কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে। আবার ভণিতারও উল্লেখ রয়েছে সেখানে—'পঞ্চানন কথা সুনহ কবিরাজ ভণে।' কিংবা 'পঞ্চাননমঙ্গল যা কবিরাজ ভণে।' আবার যাতে প্রাচীনকালের আবহ বিনষ্ট না হয়, তাই সদানন্দের নির্দেশে হরু ঠাকুর কেবল কাব্যের ভাষা বা ছন্দের ক্ষেত্রে নয়, লিপির ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকে এবং আদিমধ্যবাংলা ভাষার কালে বাংলা লিপি যেমন ছিল বাংলালিপির সেই রূপ ব্যবহার করে তিনি কাব্য লেখেন। বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট অংশে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা লিপির ক্রমবিকাশ কেমন ভাবে হয়েছে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেন তিনি। আবার একটি শব্দসূচিও তিনি দেন এই অংশে। জাল কাব্য যাতে ধরা না পড়ে তাই কাগজে বা তালপাতা ব্যবহার না করে পুথি লেখা হয় তেডেল-এ। এছাড়াও প্রাচীনতাকে রক্ষা করতে সেকালের হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলামের বাংলার প্রাচীনতা

ধরে রাখতে মাঝেমাঝে পালি, অবহট্টেরও উল্লেখ রয়েছে এ উপন্যাসে। এভাবেই একদিকে চোদ্দোশো সালের বাংলাকে পুনর্নির্মাণ করেন লেখক।

কাল্পনিক মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি প্রীতম বসুকে খেয়াল রাখতে হয়েছে তিনি থ্রিলার লিখছেন। সাধারণত গোয়েন্দাগল্প বা ক্রাইমধর্মী সিনেমার গঠনের একটা বিশেষত্ব হল—একটা ঘটনা কিছুদূর পর্যন্ত দেখিয়ে গোয়েন্দা গল্প রচয়িতা সেটির বিবরণ সম্পূর্ণ না করে মাঝপথে থেমে গিয়ে অন্য একটি ঘটনা আবার দেখাতে শুরু করেন। আলফ্রেড হিচককের সিনেমার গঠনে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রায়শই লক্ষ করা যায়। এর দ্বারা পাঠকের মনের কৌতূহল, অতৃপ্তিকে দ্বিগুণিত করা হয়, যাতে পাঠক 'তারপর কী হল' এই জানার খিদেতে পাতার পর পাতা পড়ে ফেলতে পারে। প্রীতম বসু তার থ্রিলারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন রোমাঞ্চ সৃষ্টির উদ্দেশে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—প্রাককথন অংশে ১৪২৬ এর সুলতানের বল্লালগ্রাম আক্রমণের দৃশ্য এক ঝলকে দেখিয়েই প্রথম অধ্যায়ে লেখক পাঠককে নিয়ে আসছেন ১৯৯৬ সালে সদানন্দের জমিদারিতে। আবার বাইশ নম্বর অধ্যায়ে ১৪০০ সালের বাংলার ভানুমতী-রোমথার গল্প কিছুটা বলে, সম্পূর্ণ শেষ না করে তেইশ নম্বর অধ্যায়ে আবার পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল ১৯৯৬-এর পাঁচমুড়ো গ্রামে। রহস্যগল্পে আবার দেখা যায় একটা চরিত্রকে কিছুক্ষণ দেখিয়ে তাকে আবার বেশ কিছুটা সময়ে আড়ালে রেখে দেওয়া হয়, চরিত্রটি পাঠকের বা দর্শকের চোখের আড়ালে হয়ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলে, অথচ পাঠক তা জানতে না পেরে অতৃপ্তিতে ছট্‌ফট্‌ করে। সেই রহস্য গল্পের শেষে গিয়ে উন্মোচিত হয়। এই থ্রিলারধর্মী উপন্যাসেও দেখা যাবে, সাত নম্বর অধ্যায়ে এসে ধাড়া চরিত্রটি বিদায় নিয়েছে, আবার সে এসেছে আঠাশ নম্বর পরিচ্ছেদে। এই সময়ের মধ্যে তার সমস্ত কার্যকলাপ পাঠকের চোখের আড়ালে হয়েছে। গোয়েন্দাগল্পের ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায় কোনো চরিত্রের বা অপরাধীর এমন কোনো কাজ লেখক পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে দেন, অথচ গোয়েন্দা তা জানতে পারেনা। যদিও পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল গোয়েন্দা গল্প ঠিক নয়, তবুও এখানে রহস্য ধরে রাখতে আখ্যানগঠনে এই ধরনের কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। যেমন আট নম্বর অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে শেখেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কালাচাঁদ এবং হরু ঠাকুর যখন বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি করে ফিরছে, তখন তাদের পেছনে একটি কালো বিদেশি গাড়ি পিছু নিচ্ছে। কালাচাঁদরা কিন্তু তা ঘুণাক্ষরেও টের পেলনা, অথচ কথক পাঠককে তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এভাবেই থ্রিলারের শরীর জুড়ে রহস্যের গন্ধ রেখে গেছেন লেখক।

বাংলায় অপরাধের ভাষা এবং অপরাধীর ভাষা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সংখ্যা খুব বেশি চোখে পড়েনি। তার মধ্যে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের *অপরাধ-জগতের ভাষা* (প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৭১) নামক গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এমনকি বাংলা গোয়েন্দাগল্প লেখকদেরও সাহিত্য রচনার সময়ে অপরাধীর মুখের ভাষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য তৈরি করতে দেখা যায়নি খুব একটা। একজন হোয়াইট কলার ক্রিমিন্যালের থেকে পকেটমার যে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে কিংবা একজন শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর অপরাধীর থেকে সুপারিকিলারের ভাষা যে আলাদা তার প্রকাশ বাংলা অপরাধমূলক আখ্যানে খুব বেশি চোখে পড়েনি। সামাজিক শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ, আর্থিক অবস্থানের পার্থক্যে একজন অপরাধী থেকে আরেকজন অপরাধীর ভাষা যে পৃথক হয়ে যায় সে বিষয়ে বাংলা গোয়েন্দাগল্প লেখকেরা সাধারণত দৃষ্টি দেননি। *পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল* থ্রিলারধর্মী উপন্যাস। পুথি চুরির সূত্র ধরে এখানে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীকে। তাদের মুখের ভাষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য তৈরির চেষ্টা করেছেন লেখক। কালাচাঁদ, যে ছোটোখাটো

পুথিচোর, স্মাগলিং এর বড় কারবারে যে যুক্ত নয়, পুথি চুরি যার পৈতৃক ব্যবসা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যে বেশিদূর এগোতে পারেনি তার মুখের ভাষাটি সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক —

১. 'কালাচাঁদ হাউমাউ করে উঠল, 'মায়ের চিকিচ্ছের জন্যে বিশ হাজার টাকা চেয়েছিলাম,' (পাঁচমুড়োর পঞ্চাননমঙ্গল, পৃষ্ঠা ১১)

২. 'কালাচাঁদ একটা বড়োসড়ো নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বাব্বা, এ যেন চোরাকাঁটা ভরা মাঠ থেকে অষ্টফলক দুব্যোঘাস খুঁজে আনার কাজ।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯)।

৩. 'কালাচাঁদ অস্বস্তি কাটাতে বলল, 'কর্তামশাই, রাগ করেন ক্যান, আমি তো না জানি সংস্কৃত, না জানি ইংরেজি।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯)

যে কালাচাঁদের বাংলা ভাষাসাহিত্য সম্পর্কে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা নেই, তার কাছে আদিমধ্যবাংলা ভাষা 'হান্ডিকুন্ডি ভাষা', 'ইন্ডিপিন্ডি ভাষা' হিসাবে ঠেকে। আবার জমিদারের প্রতি সবসময় সদয় না হলেও আর্থসামাজিক ভাবে উচ্চশ্রেণির মানুষটিকে সম্বোধন করতে গিয়ে সে 'কর্তামশাই' বলতে ভোলে না। এদিকে সদানন্দ ভট্টাচার্য, পাঁচমুড়োর জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী তিনি, আজ সেই জমিদারি ঐশ্বর্য, আভিজাত্য ক্ষয়ীভূত হলেও প্রতাপ অস্তমিত হয়নি। তাই কালাঁচাদের মত সামান্য এক চোরের প্রতি তুলনামূলক বিচারে আর্থসামাজিক ভাবে উঁচু শ্রেণিতে থাকা এই মানুষটির ভাষা প্রয়োগে মিশে থাকে শাসকের অহংকার, দর্প, নীচু শ্রেণীর প্রতি ঘৃণার মনোভাব—

১. 'চোখ থেকে লেন্স খুলে কালাচাঁদের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে সদানন্দ বললেন, 'এক থাপ্পড়ে বিয়াল্লিশটা দাঁত মুখ থেকে খসিয়ে দেব। চোপ! চারশো বিশ!'' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১)।
২. 'ভট্টাচার্য কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন, 'এই হতভাগা, সাহেবের হাত-পা টিপে দে ততক্ষণ।'' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭)।
৩. 'ছি ছি, বিলেতের লোকেরা যদি এটা ধরে ফেলত তবে? এই হারামজাদা, কান ধরে উঠবস কর।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩)।

আবার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলের প্রতিও প্রথম সন্তান এবং জমিদারের মূল উত্তরাধিকারী সদানন্দের ভাষায় অসম্মানের প্রকাশ দেখা গেছে, তাকে তিনি 'রক্ষিতার ছেলে' ভিন্ন অন্য কিছু মানতে নারাজ — 'হারামজাদা চিদেটাকে শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে চাবকালেও মাথা ঠাণ্ডা হবে না।' ধাড়া নিজেকে দেশীয় শিল্পের রক্ষক হিসাবে মিথ্যা পরিচয় দিলে তার প্রতি সদানন্দের ভাষা কালার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে জমিদারের ভাষায় ঝরে পড়ছে বিনয়, বিলেতে থাকা লোকের প্রতি আনুগত্য। তার প্রতি জমিদারের সম্বোধন 'সাহেব'—'ধাড়া সাহেব, আমি এখুনি আসছি, আপনি বসুন, চলে যাবেন না।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬)। আবার ধাড়া, যার পেশা স্মাগলিং, ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পদ মধ্যপ্রাচ্যে পাচারে যার সক্রিয় হাত রয়েছে, অথচ বাইরে যে শিক্ষিত ভদ্রের মুখোশ পরে ভণ্ডামি করে, তার ভাষা কালাচাঁদের মত ছিঁচকে চোরের ভাষা থেকে পৃথক। দৃষ্টান্ত দেখা যাক —

১. 'আমাদের বিজনেসে গোপনীয়তা খুব এসেন্সিয়াল। আমরা সরকারি ঝামেলায় ফাঁসতে চাই না।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮)।

২. 'ডবল মিনিং! স্ট্রেঞ্জ!' ধাড়া বলল।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১)।
৩. 'আমি জানি "পাই" কাকে বলে। এরিয়া অফ সার্কেল হল পাই আর স্কোয়ার। আমার গাট ফিল হচ্ছে যে, আমরা সোনার খনির সামনে পৌঁছে গেছি। এ যে পিওর গোল্ড' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১)।

ধাড়ার প্রতি কথায় ইংরেজির আধিক্য। তার মৌখিক ভাষা শুনে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না এই দেশীয় মুখোশধারীদের হাতেই দেশ বিনষ্ট হচ্ছে। আবার শেখ, যিনি সৌদি আরবের বাসিন্দা, ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের সম্পদকে যিনি আগুনে ধূলিস্যাৎ করে দিতে চান, যিনি 'হালাল' ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না, সেই নৃশংস নিষ্ঠুর অপরাধীর ভাষা কালা কিংবা ধাড়ার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—

১. 'শুয়োরের বাচ্চাটা নিজেকে বড়ো চালাক ভেবেছিল। শেখ আল-খোয়ারিজমির সঙ্গে বেইমানি! হারামি!' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১)।
২. 'এ ঘরের বাইরে যদি কুত্তাটার কথা কেউ জানতে পারে তবে তোমাদের মাংস পিস পিস করে কেটে চিড়িয়াখানায় চিতেবাঘের খাঁচায় পাঠিয়ে দেব।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১)।

লেখক একজায়গায় শেখের মুখে তার মাতৃভাষা আরবি হরফও বসিয়েছেন, কিন্তু তার অর্থব্যাখ্যা তিনি যদি ফুটনোটে দিয়ে দিতেন, তাহলে সাধারণ পাঠকের বুঝতে সুবিধা হত। অপরাধীর পাশাপাশি রক্ষকের ভাষারও কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। থানার দারোগা এবং কালাচাঁদের কথোপকথনের একটা অংশ খেয়াল করা যাক—

১. দারোগাঃ এই শুয়োরের বাচ্চা, বাইরে আয়!
   কালাঃ কোথায় যাব স্যার?
   দারোগাঃ মর্গ।
   কালাঃমর্গ! মর্গ কেন?
   দারোগাঃ তোর বাপের বিয়ে হবে ওখানে, তোকে বাপের বাসরে গান গাইতে হবে — (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৭)।
২. 'হিরের কথা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে জিভ কেটে পেছনে ঢুকিয়ে দেব। . . ডিপোর্ট-ফিপোর্ট করার ফ্যাচাং অনেক হতো।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৯)।

কালাচাঁদের মতন ছোটো মাপের চোরেদের প্রতি পুলিশের ভাষায় দেখা গেল তুচ্ছতার প্রকাশ। রক্ষকের মনোভাব এদের প্রতি হীনার্থক। অশ্লীল ইঙ্গিত রয়েছে দারোগার ভাষায়। আবার অপরাধীদের মধ্যে যে বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষায় বিনিময় চলে, যার অর্থ আমজনতা ধরতে পারেনা, তারও কিছু উল্লেখ আছে কাহিনিতে। যেমন 'দু' খোকা, যার অর্থ দু-কোটি। মুসলমান মিস্ত্রী কালাঁচাদ, যে আগামী নির্বাচনীতে পাঁচমুড়োর হয়ে দাঁড়াবে তার মুখের ভাষা তৈরির সময় লেখক তার ধর্মীয় পরিচয়, তার বেড়ে ওঠাকে ভোলেননি—'আফজল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আল্লা মেহেরবানি। . . . আল্লার ঋণ শোধ করার মতো গোস্তাকি যেন না হয় কখনও।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৭)। আবার বৃষ্টিমুখর দিনে ব্যাঙের ডাক শুনে বৈষ্ণব কবিদের মতো তার মুখ থেকে 'মত্ত দাদুরী'র মত কাব্য নির্গত হয় না, বরং বের হয় অশ্লীল গালাগালি —'বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই শালাদের সেক্স জেগে উঠেছে।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৯)। অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না, তবে বলা যায় এ উপন্যাসে সদানন্দ ভট্টাচার্য থেকে তার গোমস্তা দুলাল, হরু ঠাকুর থেকে

তার ভাগ্নে অঙ্কের সুপণ্ডিত বদন প্রত্যেকের মুখের ভাষা তাদের শিক্ষা, পেশা, আর্থসামাজিক অবস্থান অনুযায়ী পৃথক হয়ে গেছে।

থ্রিলারের টানটান উত্তেজনাকে ধরে রাখতে তার ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে। এই উপন্যাসের ভাষা নিঃসন্দেহে সে দায়িত্ব পালন করেছে। পাশাপাশি উপন্যাসের মধ্যে লেখক প্রবাদ-প্রবচন, উপমার প্রয়োগে গদ্যভাষাকে রসময় এবং স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলেছেন, যে সরসতা সাধারণত থ্রিলারধর্মী লেখায় দেখা যায় না। রহস্য আস্বাদনের সাথে সাথে স্বাদু ভাষার গুণে পাঠকের মনে হাস্যরসও জাগায় মাঝে মাঝে এ থ্রিলার। উপন্যাস থেকে সামান্য কয়েকটি প্রবাদ ও উপমাকে দেখে নেওয়া যাক। 'ফেউরে বাঘের হাগার গন্ধ চেনাইতে আইসস', 'গভীর জলের মাছ', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'চোরের স্কুলে কোতোয়াল মাস্টার', 'অসীর চেয়ে মসী বড়' ইত্যাদি বাক্যবন্ধের উপস্থিতিতে উপন্যাস হয়েছে সরস। কয়েকটি উপমার দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

১. 'পঞ্চাননমঙ্গলের নাম শুনেই শেখ লাফিয়ে পড়ল। যেই বলেছি যে একটা পুরোনো কপির সন্ধান পাওয়া গেছে আর আমি তার একটা পাতা নিজের চোখে দেখেছি ব্যস কূর্ম অবতারের পিঠে মেদিনী যেন দুলে উঠল।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২)।
২. 'ধাড়ার মুখে স্বস্তির হাসি যেন বাদলার মেঘের ফাঁকে এক চিলতে সূর্য চিকচিক করে উঠল।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩)।
৩. 'গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বালবিধবার কাছে চিকেন রোস্ট আর মটন কাবাবের কোনো ফারাক নেই, সেরকম কালাচাঁদের কাছে যাহা পিথাগোরাস তাহাই ট্রিগোনমেট্রি।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০)।
৪. 'কালাচাঁদ দেখল বুড়োর চোখে চয়নবিল কানায় কানায় পূর্ণ।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭)।
৫. 'বাকি রাতটা যেন দুরন্ত বাছুরের মত লাফিয়ে লাফিয়ে দিগন্তে মুছে গেল।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৬)।
৬. 'হৃৎপিণ্ডটা ভয়ের চোটে ডাঙার কাতলা মাছের মুখের মতো খাবি খাচ্ছে।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭)।
৭. 'সদানন্দের চোখের মণি দু'টোতে দপ করে মশাল জ্বলে উঠল।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২)।
৮. 'পরশুর মধ্যে কাব্য লিখে চিদে হারামজাদাটাকে ঠকানো কম্পাস ছাড়া মরুভূমি পার হওয়ার মত কঠিন।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯)।

থ্রিলারের প্রতি পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এরকম তুলনার ছবি। আবার স্বর এবং ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে গদ্যেই যেন অনুপ্রাস তৈরি করলেন লেখক — 'জানালার ওপাশে কা-কা করে কর্কশ কাকের ডাকের আওয়াজে কালাচাঁদের ঘুম ভেঙে গেল।' (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩)। পরিসমাপ্তিতে বলা যায় এই উপন্যাসের ভাষা একদিকে মধ্যযুগের আবহকে সার্থকভাবে নির্মাণ করেছে, সাথেসাথে পাঠককে 'থ্রিলিং' এর অনুভূতি দিয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি:

[i] সত্যজিৎ, রায়. (২০২১)। 'হত্যাপুরী', *ফেলুদা সমগ্র,* খণ্ড ২, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

[ii] সত্যজিৎ, রায়. (২০২১)। 'হত্যাপুরী', *ফেলুদা সমগ্র,* খণ্ড ২, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

[iii] *Concise Oxford English Dictionary*, 11th ed. (2006). Oxford University Press.

[iv] https://en.wikipedia.org, শেষবার দেখার তারিখ ০৭/০৯/২০২৪।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

ছোটদের ছোটগল্প: শশিভূষণ দাশগুপ্তের শিশুসাহিত্যে ধারণাগত মেটাফর

কৃষ্ণ শিঞ্জিনী দেব

ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (আইএলএসআর)

ARTICLE INFO

Article history:
Received 29/12/2024
Accepted 23/03/2025

সূচক শব্দ:
শশিভূষণ দাশগুপ্ত,
শিশুসাহিত্য,
ছোটগল্প,
Conceptual Metaphor Theory,
ভারতীয় দর্শন

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

দর্শনের সঙ্গে ধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধন ভারতীয় মননের দান, অন্যদিকে ধর্মকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। দার্শনিকের নৈর্ব্যক্তিক সত্যের বিপ্রতীপে থাকে কবির ব্যক্তিগত সত্য। 'কবি', 'সত্য', 'ব্যক্তি' একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হলেও কবির দর্শন, দার্শনিকের কবিতা তথা কবিভাষা পাঠকসমাজে একান্ত আগ্রহের বিষয়। একজন সমালোচক, বলা ভালো বিশ্লেষক অন্যের কবিতাকে যে দর্শন দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, তাঁর সৃজিত কাব্যবিশ্ব তার অনুসারী বা ভিন্নধর্মী হতে পারে। এই Objective truth এবং Subjective truth-এর দ্বন্দ্ব নিরসন ঘটতে পারে অভিজ্ঞতাবাদী সংশ্লেষের (Experimental synthesis) মাধ্যমে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং সমালোচনা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বহু কবি সমকালীন বা প্রাচীন লেখকদের সমালোচনা করেছেন, আবার বহু শিক্ষাবিদ কাব্যচর্চা করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা *Obscure Religious Cults of Bengal as background to the study of Bengali Literature* (১৯৪৬), *Introduction to Tantric Buddhism* (১৯৫০), *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ* (১৯৫২), *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* (১৯৬০), *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস* (১৯৬১) ইত্যাদি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের বিচারের তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছে। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ* (১৯৪৮), *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪২), *শিল্প লিপি* (১৯৫১) প্রভৃতি রচনা তাঁর মনস্বিতার উজ্জ্বল সাক্ষরবাহী। এর পাশাপাশি তাঁর কাব্যগ্রন্থ *এপারে ওপারে* (১৯৪১), কথিকা *নিশাঠাকুরের কড়চা* (১৯৪৭), নাটক *দিনান্তের আগুন* (১৯৪৯) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শিশু সাহিত্য সংসদের পরিচালনমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শশিভূষণ মূলত ছোটদের কথা ভেবে যে গল্প, কবিতা, নাটক রচনা করেছেন, তার শৈলীগত বৈশিষ্ট্য অভিনব। তিনি ছোটদের জন্য বাল্মীকি রামায়ণ এবং ব্যাস মহাভারত লিখেছেন, তাঁর গল্পগ্রন্থ *ছুটির দিনে মেঘের গল্প* (১৯৫৬), *ছোটদের ছোটগল্প* (১৯৬১), সাঙ্কেতিক নাটক *রাজকন্যার ঝাঁপি* (১৯৪৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

Corresponding author's email ID: krishnashinjineedeb25@gmail.com

উপমা কালিদাসস্য (১৯৩৪) গ্রন্থে 'উপমা'কেই বিস্তৃতার্থে অলঙ্কার হিসাবে শশিভূষণ ব্যবহার করেছেন। তাঁর পরিভাষায় ব্যবহৃত উপমা আসলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের ব্যবহার করা 'মেটাফর'। তিনি নিজেও শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রচুর মেটাফর তৈরি করেছেন, তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ জ্ঞান ধারণাগত মেটাফর হিসাবে শিশুসাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। মেটাফরকে গৌণ মনোনয়নের (Secondary nomination) আঙ্গিক থেকে বহুকাল বিচার হলেও José Ortega y Gasset (১৮৮৩ -১৯৫৫) বলেছিলেন – "A metaphor is needed not only to make a thought available to other people, thanks to a name received, people themselves need it in order for the object to become more accessible to a thought. Metaphor is not only a means of expression; it appears as an important tool for thinking." ভাষার একক হিসাবে মেটাফর কেবলমাত্র দুটি পদের মধ্যে তুলনা করে না, তাদের আদানপ্রদানের ফলে নতুন অর্থ তৈরি হয় যা বিষয় (content) এবং আধারে (shell) থাকাকালীন ছিল না। এখান থেকেই লেকফ (১৯৪১) ও জনসন (১৯৪৯) ধারণাগত মেটাফর তত্ত্বের (Conceptual Metaphor Theory) কথা বলেছেন, যার প্রেক্ষিতে মেটাফরকে বিস্তৃত ভাবনায় দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শশিভূষণের *ছোটদের ছোটগল্প* বইয়ের গল্পগুলিতে বিশ শতকের শিশুমানসোপযোগী মেটাফর কোথায়, কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের গবেষক কীভাবে ছোটদের জন্য রচনা করেছেন, তার আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

১. ভূমিকা

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিন পর্যায়ক্রমে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংশয় দূর হয়। পূর্বসূরিদের সিদ্ধান্ত শুনে (শ্রবণ) শ্রুত বিষয়ে বিবেচনা (মনন) করে লব্ধ জ্ঞান আত্মস্থ করতে নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। উপরোক্ত মনন-ই দর্শনের ভিত্তি, ভারতীয় প্রেক্ষিতে যার সঙ্গে ধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধন। লোকায়ত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং সমালোচনা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বহু কবি সমকালীন বা প্রাচীন লেখকদের সমালোচনা করেছেন, আবার বহু শিক্ষাবিদ কাব্যচর্চা করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪)—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক', তাঁর লেখা *Obscure Religious Cults of Bengal as background to the study of Bengali Literature* (১৯৪৬), *Introduction to Tantric Buddhism* (১৯৫০), *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ* (১৯৫২), *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* (১৯৬০), *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস* (১৯৬১) ইত্যাদি বইয়ে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের বিচারের তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ* (১৯৪৮), *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪২), *শিল্প লিপি* (১৯৫১) প্রভৃতি রচনার পাশাপাশি দার্শনিক প্রস্থানস্থপতির কাব্যগ্রন্থ *এপারে ওপারে* (১৯৪১), কথিকা *নিশাঠাকুরের কড়চা* (১৯৪৭), নাটক *দিনান্তের আগুন* (১৯৪৯) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শিশু সাহিত্য সংসদের পরিচালনমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য

শশিভূষণ মূলত ছোটদের কথা ভেবে যে গল্প, কবিতা, নাটক রচনা করেছেন, তাদের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য অভিনব। বাংলায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোকে ভারতীয় সাধনা, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, মধ্যযুগ এবং প্রাগাধুনিক যুগের বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্টি আলোচনার সমান্তরালে রসবেত্তা শশিভূষণ, রবীন্দ্রপন্থশিল্পী হিসাবে বহু শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থে ভারতীয় প্রজ্ঞার প্রগাঢ় উত্তরাধিকার সুস্পষ্ট, শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। *ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ* (১৯৫৯), *ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত* (১৯৬৩) গ্রন্থ দুটি মূল সংস্কৃত পাঠকৃতির অনুবাদ হলেও গল্পগ্রন্থ *ছুটির দিনে মেঘের গল্প* (১৯৫৬), *ছোটদের ছোটগল্প* (১৯৬১) তাঁর মৌলিক সৃজন। আমাদের এই গবেষণা পত্রের মূল আলোচ্য বিষয় *ছোটদের ছোটগল্প।*

উপমা কালিদাসস্য (১৯৩৪) গ্রন্থে 'উপমা'কেই বিস্তৃতার্থে অলঙ্কার হিসাবে শশিভূষণ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর পরিভাষায় ব্যবহৃত উপমা আসলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের ব্যবহার করা 'মেটাফর'। তিনি নিজেও শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রচুর মেটাফর তৈরি করেছেন, তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ জ্ঞান ধারণাগত মেটাফর হিসাবে শিশুসাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর শিশুসাহিত্যের মূল ভোক্তা শিশু-কিশোর হলেও শিশুতোষ রূপকথার বিরুদ্ধে অসম্ভাব্যতার অভিযোগকে অস্বীকার করতেই যেন শশিভূষণ কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, সমকালীন একাধিক উপাদান এই গল্প সংকলনে এনেছেন। তাঁর কাহিনির বয়ানে ভারতীয় প্রজ্ঞার পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাষার একক হিসাবে মেটাফর কেবলমাত্র দুটি পদের মধ্যে তুলনা করে না, তাদের আদানপ্রদানের ফলে নতুন অর্থ তৈরি হয় যা বিষয় (content) এবং আধারে (shell) থাকাকালীন ছিল না। এখান থেকেই লেকফ (১৯৪১) ও জনসন (১৯৪৯) ধারণাগত মেটাফর তত্ত্বের (Conceptual Metaphor Theory) কথা বলেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত শব্দার্থ-কাঠামো (semantic frame) ও অর্থক্ষেত্র (lexical field), জ্ঞানবিদ্যার (Cognitive Science) অন্তর্গত মানসিক এলাকা (mental space), তথ্যবিজ্ঞানের (Information Science) অন্তর্গত সত্তাবিদ্যা (Ontology)—এই ধারণাগুলির সাদৃশ্য রয়েছে। মেটাফর আলোচনার কোন একক তত্ত্ব পাওয়া এই মুহূর্তে অসম্ভব। মেটাফরকে গৌণ মনোনয়নের (Secondary nomination) আঙ্গিক থেকে বহুকাল বিচার হলেও এটি ভাবনার প্রয়োজনীয় মাধ্যম, যেখানে সূত্র আধারের (Source domain) ধারণার মাধ্যমে লক্ষ্য আধারের (Target domain) ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। শশিভূষণের আলোচ্য ছোটগল্পে শিশুসাহিত্যের আঙিনায় দেশজ সংস্কৃতির প্রভাব এবং বিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় রূপান্তরিত গ্রাম-শহরের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রচলিত ধারণাগত মেটাফরের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

২. পাঠকৃতি ও ধারণাগত মেটাফর

প্রচ্ছদে আঁকা কাগজ মুড়ে বানানো পুতুল, মাছ, হাঁস, হাতি, ঘোড়া, ঘুড়ির ছবি—আর সেই মলাট ভেদ করে উঠে আসছে অরিগ্যামির ধাঁচে খোকাখুকুর মুখ, মুখের সামনে বইয়ের পাতা খোলা, তারা বসে বই পড়ছে। *ছেলেদের রামায়ণ* (১৮৯৭) লেখার সময় আর নেই, তাই শশিভূষণ 'ছোটদের' জন্য 'ছোটগল্প' লিখছেন, গল্প বলার জন্য নির্বাচন করছেন একটি আদ্যন্ত উনিশ শতকীয় সংরূপ। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যে ছবিগুলি রয়েছে সেগুলি পৃথক গবেষণার বিষয় হলেও এই সংকলনের 'সংখ্যা আবিষ্কার', 'বক্কেশ্বরের বুদ্ধি', 'গণ্শুর তত্ত্বজ্ঞান', 'শিমুল তলার যাত্রা', 'কাগজের নৌকা', 'রাখাল', 'চোর না ভূত', 'মা' এবং 'শিবাইর অভীষ্টলাভ'—মোট নয়টি গল্প এখানে রয়েছে। কাহিনির নকশা লক্ষ

করলে বোঝা যায়, রূপকথা থেকে তিনি ক্রমে সামাজিক গল্পে সরে এসেছেন, হয়তো কিশোরদের কাঁচা বয়েসেই তিনি সাংসারিক জটিলতার আভাসটুকু দিতে চান, তাই মাটির সঙ্গে সচেতন সংযোগ রেখে গল্প বলেন।

২.১. সংখ্যা আবিষ্কার: বিকল্প ইতিহাস ও ধারণাগত মেটাফর

সভ্যতার ইতিহাসে সংখ্যা আবিষ্কারের নানা কাহিনি প্রচলিত আছে, সেখান থেকে জানা যায় মিশরীয়, ব্যবিলনীয়, গ্রিক-রোমান বা মায়া সভ্যতার একাধিক গণনা পদ্ধতি থাকলেও আধুনিক গণনা পদ্ধতি ভারতীয় তথা আরব সভ্যতার মিলিত প্রচেষ্টার ফল। শশিভূষণের প্রথম গল্প 'সংখ্যা আবিষ্কার' রূপকথার মোড়কে বলা, তাই তার সূচনা হয়েছে এইভাবে—

> সে অনেকদিন আগের কথা। রাজাগণ কেবল রাজ্যস্থাপন করিয়া বসিয়াছেন, ঋষি-মুনিগণ তখনও তপস্যা করিতেন বনে জঙ্গলে।

কথকের অনুমান, তাদের প্রয়োজন কম ছিল বলেই মানুষ সংখ্যা গুণতে জানত না। এই কাহিনির নায়ক বংশলোচন বাচস্পতি বিদ্যাচর্চা করতেন, জীবনের উপান্তে এসে তাঁর অধ্যাপনার সাধ জাগে। বনপথে সর্বজ্ঞ ঋষির পরামর্শে তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করেন এবং রাজানুগ্রহে তাঁর পাঠশালা হয়। রাজা গোধন দান করলে প্রথমে গোসম্পদ গণনা এবং পরে মহাভারত পাঠ করার সময় হাওয়ায় উড়ে যাওয়া পৃষ্ঠা মেলানোর জন্য দশটি সংখ্যার স্থানান্তর-সংমিশ্রণে (permutation and combination) পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব বংশলোচন বাচস্পতিকে দিয়েছেন লেখক। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই ইন্দো-আরবীয় অবদানের নজির মিললেও, শশিভূষণ মৌখিক সাহিত্য মহাভারতের তালপাতায় লিখিত পুথির পাতার ক্রম নির্ণয়ের বিকল্প কাহিনি নিঃসন্দেহে মনোগ্রাহী। এই কাহিনির শুরু হয়েছে বাচস্পতির বার্ধক্যজনিত উপলব্ধির ফলে –

> **'আয়ু এখন হেলিয়াছে পশ্চিমের দিকে।'**

এখানে, **পশ্চিমের দিকে** হেলে থাকা **আয়ু** অর্থাৎ পূর্বদিক হল সূর্যোদয় অর্থাৎ দিনের শুরু অর্থাৎ জীবনের শুরু; তাই পশ্চিম দিক অর্থাৎ সূর্যাস্তের দিক অর্থাৎ দিনের শেষ বা জীবনের শেষ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। জীবনের বিমূর্ত ধারণাকে দিনের মূর্ত ধারণা দিয়ে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এইখানে LIFE IS A DAY (জীবন হল একটি দিন) এই ধারণাগত মেটাফরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। একে তালিকায় লিখলে বিষয়টি দাঁড়ায় –

সূত্র আধার (Source domain)	**লক্ষ্য আধার (Target domain)**
দিন	জীবন(আয়ু)
পূর্ব->সূর্যোদয়	শৈশব(সূচনা)
পশ্চিম->সূর্যাস্ত	বার্ধক্য (সমাপ্তি)

এখানে 'আয়ু' লক্ষ্য আধার এবং পশ্চিম সূত্র আধারের অঙ্গীভূত হওয়ার কারণে সার্থক ধারণাগত মেটাফর তৈরি হতে পেরেছে।

২.২. বক্কেশ্বরের বুদ্ধি: সামাজিক চিত্রণ

‘বক্কেশ্বরের বুদ্ধি’ সাধুভাষায় লেখা, গ্রামের দুই প্রতিবেশী গঙ্গারাম ও বক্কেশ্বরের খণ্ডিত কথনে কৌম যাপনে গ্রামজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক শঠতার পাশাপাশি তাদের জীবনে প্রসাশনিক শাসনব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক অপরাধ ও শাস্তির ধারণা উঠে এসেছে। বক্কেশ্বর গুড় বানায় না, ‘কেনা মাল’ বিক্রি করে, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় পরিবর্তন লক্ষণীয়, প্রবঞ্চনার শাস্তি হিসাবে গঙ্গারাম ধূর্ত বক্কেশ্বরকে ‘গাঁয়ে কি বাস করতে চাস, না জেলের ভাত খেতে চাস?’ বা পুলিশে ধরানোর হুমকি দেয়। বক্কেশ্বরকে জব্দ করতে ডাকঘর বানানোর কাগজে নেওয়া সই হ্যাণ্ডনোটে সেঁটে জাল নোট তৈরি করে।

এরপর গ্রামের বাঁশবনের ভিতর দিঘির পাড়ে নিশা ঠাকুরের কথা আসে। ‘এই নিশাঠাকুর রোজ রাত এক প্রহরের সময়ে একবার বাহির হন, খড়ম পায়ে দিয়া চটাং চটাং করিয়া শূন্যের উপর দিয়াই হাঁটিয়া বেড়াইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন’; শশিভূষণের লেখা কথিকা *নিশাঠাকুরের কড়চা*-য় এঁর কথা আগেই জানা গেছিল—

> আমি নিশাঠাকুর – চিনবে না কেউ আমাকে,
> এক অচিন্ গাঁয়ের সাতপুরুষের দেবতা আমি।
> বাস আমার পঞ্চাননের তেকোণা পুকুড়পাড়ে –
> যার অগ্নিকোণে প্রায় আকাশফুঁড়ে
> একটানা দাঁড়িয়ে আছে এক সমান দু’টো তালগাছ,
> যাতে ফলল না কোনদিন ফল – শুধু ধরল জটা –
> যারা বাতাসে তুলল একটানা সাঁই সাঁই রব।
> উত্তরে আছে মস্ত বড় বাঁশঝাড়,
> পশ্চিমে সুপুরিবাগ।

তাঁর রুদ্রমূর্তি গ্রামে অনেকে দেখেছে বহু উপকথা তাঁর নামে প্রচলিত, তাঁর দেখা পায় গঙ্গারাম। পুরুষানুক্রমে নিশা ঠাকুরের পূজারি গঙ্গারাম এক রাতে পূজার বিধিমতে পাটবিক্রির টাকা এবং হ্যাণ্ডনোট আগুনে আহুতি দিলে গল্পের শেষে বোঝা যায়, বক্কেশ্বরই নিশাঠাকুরের ছদ্মবেশে গঙ্গারামকে জব্দ করেছে। নিশাঠাকুর তাঁর কড়চায় আক্ষেপ করেছিলেন—

> দেখতুম মাঝে মাঝে চা’ল-চিঁড়ায় পুঁটলি বেঁধে
> সহরে চলত চাষীরা মামলা-মোকদ্দমার জন্যে।
> যত বাড়ল আইনের কারিকুরি,
> তত বাড়ল মিথ্যা, জাল আর জুচ্চুরি;
> মনের মিলে যতই পড়ল ভাঙা
> ততই বাড়ল খুনোখুনি আর দাঙা;

মামলায় চাষীদের নেশা ধরল শহরের, উকিল মোক্তারের কাছে জমিজমা প্রায় বাঁধা পড়ে গেল। গ্রামের মানুষ যখন বুঝতে পারল ‘বুকের রক্ত শুষে নিয়ে গেছে শহরের লালমাটি’, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এজাতীয় কোণ দুর্ভাগা

ফৌজদারি মামলায় নয়, এই কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে প্রায় ঈশপের গল্পের নীতিকথার মত, যেখানে টাকার কুমির গঙ্গারামের সাময়িক ক্ষতি হলেও ধূর্ত শেয়াল বক্কেশ্বরের জিত হয়েছে। এই গল্পে নিশাঠাকুরের বিশ্বাস সামগ্রিক ধারণাগত মেটাফর হিসাবে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত।

২.৩. 'গণ্শুর তত্ত্বজ্ঞান': শিশুমনস্তত্ত্ব, স্বপ্ন ও ধারণাগত মেটাফর

'ঘোষ-পাড়ার আজাদ-হিন্দ্ দল' আর 'বোস-পাড়ার ডরি-না-কাকেও ক্লাব'-এর ফুটবল ম্যাচের বিবরণী থেকে গল্পের শুরু। গ্রামের ছেলেরা পাড়ার একজনের গাছ থেকে কাঁচা বাতাবি নিয়ে জলে সেদ্ধ করে ফুটবল বানায়, পুরাণোল্লিখিত সমুদ্র মন্থনের অনুকরণে খেলে। গণ্শু স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় আটটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে ডাহা ফেল করে, তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে তার পরীক্ষা নিয়ে ভয় হয়—

> তেঁতুলতলায় বসিয় গণ্শুর চোখ কেমন ঝিমু ঝিমু করিতেছে – সেই ঝিমের মধ্যেই গণ্শু স্বপ্ন দেখিতেছে, চারিদিক হইতে বহু লোক যেন মালকোঁচা দিয়া একত্র হইয়াছে, তাহারা একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া গণ্শুর হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে একটা নীল সমুদ্রের তুফানের মধ্যে খালি চুবাইয়া দিতেছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল – সমুদ্রের মাঝখানে অতি বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "পরীক্ষা"।

এরপর তারকেশ্বরে পঞ্চার পিসিমার সঙ্গে মহাদেবের কাছে হত্যা দিয়ে, তারকেশ্বরের ভৈরবের থেকে প্রশ্নপত্র আদায় করলেও মনে রাখতে পারেনি, শেষে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে মগজ নতুন করে বানিয়ে দিতে এবং বিশ্বের পালনকর্তা বিষ্ণুকে সেই নতুন মগজ পরীক্ষার আগে অবধি পালন করার কথা বলে ভৈরব অন্তর্হিত হন। এই ঘটনা হয়তো গণ্শুর স্বপ্ন ছিল, বা স্বপ্ন লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান তার কাজেও এসেছিল। কিন্তু এই গল্পে পূর্বোল্লিখিত স্বপ্নে তার নির্জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন ভয়, যার অন্ধকার সমুদ্রের আকার নিয়েছে, এই পরীক্ষা হল সমুদ্র, এই ধারণাগত মেটাফর শিশু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে, বা ইয়ুং-এর তত্ত্বে নির্জ্ঞানের সঙ্গে জলের সম্পর্কের কথা মাথায় রাখলে পরীক্ষার ভীতি, জলে পড়ে যাওয়ার ভয় (আমরা নিরুপায় মানুষকে 'জলে পড়ে আছে' বলে থাকি) খানিক বোঝা যেতে পারে।

সূত্র আধার (Source domain)	লক্ষ্য আধার (Target domain)
সমুদ্র	**পরীক্ষা**
জল>নির্জ্ঞান>অন্ধকার>ভীতি	

৩. বিস্তৃত মেটাফর (Extended Metaphor)

যখন একাধিক ধারণাগত মেটাফর পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে মেটাফর তৈরি করে তখন বিস্তৃত মেটাফর সৃষ্টি হয়। এই ধারণাগত মেটাফরের ক্রম বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই বুঝতে পারেন কারণ সূত্র এবং লক্ষ্য তাঁদের পরিচিত, দৈনন্দিন কথনে কাজে আসে। শৃঙ্খলাকারে বিভিন্ন ভাবনা যুক্ত হয়ে মেটাফর তৈরি হয়, তাই ধারণাগত মেটাফর কেবল অলঙ্কার নয়, cognitive process-ও বটে, একথা সহজেই বোঝা যেতে পারে।

৩.১. 'কাগজের নৌকা': বাংলায় বিস্তৃত মেটাফর

'কাগজের নৌকা' গল্পে আট-ন' বছরের ছোট ছেলে পিলুর নৌকা ভাসানোর শখ। মোটা পাতলা, নানারঙের কাগজের তৈরি নৌকা সে কাজলী-গাঙে ভাসায়, তার আশা একদিন তার নৌকা 'অথৈ সমুদ্দুরে—সেই নাম-না-জানা দেশের নীলাকাশে' পাড়ি দেবে। সোনামুখী গাঁয়ের পাঠশালার দরিদ্র পণ্ডিত কানাই চাঁদ পিপলাইয়ের দাদা, বড় চাকুরে বলাই চাঁদ উকিলের পরামর্শে ভাইয়ের থেকে ঢাকার পৈতৃক সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু নিজের চোখে ভাইয়ের পরিবারের দৈন্যের ছবি দেখার পর এবং ভাইপো পিলুর প্রতি বাৎসল্যে বলাই চাঁদ দলিলের সই করা মোটা কাগজ নৌকা বানাতে দিয়ে দেয়। কোভেস্কস (২০০০) হাঙ্গেরীয় ভাষায় মেটাফর, ইয়ু (১৯৯৮) চৈনিক, মাৎসুকি (১৯৯৫) জাপানি এবং মাসাক, পাজাক এবং হায়াতি (২০১২) সালে পার্সি ভাষার নিজস্ব মেটাফর আবিষ্কার করেছিলেন। বাংলা মেটাফরের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বাংলা ভাষার আবেগ যেমন 'অভিমান' নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। Cognitive semantics অনুযায়ী কোভেস্কস্ বলেন CONCEPTUAL DOMAIN A IS CONCEPTUAL DOMAIN B, which is what is called a conceptual metaphor. (2010, p.4) দুই আধারের জ্ঞানের আদানপ্রদান ঘটে, যাকে mapping বলা হয়, যার দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার কাছে অর্থ স্পষ্ট হয়। এখানে জীবন একটি নদী (LIFE IS A RIVER) এই ধারণাগত মেটাফর বিস্তৃত হয়ে দলিলের কাগজ দিয়ে কাগজের নৌকা তৈরি হয়, পিলুর সারল্যে জাগতিক ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ভাই তথা ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি বাৎসল্যে বলাই চাঁদ রাগকে নৌকা বানিয়ে জীবন নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। এই গল্পে কাগজের নৌকা-ই বিস্তৃত মেটাফর হয়ে উঠেছে।

সূত্র আধার (Source domain)	**লক্ষ্য আধার (Target domain)**
নদী	জীবন
কাগজের নৌকা(বানানো)	জীবনের সিদ্ধান্ত (রাগ বাতিল করা)
নৌকা ভাসা	রাগ চলে যাওয়া

এই প্রসঙ্গটি **EMOTION IS LIQUID** বা অনুভূতি তরলের ন্যায় এই ধারণাগত মেটাফরের দিক থেকেও ভাবা যেতে পারে।

৩.২. 'রাখাল': ভারতীয় সংস্কার ও ধারণাগত মেটাফর

'রাখাল' গল্পটিকে ছোটদের গল্প বলা হলেও এই গল্পের বিপন্নতা ভারতীয় জনজীবনের অনতিক্রম্য এক নির্মাণ। প্রত্যন্ত গ্রামের বর্ণাশ্রম প্রথার প্রয়োগিক দিকের সাধারণ ছবিটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—'একদিকে বামুন-বৈদ্য-কায়েতের বাস, অন্যদিকটায় নমঃশূদ্রদের বাস।' জলচল হওয়া না হওয়া নিয়ে এই দুই দলের চর্যায় বিরোধের আঁচ লাগে, গ্রামের গোপালজীর মন্দিরের সামনে দোলযাত্রা উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার গানে ভদ্রলোকদের সঙ্গে নমশূদ্রেরা যোগ দেয়নি। নমঃশূদ্র নিবারণ ঘরামির ছেলে হরেকেষ্ট ঘরামি মাঠে গোরু চড়াত, গোষ্ঠের গান শুনতে তার ভালো লাগত। সে এই বিরোধকে উপেক্ষা করে গান শোনে, গোপালজী সাজে, বলরাম, ছিদাম সুবল তার তথা কৃষ্ণের অনুচরদের সমনামী ছেলেরা তার সঙ্গী—

> রাখাল বালকরা প্রত্যেকেই হাতে পাঁচনি লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়; কৃষ্ণ মাঝখানে দাঁড়াইয়া বাঁশীতে তান দেয় আর রাখাল বালকেরা হাতে পাঁচুনি তুলিয়া এবং মুখে গোরু তাড়াইবার শব্দ করিয়া নাচিতে থাকে;– আবার কখনও কৃষ্ণ মুখে বাঁশী দিয়া ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া থাকে, রাখাল বালকরা কত রকমের ফুল আনিয়া কৃষ্ণের পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চূড়া পর্যন্ত সেই ফুলে সাজাইয়া দেয়।

হরেকেষ্ট গোপালজীর কালো পাথরের মূর্তির সঙ্গে নিজের সামান্যতা খুঁজে পায় গায়ের কালো রঙে, জীবিকায়। তার নিজের কৃষ্ণযাত্রার দলে বামুন কায়েতের ছেলেরাও যোগ দিলে ফুলসাজের সময়ে ব্রাহ্মণ সন্তানের ঘরামির ছেলের পায়ে হাত দেওয়া নিয়ে জাতপাতের সমস্যা গুরুতর হয়ে ওঠে। গোপালজী মন্দিরের দীঘিতে ডুবন্ত পূজারি গোলক গোঁসাইকে হরেকেষ্ট বাঁচালেও মন্দিরে ঢুকতে পায়নি, মনের দুঃখে মাঠে বসে তেঁতুল গাছের ছায়ায় চোখ বুজে হরেকেষ্ট দেখতে পায় ধবলী গাইয়ের গলায় হাত বুলোতে বুলোতে মাথায় ফুলের চূড়া, গলায় মালা, চন্দনচর্চিত পাথুরে কালো মুখের একজন এসে তার পাশে বসে গলা আদরে জড়িয়ে ধরে, মনকেমনের কারণ জানতে চায়। 'রাখাল-বন্ধু'-র থেকে হরেকেষ্ট জানে, কেবল সে নয়, মন্দিরে তাঁরও প্রবেশের অনুমতি নেই, তিনি জানান—

> আমি ত রাখাল—এই মাঠে মাঠেই থাকি। তোমরা যখন গোরু নিয়ে বাঁশী বাজিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াও—আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়াই। আমি কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের গোষ্টলীলার গান শুনে গেছি জান?

গীতার 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ' এই শ্লোকানুযায়ী আমাদের ইন্দ্রিয় দিনেরবেলা জাগ্রত হয়ে বহির্মুখে নানাদিকে ধাবিত হয়, রাতের অন্ধকারে যা অন্তর্মুখে ফিরে আসে। বৈষ্ণবদের গোষ্ঠলীলায় এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মেলে। *ভারতীয় সাধনায় ঐক্য* গ্রন্থে শশিভূষণ লিখেছেন—

> গোষ্ঠলীলার একটি পূর্বগোষ্ঠ এবং একটি উত্তর-গোষ্ঠ রহিয়াছে। গোরু যেখানে বিচরণ করে তাহাই গোষ্ঠ (গাবস্তিষ্ঠন্তি অত্র ইতি গোষ্ঠঃ); ইন্দ্রিয়গুলিই এখানে গোরু; প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিষয়ক্ষেত্ররূপে গোষ্ঠে বা বিচরণ-ক্ষেত্রে বাহির হইয়া যথাসুখ বিষয় গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় আবার বাজিয়া ওঠে 'সর্বান্তরাকর্ষক' কৃষ্ণের বাঁশি – তখনই আসে আপন ঘরে ফিরিবার পালা; এই আপন আবাসে উল্টামুখে ফিরিয়া চলার নামই উত্তর গোষ্ঠ। বহির্মুখ হইতে অন্তর্মুখে ফিরিবার সময় রাত্রি –তাই ধীর ব্যক্তির সকল কাজ রাত্রিতে, 'তস্যাং জাগর্তি সংযমী' –দিবসের কর্মকোলাহলে তাঁহার উপেক্ষা।

কিন্তু উপেক্ষা তো জাগতিক কাজে ব্যাপৃত লৌকিক মানুষের জন্য, শিশুদের তাঁর কাছে অবাধ গতায়াত। তাই হরেকেষ্টর সহজ সাধনা সাধ্য লাভ করেছে, গোপালজীর প্রস্তরমূর্তি রূপ তাকে দেখা দিয়েছেন, 'রাখাল' গল্পে ঈশ্বর স্বয়ং রাখালবেশে (এক্ষেত্রে বিস্তৃত মেটাফর) এসে হরেকেষ্টর মনোবেদনা দূর করেছেন। ভারতীয় বাসনা-সংস্কারের নিরিখে এই ধারণাগত মেটাফর বুঝতে হবে—

সূত্র আধার (Source domain)	লক্ষ্য আধার (Target domain)
রাখাল	ঈশ্বর
বাঁশির সুর	সাধনা
গোরু	ইন্দ্রিয় (জীবাত্মাও হতে পারে)

৪. শশিভূষণের নিজস্ব শৈলী

'চোর না ভূত' গল্পে মানুষের স্বাভাবিক ভীতি এবং তদ্বজনিত কারণে অকারণ ঝামেলার ছবি ফুটে উঠলেও আধিদৈবিক আবহ তৈরিতে কথক সাহায্য করেছেন। কালুরা শহরে থাকলেও তার পিসি গ্রামের বাড়িতে পড়ে আছেন কেন এই নিয়ে নানান জনের নানান মত। বিধবা মেয়েকে বাবা মোহর লুকিয়ে দিয়ে গেছেন থেকে তার ডাইনিত্ব নিয়ে রটনা সবই বর্তমান। তাকে জোরদার করতে কথক জানান—

> বাঁশবন এবং বেতবনে বাড়িটাকে চারিদিক হইতে ঢাকিয়া রাখিয়া ভূতের বাড়িই করিয়া তুলিয়াছে। তারপর বাড়ির ঈশান কোণে পাতা রহিয়াছে 'পঞ্চমুণ্ডী'র আসন – অর্থাৎ পাঁচজন মৃত চাঁড়ালের মাথা মাটির নিচে পুঁতিয়া তাহারই উপরে মাটির মঞ্চাকৃতি এক আসন। রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে শিবা-বলি হয়; অর্থাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কালুর পিসি একহাঁড়ি ভাত রাঁধিয়া কলার পাতায় এখানে রাখিয়া দিয়া একটু দূরে গিয়া হাততালি দিতে থাকে – আর তিন চারিটি খেঁকশিয়াল আশেপাশে বনবাদাড় হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই ভাত খাইয়া যায়।

শশিভূষণ দিক্‌নির্দেশ করতে হামেশাই উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিণ-পূর্ব না বলে যথাক্রমে বায়ু ও অগ্নিকোণের কথা বলেন, এই সুবাদে দশদিশের হদিশ দিয়ে দেন। সাধারণত দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হল নৈঋত কোণ, যার অধিপতি দিকপাল দেবতা নৈঋত্য, অধিপতি গ্রহ রাহু ও কেতু। অমঙ্গলসূচক এই দিকে গুহ্যসাধনার প্রেক্ষাপটে কাহিনির অবতারণা। সন্ধ্যাবেলায় চোর চিৎকারে গ্রামের মাতব্বররা একদায়গায় হয়ে প্রথমে চোরের দল, পরে অলৌকিক যোগসাজশ কথা কল্পনা করে সকলে যখন চিন্তা করতে শুরু করে, তখন একটি আহত বিড়ালের দেখা মেলে। তার দৌরাত্ম্য এবং গ্রামের সকলের সামগ্রিক ভীতির সমাকলনে এই ঘটনা ঘটেছে বোঝা গেলেও বহারম্ভে লঘুক্রিয়া হয় বটে কিন্তু শশিভূষণের নিজস্ব তন্ত্রসাধনা সম্পর্কিত জ্ঞান অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে।

'মা' গল্পে এক দুর্যোগের দিনে জনৈক যুবককে আগুনমুখা নদী পেরোতে সাহায্য করে এক জোয়ান মাঝি। যুবকের মা অসুস্থ শুনে নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না করে সে যুবককে পার করায়। ঝড়বৃষ্টি কমে নদীর ওপারে তারা নির্বিঘ্নে পৌঁছালে জানা যায়, মাঝি অর্থের লোভে আসেনি, দুইবছর আগে দুর্যোগে আটকে গিয়ে মাঝি নিজের মাকে শেষ দেখা দেখতে পারেনি। নিজের অনুরূপ অভিজ্ঞতার অনুতাপেই সে যুবককে প্রাণের মায়া না করে নিয়ে এসেছে। যুবকটি ব্রাহ্মণ সন্তান, বাড়ি ফিরে দেখে তাঁর মা সুস্থ হয়ে উঠছেন, তাঁকে ঘটনা জানালে তিনি তাঁর রোগশয্যার পাশে যুফক ও জেলেকে বসান, রোগশীর্ণ দুইখানি হাত তাদের মাথায় রাখেন। প্রতিবেশিনী যখন বিছানায় শুয়ে 'চাড়াল স্পর্শ'-এর কথা তোলেন, তখন—

> মৃদুহাস্যে মাতৃমুখের প্রশান্ত মহিমা ব্যঞ্জিত করিয়া রোগিণী তেমনই ফিস্ ফিস্ করিয়া জবাব দিলেন, – 'ছেলের কি আর কোনও জাত থাকে দিদি।'

এই গল্পে স্রষ্টা শশিভূষণের প্রবণতা বোঝা যায়, তিনি সামাজিক নিয়মকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিতে পারেন না, তাই সাহিত্যের দায় স্বীকার করে সমকালের কথা বললেও ছোটদের গল্প বলতে গিয়ে রাজার গল্প, দুষ্টু ছেলের গল্পের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপদেশ কথাচ্ছলে দিয়ে গেছেন।

৫. উপসংহার

অর্থমাধুর্য অন্বয়নির্ভর সমাজ জীবনের অনেক সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ইতিহাসচিহ্ন বহন করে। হেডউইগ কনরাড সাহিত্যিক মেটাফর এবং নান্দনিক মেটাফরের কথা বলেছেন। সাহিত্যিক মেটাফর কোন সূত্র আধারের কোন বস্তুর অবশ্যম্ভাবী চরিত্রকে লক্ষ্য আধারে আরোপিত করে, ফলে বক্তা এবং শ্রোতার পক্ষে সহজেই অর্থ নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় যদিও এর অর্থ সীমিত। অন্যদিকে নান্দনিক মেটাফর ভ্রম তৈরি করে, নতুন আলোকে বিষয়কে উপস্থাপিত করে উদ্দেশ্য এবং মাধ্যমের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর অর্থ সীমিত না হলেও পাঠকের অভিপ্রায় নির্ভর ফলে স্থান কাল ভেদে তার পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রপন্থ্ কবি তাঁর আপন খেয়ালে প্রেম বিস্ময় কল্পনার ধারণাকে জারিত করেন। স্বতন্ত্র আত্ম-সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ে ব্যষ্টি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমষ্টি-সত্তা লাভ করে, একেই সমাজ বলা হয়। সমাজ-সত্তার অর্থ তাই প্রায় সবটাই নির্ভর করে 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-সত্তার উপরে এবং ব্যক্তি-সত্তার অর্থের ভগ্নাংশ একত্রে যোগ করলে সমাজের অর্থ স্পষ্ট হয়। 'সমাজ অংশী, ব্যক্তি অংশ।' সমাজের অখণ্ড সত্তা এবং অর্থের সঙ্গে নিবিড় যোগেই ব্যক্তি-পুরুষের অর্থ এবং মহিমা লাভ করা যায়, শশিভূষণ সেই মানবধর্মের চর্যাকার। শশিভূষণ *ছোটদের ছোটগল্প*-এ একাধিক গল্পে নানা ধারণাগত মেটাফর ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় সাধনার তথা উপাসক সম্প্রদায়ের গবেষক ছোটদের গল্পের মাধ্যমে জীবনধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন তিনি বিশ্বাস করতেন—

> ...আসলে ধর্ম জিনিসটাই কোথাও অচল এবং শাশ্বত হইয়া বসিয়া নাই। ধর্মের ভিতরে এই যে একটা নিরন্তর হইয়া উঠিবার প্রশ্ন রহিয়াছে, ধর্মের এই গতিশীল রূপটির উপরে জোর দিবার জন্যই আজকাল যুগধর্ম কথাটাকে বারবার করিয়া সর্বপ্রসঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়।

তাঁর কাছে 'ব্যক্তি'র একক অস্তিত্ব নেই, সে ব্যক্তি বৃহৎ সমাজের একটি অংশ—আবার বৃহৎ সমাজেরই প্রতীক। ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে নব্য-ঔপনিবেশিকতার প্রভাব এড়ানো শশিভূষণের লক্ষ্য ছিল। তাই *ছোটদের ছোটগল্প*-এ ভারতীয় ধারণাগত মেটাফর ব্যবহার করে তিনি ছোটদের প্রকৃতার্থে বড় হওয়ার পাঠ শেখাতে চেয়েছেন, ভারতীয় মনন চর্যাই দার্শনিক শিশুসাহিত্যিকের অন্বিষ্ট। তাঁর 'জংলা মাঠ' কবিতায় যে জয়ধ্বনি অনুরণিত হয় –

> এরা ভাল নয় – এরা মন্দ নয় –
> এরা প্রাণ-দেবতার নিত্যকালের পাগলামী –
> নিত্যকালের বিস্ময়।

গ্রন্থপঞ্জি:

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ; (১৯৬১)। *ছোটদের ছোটগল্প*। কলকাতা: ভারতী লাইব্রেরী।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ; (১৯০০)।*ভারতীয় সাধনার ঐক্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ; (১৯৪২)। *সাহিত্যের স্বরূপ*। কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ; (১৯৪৭)। *নিশাঠাকুরের কড়চা*। কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ; (১৯৫১)। *শিল্প-লিপি*। কলকাতা: শ্রীগুরু এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

বড়ুয়া, সুমিত; (২০১৪)। ‘আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত’র গদ্যচর্চা: গদ্যের দার্শনিকতা, *এবং মুশায়েরা গদ্যকার সংখ্যা ২১ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা ১৪২০*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, পৃ.৫৮–৯৭।

Kövecses, Z. (2010). *Metaphor: A practical introduction*. Oxford, New York: Oxford University Press.

Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.

Ricoeur, P. (1978) *Rule of metaphor*. London: Routledge and Kegan Paul.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার শব্দেরা কথা বলে

প্রদীপ বিশ্বাস

অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 28/08/2024
Accepted 05/03/2025

সূচক শব্দ:

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

যাত্রাপালা,

সংলাপ,

ভাষা,

অতিথি সম্পাদক

শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বৈচিত্রপূর্ণ সাহিত্য জগৎ এবং অভিনয়ের পাশাপাশি যাত্রাপালা রচনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে এবং ঠাকুরবাড়ির বর্ধিষ্ণু পরিবারে অবনীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা। সেই সুবাদে তাঁর সাহিত্য-জগতে পথ চলা। তিনি নাটক না লিখে অভিনব যাত্রাপালা লিখে নতুনত্বের পথ দেখালেন। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে সুচারুভাবে যাত্রাপালার সংলাপে নতুন পথের প্রদর্শক হলেন তিনি।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, সাহিত্যের অনুভূতি নিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যাত্রাপালার সংলাপ সৃষ্টি করলেন। চিত্ররূপময় এই সংলাপে ভাষার চিত্রধর্মী, গল্প বলার ভঙ্গীমা, ও বৈঠকী মেজাজের সুরটি ধরা পড়ছে। তিনি ব্যাকরণবিদ্ না হওয়া সত্ত্বেও ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল। তিনি চেনা জগতের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ ব্যবহার করে অতি পরিচিত ভাষা সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন ধরণের রূপ, প্রত্যয়, বিভক্তি নিয়ে সংলাপে সুরঝংকার এনেছেন। সংলাপের ভাষাতে প্রযোজক ধাতু, নামধাতু, ধ্বনাত্মক ধাতু, মৌলিক ধাতু, যৌগিক ধাতুর প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া তিনি কথ্য ভাষার, সাধু গদ্য রীতির স্বাবলীল প্রয়োগ করলেন। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের ব্যবহার অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করেছেন। বিদেশি শব্দ, দেশি শব্দ, প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের সাথে মিশ্র শব্দেরও ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ভাষার মতো গ্রীক ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া, মিশ্র ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ ব্যহারের ফলে ভাষা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি কামরূপি, বরেন্দ্রী, রাঢ়ী, উপভাষার ব্যবহার করলেও বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন কলকাতার উপভাষাকে। কারণ, কলকাতার মেছুয়া বাজার থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে ভালো ভাবে রপ্ত করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার সংলাপে চিত্রময়তার বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি দৃশ্যপট ছাড়াই যাত্রার সংলাপের জগৎ সৃষ্টি করলেন। গদ্য-পদ্য উভয় ভাষাতে গীতিময়তার ধারা সৃষ্ট সংলাপে দেখা যায়। মনের খেয়ালি জগৎ থেকে সৃষ্ট সংলাপে পুরোদস্তুর উদ্ভট রসের সন্ধান মেলে। তাঁর যাত্রাপালার সংলাপে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণির কথা তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে আধমরা যাত্রা শিল্পের প্রতি

Corresponding author's email ID: biswaspradip1976@gmail.com

সহানুভূতিশীল হয়ে যাত্রার পুনঃরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছেন। স্বদেশিযুগে আবাধ মেলামেশার সুবাদে সাধারণ লোক মুখের ভাষাকে আয়ত্ত করেছিলেন। তাই সংলাপে ধর্মীয় মিলনের সুর তাঁর যাত্রাপালার পরতে পরতে উদ্ভাসিত।

মানুষের আত্মা ও তার ভাষা পরস্পরের পরিপূরক। তাই চিন্তা ও ভাষা মূলত একই। মনের চিন্তাকে যখন অন্য মনে পৌঁছে দেবার দরকার হয় তখন যে মাধ্যমটি কাজ করে তা হলো ভাষা। সবুজ সতেজ বৃক্ষের মত ভাষা মানুষের জীবন-মনন-সমাজ-সংস্কৃতির ভিতর থেকে রসদ সংগ্রহ করে। শিল্প-সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। যিনি শিল্পী তাঁর মনোলোকে কল্পনার মূর্তি সৃষ্টি করেন এবং তাঁর অনুভূতি অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে প্রকাশ মাধ্যম ব্যবহার করেন। এই প্রকাশ মাধ্যমের রূপ হল সংগীত, চিত্রকলা, সাহিত্য ইত্যাদি শিল্প। শিল্পী যখন কথা বা ভাষার মাধ্যম ব্যবহার করেন তখন তা হয় সাহিত্য শিল্প। শিল্প পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে প্রকাশের মাধ্যমে। 'নীরব কবিত্ব' বলে তাই কিছু হয় না। আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যে শিল্পীর শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমার্জন যত বেশি তার সাহিত্যের ভাষা তত বেশি পরিমার্জিত অথচ জীবন্ত। ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্র থেকে সৃষ্ট কতকগুলি ধ্বনিসমষ্টি যা বিশেষ অর্থবহ প্রতীক। ধ্বনির নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য আছে। আবার একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে ধ্বনির চেয়ে যে বড় অর্থপূর্ণ একক গড়ে তোলে তাই শব্দ (Word)। শব্দের আবার নানা দিক থাকে। তার গঠন, শ্রেণিবিভাগ, রূপবৈচিত্র, অর্থ সহ নানা উপকরণ তথা প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি। ধ্বনি ও শব্দের এই দিকটি বিবেচনা করে অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার ভাষা-শিল্প বিষয়ে আলোকপাত।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় রূপমূলের ব্যবহার:

রূপমূলকে আমরা ইংরাজিতে বলতে পারি 'Morpheme'। শব্দ + বিভক্তি = শব্দরূপ এবং ধাতু + বিভক্তি = ধাতুরূপ। বিভক্তিযুক্ত পদকে তাই 'রূপ' বলতে পারি। রূপমূল বলতে বোঝায় শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের মূলটিকে অর্থাৎ প্রতিপাদিক (Stem) ও ধাতু (root) কে। অন্যান্য যাত্রাপালাকারের তুলনায় প্রয়োজনের তাগিদে তাকে ভাষার খুঁটি-নাটি বিষয় আয়ত্ব করতে হয়েছিল। আর তার প্রয়োগ চোখে পড়ে যাত্রাপালার সংলাপে ও গানে। রূপ, রূপমূল, সহরূপমূল, স্বাধীন ও পরাধীন রূপমূল, আভিধানিক রূপমূল ইত্যাদি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের সম্যক ধারণা ছিল। রূপকে নিয়ে তিনি খেলা করেছেন। তাঁর যাত্রাপালায় ব্যবহৃত কিছু দৃষ্টান্ত হাজির করে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করাতে চাই।

স্বাধীন ও পরাধীন রূপমূলের ব্যবহার,

ক। "পঙ্কজ নাই পাঁক নাই রোদ খরতর।"[১]

খ। ''সুপথে বিপথে শমন নিকট,"[২]

পদ	স্বাধীন রূপমূল	পরাধীন রূপমূল
পঙ্কজ	পঙ্ক	জ
সুপথে	পথ	সু, এ
বিপথে	পথ	বি, এ

প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগে নিষ্পাদক রূপমূলের ব্যবহার,

ক। ''হায় আমি চলৎ শক্তি— রহিত অসহায়।"[৩]

খ। "এই উপর হতে নিচে নামন
এই নিম্ন থেকে উচ্চে ধাবন।"[৪]

শব্দ	স্বাধীন রূপমূল	প্রত্যয়/উপসর্গ
নামন	নাম	অন
ধাবন	ধাব্	অন
অসহায়	সহায়	অ

অবনীন্দ্রনাথ রঙ্গরসের ভাষা সৃষ্টিতে মনোযোগের সাথে প্রত্যয় ব্যবহার করে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় ধ্বনি

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় শব্দরা কথা বলে। রবীন্দ্রনাথই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। ভাষার পরিবর্তন হয় তার দেহে এবং আত্মায়। তার বাইরের গঠনে এবং অন্তরঙ্গ বক্তবে। ধ্বনি পরিবর্তন (Sound change) এবং অর্থ পরিবর্তন (Semiotic change) এই দুটির মূল পরিবর্তন হয় ভাষাতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্বনি পরিবর্তনের 'মিশ্রভাষা ঋণ গ্রহণ' প্রক্রিয়াটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উপাদানের সঙ্গে মিশ্রণ করে সংকর শব্দ বা Hybrid Word তৈরী করলেন। বিচিত্র ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন করেছেন। কিছু দৃষ্টান্ত,

ক। ধ্বনির আগম

বাইরের থেকে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের আগে, পরে, বা মাঝখানে উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য আনা হয়। একেই বলে ধ্বনির আগম। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় এই ধ্বন্যাগম প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করে প্রায় নতুন ধরনের ভাষা সৃষ্টি করেছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত,

১। "এস্পার ওস্পার" যাত্রাপালায়,

"জালু। না অবনবাবুর আর্ট ইস্কুলে শিখেছি।"[৫]

২। ভূতপত্রীর যাত্রাপালাতে জেলভিস্তির নৃত্যগীতে,
"রে ভিস্তি ইস্তাবিল সে পানি ছিটল।"[৬]

ব্যবহৃত পদ	মূল শব্দ	আগম ধ্বনি	ধ্বনি আগমের নাম
ইস্কুলে	School – স্কুল	ই	স্বরাগম
ইস্তাবিল	Stable – স্টেবল	ই	স্বরাগম

খ। ধ্বনির লোপ

ধ্বনির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শ্বাসাঘাত। কোন শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে কখনো কখনো শ্বাসাঘাত পড়ে। শব্দের যেখানে শ্বাসাঘাত পড়ে না সেই জায়গার ধ্বনি ক্ষীণ হতে হতে শেষে লোপ পেয়ে যায়। তাঁর সৃষ্ট শব্দ একদিকে যেমন ব্যাকরণ সম্মত অন্যদিকে ভাষামাধুর্য । কয়েকটি উদাহরণ:
'ঋষি যাত্রা' পালাতে,

১। "চেলা। দরকার কী বুঝে। মাছ খেগো বিড়াল
তপসে মাছ ভাজার চেষ্টায় আছেন।"[৭]

২। "...আশ্রমটার দু-একখানা ঘর বাড়ি, রাস্তাঘাট, পুষ্কর্ণী ইত্যাদি।"[৮]

, ৩। "রামা। মা, এই নাও দুটো দোনা, আমি কলাপাত্ কাটিগা।"[৯]

১। **তপস্বী** > তপসে — 'অ' ও 'র' ধ্বনির লোপ এবং 'ঈ' কার 'এ' কারে পরিবর্তিত।

২। **পুষ্করিণী** > পুষ্কর্ণী — 'ই' ও 'অ' লোপ।

৪। **কলাপাতা** > কলাপাত্ — 'আ'— ধ্বনি লোপ।

ধ্বনির রূপান্তর:

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাত্রাশিল্পের ভাষা সৃষ্টিতে ধ্বনি রূপান্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি চিত্রশিল্পের জগতে যেমন সাজিয়ে তুলেছেন তেমনি ভাষার জগতেও তাই। যাত্রাপালায় ব্যবহৃত কয়েক প্রকার ধ্বনি রূপান্তরের পরিচয়,

ক। অপিনিহিতি:

সাধারণ ভাবে কোনো শব্দের মধ্যে 'ই'-কার বা 'উ'-কার যে জায়গায় উচ্চারিত হবার কথা সেখানে উচ্চারিত না হয়ে আগে এসে উচ্চারিত হয়। আমরা একে অপিনিহিতি বলি। অবনীন্দ্রনাথ পালাগুলিতে অপিনিহিতির প্রয়োগ করেছেন। 'ভূতপত্রীর যাত্রা'তে উদ্ধবের গীতে পাই,

১। "উদ্ধব।... দশ যোজন পথ ধইরা,
চাহারা বালু আছে পইরা,"[১০]

ধরিয়া > ধইরা

পড়িয়া > পইরা ['ড়' ধ্বনি 'র' ধ্বনিতে পরিবর্তিত]

খ। অভিশ্রুতি:

ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনিতত্ত্বের অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষাতে বেশি লক্ষ্যণীয়। পালাকার অবন ঠাকুর কলকাতার বাসিন্দা। অপিনিহিতি জনিত 'ই'-কার বা 'উ'-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজে তার সংগে পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়। এই ঘটনাই অভিশ্রুতি। 'ভূতপত্রীর যাত্রা'-য় পশুপাগলার গীতে,

১। ''কালুমেঘে তাদেরও জালে ধরে।''[১১]

২। "মাসিমা তার বাড়ি ছেড়ে করিছে গমন।"[১২]

৩। ''কে খাওয়াল শিলে বেটে?''[১৩]

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে পাই,

মূলশব্দ	অপিনিহিতি	অভিশ্রুতি
ধরিয়া	ধইর্য়া	ধরে
ছাড়িয়া	ছাইড়্যা	ছেড়ে
বাটিয়া	বাইট্যা	বেটে ইত্যাদি।

গ। স্বরসংগতি ও ব্যঞ্জন সংগতি:

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ জনিত কারণে যদি পরস্পরকে প্রভাবিত করে পরিবর্তিত হয় তবে তাকে স্বরসংগতি বলে। ব্যঞ্জন ধ্বনির বেলাতে এই ঘটনা ঘটলে তাকে ব্যঞ্জন সংগতি বলে। অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাপালার ভাষা সংলাপে এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন করেছেন। যেমন,

১। "ভুরুৎ। আমার গণা মুলোদান্তি"— ধ্বনি লোপ। ।

মুন্সি। আমার গণা শুলোদান্তি।

কালু। রেখে দাও পাঞ্জি কুলোখানি ধুলোদান্তি।"[১৪]

মূলশব্দ	পরিবর্তিত শব্দ	ধ্বনির পরিবর্তন	পরিবর্তনের নিয়ম
মূলা	মুলো	'ঊ' ধ্বনি 'উ' কারে এবং 'আ' ধ্বনি ও ধ্বনিতে রূপান্তর।	স্বরসংগতি
শূলা	শুলো	ঊ ও আ ধ্বনির পরিবর্তন	স্বরসংগতি
ধূলা	ধুলো	'ঊ' কার ও 'আ' ধ্বনির পরিবর্তন	স্বরসংগতি

ধ্বনির পরিবর্তন ও ধ্বনি সৃষ্টি:

গঠনে ও আঙ্গিকে অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালা নতুনত্বের দাবিদার। আগাগোড়া হাস্যময় ও উপভোগ্যতার কারণে তাকে ভাষায় অভিনবত্ব দান করতে হয়েছিল। এজন্য তাঁর উপর ধ্বনির ভাষা-গড়ার দায়িত্ব পড়েছিল। কখনও ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন কখনো বা ধ্বনিকে ভেঙে-চুরে, দুমড়ে-মুচড়ে নিজস্ব চিন্তাধারায় শৈল্পিক দৃষ্টিকোণে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নব নব ধ্বনির জগৎ।

১। "নবীন। আহা বলেন কেন দুষ্কের কথা, ঐ
খালপাড়ে দেখলাম, যেমনটি চাই তেমনটি
পাঁঠাটি—দিব্বু হিরিষ্টু পুরিষ্টু ছাগল।"[১৫]

উপরিউক্ত বক্তব্যে,

দুঃখের > দুষ্কের [এখানে ' দুস্' ধ্বনি ' দুষ্' ধ্বনিতে এবং 'খ' ধ্বনি 'ক' ধ্বনিতে পরিবর্তিত]
দিব্যি > দিব্বু [য-ফলা 'ব' ধ্বনিতে এবং 'ই' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিবর্তন]
হৃষ্ট > হিরিষ্টু ['ই' ধ্বনির আগম, 'ঋ' ধ্বনিকে 'রি' রূপে প্রকাশ, সংগে 'উ'কারের আগম]
পুষ্ট > পুরিষ্টু [মাঝে 'রি' ধ্বনির আগম, শেষে 'উ' ধ্বনির আগম]

এইভাবে কখনো বিভিন্ন ধ্বনিকে এনে শব্দের নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। শব্দ উপভোগ্য হয়েছে অথচ অর্থের জায়গাটি একই আছে। ভাষার এই রকম ব্যবহার সত্যিই অভাবনীয়।

মৌখিক চলতি কথার ব্যবহার তিনি অতি সুন্দরভাবে করেছেন। দেখা যায় তিনি ধ্বনির আদলে এমন নতুন ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন যেটাকে একেবারেই নতুন বলে মনে হয়।

"বুনো হরিণ নাপাতে নাপাতে তো বেরিয়ে গেল সোজা।"[১৬]

এখানে, লম্ফ > লাঁফ; লাঁফ + আ প্রত্যয় = লাঁফা; লাঁফা + তে (বিভক্তি) = লাঁফাতে 'লাফাতে'—শব্দের 'ল' ধ্বনি 'ন'তে এবং 'ফ' ধ্বনি 'প' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে 'নাপাতে' হয়েছে।

বন্য > বুনো হয়েছে।

ধ্বনি পরিবর্তনের এই কারসাজি সত্যিই অভিনব।

অবনীন্দ্রনাথ নতুন ধ্বনি তৈরি করেছেন অনায়াসে। অথচ তার গূঢ় অর্থের সাথে অভিন্ন মনে হয় না। লম্বকর্ণের পালায় মিঞার কেচ্ছায় পাই,

"ওই 'ছ'এ আকার 'গ' ছাগ— 'ব' এ

আকার ‘গ’ বাগ—ছাগে বাগে এক ঘাটে জল
খায় চক—চ চক—চ—।”[১৭]
...তার দাদা ছিল ভোট-কম্বল-লামা ছাগল।

যারে বাংলাতে কয়—রামছাগলা।”—এখানে অনায়াসেই ‘লামা ছাগল’কে ‘রাম ছাগলা’য় পরিবর্তন করে ধ্বনির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ‘লম্বকর্ণের পালা’-তে ‘ত’-ধ্বনির বদলে ‘দ’-ধ্বনি ব্যবহার করেছেন।

“নবীনা... আমায় দেখে ডাক দিয়ে চলল যেন
গীদ্ গেয়ে করুণ স্বরে ধমকে ডাকছে।”[১৮]

—এই পালাতে বহুক্ষেত্রে ‘ন’-ধ্বনির বদলে ‘ল’-ধ্বনি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

“অধিকারী।...বলি ও লরহরি লাগ,—
তুমি দেবা লবমীতে ছাগ, বুঝলে?”[১৯]
এখানে, নরহরি >লরহরি

নাগ > লাগ
নবমীতে> লবমীতে ইত্যাদি।

—একদিকে ধ্বনি ঝংকার, সুর-ঝংকার, অন্যদিকে নতুন ধ্বনি-শব্দ সৃষ্টি করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল অবনীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়।

অবনীন্দ্রনাথ আবার ‘ল’-ধ্বনির পরিবর্তে ‘ন’-ধ্বনি ব্যবহার করে ও শব্দ মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। ‘লম্বকর্ণের পালা’য়,

“নবীন। কুচকুচে কালো নধর দেহ, নম্বা নম্বা
নটপটে কানের উপর কচি পটলের মত
দুটি শৃঙ্গ—”।[২০]

লম্বা লম্বা > নম্বা নম্বা,
লটপটে > নটপটে ইত্যাদি।

‘ভূতপত্রীর যাত্রা’য় অবুর গীতে,

“...অন্ধের নড়ি ভূত পতরি আটঘাট দেখিয়ে চলো।”[২১]

এখানে 'নড়ি' শব্দটির ব্যবহার অদ্ভুত।'যষ্ঠি'—শব্দের অর্থ 'লাঠি'। আর 'লাঠি' শব্দ থেকেই 'নড়ি' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ অর্থ একই রেখে ভিন্নমাত্রার ধ্বনি প্রয়োগে অনবদ্য।

'কবিরাজ', 'সুন্দরবন', 'হোমিওপ্যাথি', 'মুসলমান', 'সুগন্ধ' ইত্যাদি শব্দকে নবরূপে ব্যবহার করেছেন অবনীন্দ্রনাথ।

কবিরাজ > কোবরেজ, [২২]
সুন্দরবনে > সোঁদরবনে, [২৩]
হোমিওপ্যাথি > হমোপাতি, [২৪]

ধাতু ও ক্রিয়াপদ:

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার ভাষারূপ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এই কারণে তাকে নতুন নতুন শব্দ ও ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করতে হয়েছে। তাঁর পালায় মৌলিক ধাতু, সাধিত ধাতু, ধ্বনাত্মক ধাতু, নামধাতু, সংযোগমূলক ধাতু, ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। সংলাপ ও গানের ভাষায় শব্দের নতুন ভুবন সৃষ্টি করলেন।

মৌলিক ধাতু:

মূল ধাতু, যাকে বিশ্লেষণ করা চলে না—তাই মৌলিক ধাতু বা সিদ্ধ ধাতু। অবনীন্দ্রনাথ মৌলিক ধাতুকে ক্রিয়াপদে পরিণত করেছেন।

১। "গা তোল্ গা তোল গা তোল্ গা তোল্।"[২৫]
২। "ভীম। গালাগালি দিস্ খালি—"[২৬]
৩। "উড়ে পড় ঝুলে পড়, উঠে পড় নেমে পড়
--- গান ধর—চিড়িমিড়ি—চিড়িমিরি।"[২৭]

এখানে— 'তোল্', 'দিস্', 'পড়', 'ধর' ইত্যাদি মৌলিক ধাতুর ব্যবহারে ভাষা প্রাঞ্জল ও রস-রসিকতার চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

সাধিত ধাতু:

মৌলিক ধাতু থেকে তৈরি করা ধাতু হলে সাধিত ধাতু। কোন ধাতু বা নাম শব্দের সংগে এক বা একাধিক প্রত্যয় যোগ করে সাধিত ধাতু পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি পালাতে মনোমুগ্ধকর ভাষা সৃষ্টিতে সাধিত ধাতু ব্যবহার করেছেন।
'ভূতপত্রীর যাত্রা'য়,

"আহে, ঘোড়ারোগে ধরা বড়ো দায়, টান ধরায়
পুঁজিপাটায় ডানে চলাইতে মন বামে ভিড়ে যায়!"[২৮]

শব্দ	মৌলিক ধাতু	প্রত্যয়	সাধিত ধাতু	বিভক্তি
ধরায়	ধর্	আ	ধরা	য়
চলাইতে	চল্	আ	চলা	ইতে

এই রকম দৃষ্টান্ত অবনীন্দ্রনাথের গানে এবং যাত্রাপালায় অজস্র আছে।

নামধাতু:

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের পদে 'আ'—প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নামধাতু গঠন করে। উদাহরণ-

(১) "রাত দুপুরে চাঁদটা ঘুমায়
জাগে বাদুড় করে ঘুর ঘুর হুতম প্যাঁচায় হুতুমথুমায়।"[২৯]

পদ	প্রত্যয়	নামধাতু	বিভক্তি	নতুন পদ
ঘুম	আ	ঘুমা	য়	ঘুমায়
হুতুমথুম	আ	হুতুমথুমা	য়	হুতুমথুমায়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবলীলায় এই নামধাতু সৃষ্টি করে গেছেন।

সংযোগ মূলক ধাতু:

চলতি কথাবার্তার সংলাপ অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় বেশি। গানে ও সংলাপে গীতিকাব্যের মত উক্তি প্রত্যুক্তিতে সংযোগ মূলক ধাতু ব্যবহার করেছেন তিনি। বিশেষ্য-বিশেষণ বা ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পর মৌলিকধাতু যুক্ত হয়ে সংযোগমূলক ধাতু সৃষ্টি হয়েছে।

(১) "দাদা চুপে-চাপে বেড়িয়ে পড়ো
কীবা আর চিন্তা কর।"[৩০]

(২) "চল চল পেড়ে নিতে দে, খেয়ে নিতে দে,
পিচ্ ফেলে দে, পিচ্ ফেলে দে।"[৩১]

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে 'বেরিয়ে পড়ো', 'চিন্তা কর', 'নিতে দে', 'ফেলে দে' ইত্যাদি সংযোগমূলক ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ক্রিয়ার অভিনবত্ব:

অবনীন্দ্রনাথ এসরাজ বাজাতেন। তাই তিনি জানতেন কোথায় ঘা দিলে কোন সুরটি উঠে আসবে। কেননা 'অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে'। যাত্রাপালার গানে ও সংলাপের ভাষাসৃষ্টিতে ক্রিয়াপদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১। মনুষ্যেতর প্রাণীর মুখের ভাষাতে ও ধ্বনি-সৃষ্টি করে ক্রিয়ার রূপদানের দৃষ্টান্ত,

"...ছাগল পূর্ব্বৎ খাড়া হইল, --- এবং আহারান্তে বলিল অড়্-ড়্-ড়্-ড়্? অর্থাৎ আর আছে?"[৩২]

.২। 'গা', 'গে', 'গো' ইত্যাদি ধ্বনিকে ক্রিয়ার রূপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। উদাহরণ,

ক। "রামা। মা, এই নাও দুটো দোনা, আমি কলাপাত্ কাটিগা।"[৩৩]

খ।"মানিনী, তাড়াই গে, ছাগল।"[৩৪]

ক্রিয়াপদের রূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে এই ধরণের ধ্বনির ব্যবহার নতুনত্বের দাবি রাখে।

৩। ভাষার প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য 'বে' বিভক্তির বদলে 'বা'এর ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ,

ক। করিবা বহারম্ভে লঘু ক্রিয়া যা চলিয়া।"[৩৫]

. খ। "মোরে কী লাগি মেরে ফেলিবা?"[৩৬]

'বা' বিভক্তি যোগে ক্রিয়ার ব্যবহার বাংলাদেশে যশোর-খুলনা জেলায় প্রচলিত। অবনীন্দ্রনাথের মা-খুড়িরা কয়েকজন যশোরের মেয়ে ছিলেন। সেই সূত্রে এই ধরনের ক্রিয়াপদ গঠন অবনীন্দ্রনাথের কাছে স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

৪। নতুন ক্রিয়াপদ সৃষ্টিতে অবনীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত,

(ক) "ঘরে হুক্কা পিইতেছিলাম আমি একা মর্দ।"[৩৭]

(খ) "এই মরেছে, সাহেব এসতেছে।"[৩৮]

(গ) "রাত পুইয়ে এল, এক ছিলিম সেজে আন আমার জন্য।"[৩৯]

ক্রিয়াপদ	গঠন	অর্থ	গঠন ব্যাখ্যা
(১) পিইতেছিলাম	√পি + ইতেছিলাম	পান করতে ছিলাম।	সংস্কৃত √পা = পান করা, 'পা' এর রূপ পাল্টে 'পি' করে এর সাথে ইতেছিলাম ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে 'পিইতেছিলাম'।
(২) এসতেছে	√এস + ইতেছে বা √এস্ + তেছে	আসিতেছে বা আসছে।	√আস্+ ইতেছে = আসিতেছে। √আস্ এর 'আ' এর বদলে 'এ' এবং 'ইতেছে'র 'ই' ধ্বনি বাদ দিয়ে 'এসতেছে' ক্রিয়াপদটি গঠিত।

(৩) পুইয়ে এল	√পু + ইয়ে	ফুরিয়ে এল, বা শেষ হয়ে এল।	‘ফুরা’ হল ক্রিয়া এবং সংস্কৃত √পুরি (ধাতু) থেকে সৃষ্ট। ‘পুরি’ ধাতুর ‘রি’ অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ পু এর সংগে ইয়ে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে ‘পুইয়ে’ হল।

উপরি উক্ত উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ ধাতুকে ও কেটে ছেটে নতুনত্ব দান করেছেন। ভাষাবিদ্ না হয়েও ভাষার এই কারুকার্য করা অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় বাক্য ও বাক্যতত্ত্ব:

ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে যে বড় একক পাওয়া যায় তার নাম বাক্য। আর বাক্য যে উপাদান দিয়ে গঠিত তা শব্দ। বিভিন্ন ভাষাতে বাক্যের এই যে উপাদান বা শব্দগুলির মিলনের নিজস্ব নিয়ম আছে। মিলন-নিয়মের দুটি দিক।

(১) শব্দ সাজাবার বা বিন্যাসের নিয়ম।
(২) শব্দগুলির রূপ বিবর্তনের নিয়ম।

বাংলা সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় রূপ বৈচিত্র আছে। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় কারকের পৃথক পৃথক বিভক্তি চিহ্ন আছে। এই বিভক্তি চিহ্ন থেকেই বোঝা যায় কোনটি কর্তা, কর্ম ইত্যাদি।

বিভক্তি চিহ্ন পরিবর্তন না করে শুধু শব্দগুলিকে স্থান বদল করলে বাংলায় অর্থ পরিবর্তন হয়।

যেমন— (ক) বনে বাঘ হরিণ মারে।
(খ) বনে হরিণ বাঘ মারে।

বাক্য দুটিতে আলাদা মানে বোঝাচ্ছে শুধুমাত্র শব্দের বিন্যাসক্রমের জন্য।

আর বাংলা বাক্যের বিন্যাসক্রম হল— কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া।

ইংরেজি, গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষার শব্দে প্রয়োগে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে এই ভাষাগুলির পদবিন্যাস ক্রম তাঁর অজানা ছিল না। ঠাকুর পরিবারে বিভিন্ন ভাষা-ভাষির লোক সমাগম ঘটত এবং তাঁরই ফলশ্রুতি এটি। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের মধ্যে বাংলাভাষায় পদ বিন্যাসক্রম রীতি (Colligation) ভেঙেছেনও। কিছু দৃষ্টান্ত,

(খ) (১) “চলতে চলতে খেতে আছি।”[৪০]
(২) “আছে মাঠের মাঝে শ্যাওড়া গাছের ঝোপ।”[৪১]

উপরের এই বাক্যদুটিতে ক্রিয়াপদ আগে ব্যবহার করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। কাজেই বাংলা পদক্রম মেনে চলেননি। অবনীন্দ্রনাথ কেবল শব্দ সামীপ্যের বেলাতে নয়, বাক্যের গঠনেও সংযোজন-বিয়োজন করে যেমন খুশি সাজিয়েছেন। ফলস্বরূপ,

(১) গদ্যের আঙ্গিকের পরিবর্তনে ভাষা নান্দনিক হয়েছে।
(২) অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের নিজস্ব স্টাইল পরিস্ফূট হয়েছে।

বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলির ব্যবহার হয়, সেই শব্দগুলিও পরস্পরের সাহচর্য চায়। যদি তা পায় তবে বাক্যের সৌন্দর্য বাড়ে। এটিও শব্দসাজুয্য বা Colligation। 'উড়নচণ্ডীর পালা' থেকে এমন কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

> 'স্বহস্তে', 'গাছপাথর', 'বুদ্ধির গোড়ায়', 'গুরুজনের', 'গজকচ্ছপ', 'কূর্ম অবতার', ইত্যাদি।[৪২]
> 'আগুনঘেরা', 'পুষ্পকরথ', 'ডাকপিওন', 'পতিতপাবন', 'দ্বারপাল' ইত্যাদি।[৪৩]

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় শব্দার্থতত্ত্ব:

শব্দের অর্থ ও ভাষার অন্তরের অর্থ পরিবর্তনের মধ্যে জাতির সামাজিক ইতিহাস পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালা থেকে শব্দার্থ পরিবর্তনের কয়েকটি ধারা তুলে ধরছি।

(১) "কাল <u>পরশু</u> বিবেচনা
করার সময় নেই রে হায়।"[৪৪]
(২) "<u>পঙ্কজ</u> নাই পাঁক নাই রোদ খরতর
কাদামাটি শুকাইয়া হয়েছে প্রস্তর।"[৪৫]
(৩) "চলি হুপ্পা হুয়া লাঠি বাগিয়ে—<u>বনগাঁ</u> পেরিয়ে—।"[৪৬]

ক্রমিক সংখ্যা	মূল শব্দ	প্রাচীন অর্থ	প্রবর্তিত অর্থ (বর্তমান)	শব্দার্থ তত্ত্বের ধারার নাম
১।	পরশ্ব	আগামীকালের পরের দিন।	পরশু, আগামী কালের পরের দিন ও গত কালের আগের দিন।	অর্থবিস্তার
২।	পঙ্কজ	পাঁকে জন্মায় যা, যে কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণী।	পদ্মফুল	শব্দার্থের উন্নতি
৩।	বনগাঁ	বনের ভিতর অবস্থিত যে কোন গ্রাম।	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বিশেষ একটি গ্রাম।	অর্থসংকোচন।

এইরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায়। তিনি সচেতন ভাবেই শব্দার্থতত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় সাধু ও চলিত ভাষা:

শিশুমন জাগরণের উদ্দেশ্যে নিজ অভিপ্রায়কে প্রতিষ্ঠা করতে গদ্যভাষা, পদ্যভাষা এবং গদ্য ও পদ্যের মিশ্রভাষা ব্যবহার করেছেন। 'ভূতপত্রীর পালা' থেকে চলিত রীতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

> "আঁ এই সন্ধিকালে করতে হোল না পানাজি দাপাদাপি—খুঁজতে হলো, দাও আমারে লণ্ঠন লাঠি—এত বড় বাড়ি কোথায় অন্ধকারে ঘুরে পোলো নাকি—হারিয়েই গেল বা কি?"[৪৭]

সাধুভাষা রীতির উদাহরণ,

> "রাম। আমাদের এ আশ্রমে বহুল সংখ্যায় নানাবিধ জীবজন্তু খেলিয়া বেড়ায়।
> ভল্লুক বানর মৃগ সৃমর চমর
> কিন্নর প্রভৃতি কত ভ্রমে নিরন্তর।"[৪৮]

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালাতে সাধু ও চলিত এবং মিশ্র গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা নির্মাণে দোভাষী পুথি:

আঠার ও উনিশ শতকে দোভাষী পুথির ভাষাতে বিভিন্ন প্রেমমূলক উপাখ্যান, নানা ধরনের কিস্যা, জঙ্গনামা, লেখা হতো। আগ্রহী হয়ে তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।

(১) জসীমউদ্দিনকে সংগে করে কলকাতার মেছুয়া বাজার থেকে দো-ভাষী পুথি সংগ্রহ করলেন।

(২) গদ্যের Tensionকে ধরে রাখার তাগিদে ভালোভাবে অধ্যায়ন করলেন এবং প্রয়োগগত চিন্তাভাবনায় জোর দিলেন।

(৩) উল্লেখ্য অবনীন্দ্রনাথ এই দোভাষী পুঁথির ভাষাকে ব্যবহার করে কোন সাহিত্য রচনা করলেন না। তিনি সুকৌশলে গদ্য রচনার মধ্যে এই ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাঁর গদ্যকে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করলেন। একটি দৃষ্টান্ত,

গীত, "জঙ্গলসে ফির তা হুঁ শিকার হ্যায় মেরা কাম
হিরণ হিরণী ঢুঁড়তাহুঁ মীর শিকারী মেরা না।"[৪৯]

ভাষা-সংলাপকে জনপ্রিয় ও অভিনব করে তোলার পরীক্ষায় অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় স্বদেশি ও বিদেশি ভাষার ব্যবহার:

যাত্রাপালার মূল উপাদান সংলাপ ও সংগীত। এই দুই উপাদানই গঠিত হয় ভাষা দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পালার ভাষা সৃষ্টিতে স্বদেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং বিদেশি ভাষার ব্যবহার করেছেন। সংলাপে ও

সঙ্গীতে চরিত্রানুযায়ী হিন্দু, ওড়িয়া, ইংরেজি, সংস্কৃত এমনকি গ্রীক ভাষার প্রয়োগ করেছেন। মাত্র একটি করে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

হিন্দি: "দেখ্ চুকাতো করতব সারি অব দরখাস্ত শুনো হামারি কিয়ানে তুঝসে দোস্তি হাম্ অব্ হ্যা শিকার খেলনাকাম। কাঠিরাত মজেমেসারি অব শিকার কো হো তৈয়ারী।"[৫০]

ওড়িয়া: "বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাস এঁ,
নিশি আন্ধিয়ারি ঘন বারি বরিষ এঁ,
....
অবুবাবু নিভায় যাত্রাং কুড়ু!"[৫১]

ইংরেজি: "অধিকারী। গুড মর্ণিং স্যার, আলো আসবে স্যার, এক্সকিউজ ইয়োর অনার স্যার, মশালচি চোট্টা স্যার, অল তেল পকেট। বাড়িওয়ালা স্যাঙ্কশন নো অয়েল, ভেরি স্ট্রিকট।"[৫২]

গ্রীক ভাষা: "প্লেটো। Roman veni-Sum Plato
....
প্লেটো। I dibus Martiis accidit-মার্চ,পন্দরা তারিখ।"[৫৩]

সংস্কৃত: "চৌরে সমং দর্শনমাদ্য শব্দে
নির্ধিদ্বিতীয়ে অথ ভয়ং তৃতীয়ে
--- পঞ্চমে হংসরবে নারাণাং।"[৫৪]

অবনীন্দ্রনাথের পালায় হিন্দি, ওড়িয়া, ইংরেজি গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার চোখে পড়ে। কোথাও কোথাও মিশ্র ভাষাও ব্যবহার করেছেন। আসলে তিনি ভাষার গতি, ছন্দময়তা ও হাস্যরস তৈরীতে যে কোন ভাষা অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। এটি তাঁর ভাষাজ্ঞানের রসবোধের পরিচয় বহন করে।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার ভাষায় গীতিময়তা:

ভাষা চির গতিশীল। শিল্প ভাষার মধ্যে সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের ভাষার মধ্যে যদি গীতিধর্মী বা সংগীতময়তা সৃষ্টি করা যায় তবেই শ্রোতা ও পাঠককে বশীভূত করা যায়। যাত্রাপালার সংলাপেও গীতিধর্মীতার প্রবেশ ঘটিয়েছেন। একটি উদাহরণ,

"কানু। দীঘির ওপরে আছে বড়ো বড়ো গাছ, জেলের ছেলেরা চলো, ধরি সেখা কুচো মাছ।"

সংলাপের মধ্যে গীতিময়তার আবহ এবং সুর-তাল-লয় দৃশ্যমান।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় চিত্রকল্পের ব্যবহার:

ইংরেজি ইমেজ (Image) শব্দের প্রতিশব্দ চিত্রকল্প। বাকপ্রয়োগরীতি থেকে জন্ম নেয় চিত্রকল্পের। বাকসমষ্টিই খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপ সৃষ্টি করে। এর মূল উপাদানগুলি রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ। যাত্রার সংলাপ ও গানে বিচিত্র ধরনের চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছিলেন। উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকার সমৃদ্ধ চিত্রকল্পের কিছু নমুনা দেওয়া হলো।

১। "ও দেখেন দেখেন দাঁড়ায়ে আছেন কৃষ্ণচূড়ার গাছ
নাচেন গোড়াতে প্যাখম তুলে ময়ুরপংখী রাজ।"[৫৫]

২। ষড়্রিপুকে অভাবনীয় চিত্রকল্পে অবনীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। সোজা-সাপটা ভাষায়, গ্রাম্য পরিবেশের পটভূমিকায়, অমলিন হাস্যরসে পরিপূর্ণ অথচ ভাবকল্পে অতুলনীয় এই চিত্রকল্পটি।

"আমি করব এ রাখালি কত কাল
পালের ছয়টা গরু করেছে আমায় হাল বেহাল
আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই।
তারা ঘুরে ফিরে বাঁকা পথে চলছে সদাই।"[৫৬]

৩। দেবরাজের আদেশে জাবালি, ঘৃতাচী, বসন্তসহ অনুচরেরা কিরাত দেশে যাত্রা করে। পথ দুর্গম ঘোর বর্ষা। কর্দমাক্ত, উঁচু-নীচু, ঝোপ-জঙ্গলের পথে তাদের যাত্রা। বিপদ-সঙ্কুল, ভয়াল-ভয়ঙ্কর পথ। অথচ অবনীন্দ্রনাথ এক অভিনব ভঙ্গিতে হাস্যরসের চিত্রকল্প সৃষ্টি করলেন।

"শরতের চাঁদ জোছনা পুরা
শোভিতেছে যেন চালকুমড়া
চষা ক্ষেতে যেন খাসা ফুটি
মাখানো দোরো চিনির গুঁড়া।"[৫৭]

দুঃখের মধ্যে রোমান্টিক নৈসর্গিক চিত্রকল্প অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাহিত্যশৈলী।

ছড়া-প্রবাদে শব্দ ব্যবহারে অবনীন্দ্রনাথের অভিনবত্ব:

অবনীন্দ্রনাথ কথকতাধর্মী এই যাত্রাপালাগুলিতে অভিজ্ঞতার চরম প্রতিফলন পড়েছে। সংস্কৃত সূক্তিমালিকার 'কীর্তিযস্য স জীবতি' অর্থাৎ যার কীর্তি আছে সে বেঁচে থাকে। অবনীন্দ্রনাথ অভিনব কায়দায় ব্যবহার করলেন, "যঃ পলায়তি স জীবতি/দুদ্দাড় দৌড় দাও।"[৫৮]

এখানে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়,

১। শব্দের পরিবর্তে নতুন শব্দ যোগ করেও মূল সুরটি বজায় রাখছেন।

২। শব্দ-ধ্বনির সাথে সামঞ্জস্য ঘটনা, কাহিনি ও চরিত্রের সংগে ব্যবহার করছেন।

৩। যাত্রাপালার রস সৃষ্টি ও পরিবেশগত আঙ্গিক সুনিপুণভাবে বজায় থাকছে।

প্রবাদ প্রবচনের বেলাতেও অবনীন্দ্রনাথ নতুন ধারা সৃষ্টি করলেন। 'উড়চন্ডী পালা'-তে কাউয়ার গীত,

"চাচা আপাতত জানটা তো বাঁচা।"[৫৯]

বিশেষ করে গীতে বহুল প্রচলিত ছড়াকে ব্যবহার করেছেন। এই বেলাতেও উপরিউক্ত পদ্ধতি অর্থাৎ শব্দ বা পদের সংযোজন-বিয়োজন রীতির বজায় রেখেছেন। এর দৃষ্টান্ত,

"আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছের নাজিম বৌ,
কথা কস্ না আজ যে কেউ!"[৬০]

বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতির সংগে অবনীন্দ্রনাথের আত্মিক যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বংশীখণ্ডের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,

"বনপোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মোন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।"৬১

'বেণুকুঞ্জের পালা'য় কলানিধির উক্তিতে একই মর্মবেদনা পরিস্ফূট হয়েছে।

গীত
ওরে বন পোড়া যায় সবাই দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে না রে।
আমার মনের দুঃখ মনই জানে,
আর জানে আমার পোড়া অন্তর এ।।"[৬২]

জীবন সায়াহ্নে অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাপালা রচনায় হাত লাগিয়েছিলেন। শিল্পী জীবনের রং-তুলির আঁচড়, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়ার বেদনা সব কিছুই উজাড় করে দিয়েছেন এই সব যাত্রাপালায়। চিত্রশিল্পের পাশাপাশি সাহিত্য রচনা করেছিলেন সারা জীবন ধরে। যাত্রাপালার রচনাতে এসে তাঁর কাহিনি, ভাষা-সংলাপ ও গান যেন অভিনবত্ব পেল। জীবনের দুঃখ-কষ্ট-বেদনাকে আড়াল করে রাখলেন মেঘে ঢাকা তারার মতো। তাই তার যাত্রাপালায় কোথাও দুঃখ নেই, স্থূল আনন্দ নেই, আছে স্মিত, সূচী সুন্দর পবিত্র এক অনাবিল আনন্দ দান করতে চাইলেন। উত্তরসূরীদের পথে না হেঁটে নিজস্ব ভাষা শিল্প, ঢং, মেজাজ তৈরী করে পাঠকদের অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট করলেন। তাঁর সৃষ্ট এই ভাষার গভীরতা, দক্ষতা আজও অমলিন। মৃত্যুর সার্ধ শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও তিনি

তেমনভাবে আলোচিত নন। রবির তীব্র আলোকে দিনের মতো উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। চোখেও যেন পড়ে না। প্রায় একই পথের পথিক অবন-রবির সাহিত্য সাধনা একটি নদীর দু-তীর দিয়ে প্রবাহিত জলধারার মতো একই সাগর সংগমে মিলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। অবনীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-৬, প্রকাশভবন, কলকাতা-৭৩, জুন-২০১২, পৃ. ১০

২। তদেব—পৃ. ১৩

৩। তদেব—পৃ. ১৩

৪। তদেব—পৃ. ২৯

৫। তদেব—পৃ. ২১২

৬। তদেব—পৃ. ১০৩

৭। তদেব—পৃ. ১৬১

৮। তদেব—পৃ. ১৬০

৯। তদেব—পৃ. ১৬৫

১০। তদেব—পৃ. ৮৩

১১। তদেব—পৃ. ৪৬

১২। তদেব—পৃ. ৪৪

১৩। তদেব—পৃ. ২৬৪,২৬৫

১৪। তদেব—পৃ. ৮৮

১৫। তদেব—পৃ. ১২৫

১৬। তদেব—পৃ. ১১৭

১৭। তদেব—পৃ. ১৪৩

১৮। তদেব—পৃ. ১২৫

১৯। তদেব—পৃ. ১২৬

২০। তদেব—পৃ. ১২৫

২১। তদেব—পৃ. ৯৯

২২। তদেব—পৃ. ৯৫

২৩। তদেব—পৃ. ১৪৪

২৪। তদেব—পৃ. ১৫১

২৫। তদেব—পৃ. ১৮২

২৬। তদেব—পৃ. ১৮২

২৭। তদেব—পৃ. ১১

২৮। তদেব—পৃ. ১০০

২৯। তদেব—পৃ. ২২

৩০। তদেব—পৃ. ৮১

৩১। তদেব—পৃ. ৯৭

৩২। তদেব—পৃ. ১২৮

৩৩। তদেব—পৃ. ১৬৫

৩৪। তদেব—পৃ. ১৩৯

৩৫। তদেব—পৃ. ২৩৫

৩৬। তদেব—পৃ. ২৩৪

৩৭। তদেব—পৃ. ১৩০

৩৮। তদেব—পৃ. ১০০

৩৯। তদেব—পৃ. ১৩৯

৪০। তদেব—পৃ. ৯৮

৪১। তদেব—পৃ. ৯৮

৪২। তদেব—পৃ. ৩১

৪৩। তদেব—পৃ. ৩২

৪৪। তদেব—পৃ. ৯

৪৫। তদেব—পৃ. ১০

৪৬। তদেব—পৃ. ৮২

৪৭। তদেব—পৃ. ৮৫

৪৮। তদেব—পৃ. ৩৯৮

৪৯। তদেব—পৃ. ১১৯

৫০। তদেব—পৃ. ৮৪

৫১। তদেব—পৃ. ৮৪

৫২। তদেব—পৃ. ২০৬

৫৩। তদেব—পৃ. ১৮৫

৫৪। তদেব—পৃ. ১৭৪

৫৫। তদেব—পৃ. ৪০

৫৬। তদেব—পৃ. ২১৫

৫৭। তদেব—পৃ. ২৫৩

৫৮। তদেব—পৃ. ১০

৫৯। তদেব—পৃ. ৯

৬০। তদেব—পৃ. ৪২

৬১। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৬, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৩৫৭

৬২। অবনীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, জুন-২০১২, পৃ. ১২২।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL
Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যে ভাষার অভিমুখ

প্রিয়াঙ্কা মৈত্র

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 04/09/2024
Accepted 12/03/2025

সূচক শব্দ:
বাংলা ভাষা,
ক্রীড়া,
সাহিত্য,
সমাজ,
সময় প্রয়োগ রীতি,
মধ্যযুগ,
আধুনিক যুগ।

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

ভাষা সৃষ্টি। ভাষা নির্দিষ্ট সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রকাশও বটে। মানুষের বেঁচে থাকা ভাষাকে কেন্দ্র করেই। আর সেই ভাষা যদি হয় বাঙালির অত্যন্ত আদরের বাংলা ভাষা সে ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্য এক অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। বাস্তব চোখে দেখা বৃহত্তর যাপন প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। আর এই সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভাষায়।

সময় বদলায়, সাহিত্য বদলায়, বদলায় প্রয়োগরীতি। সাহিত্যের নির্দিষ্ট ধারাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় ভাষার রূপ। লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন হবে লোকজ জীবন কেন্দ্রিক, ঠিক তেমনভাবেই কথাসাহিত্যের ভাষা হবে কথাসাহিত্যে চিত্রিত নির্দিষ্ট সমাজভুক্ত মানুষের জীবনকেন্দ্রিক। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাসে ভাষার প্রয়োগ রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষার ধরন থেকে পৃথক হবে। কারণ চেতনাপ্রবাহ রীতি তুলে ধরে চেতনার অন্তঃস্থলকে। ফলে তার ভাষাও হয় চেতনাকেন্দ্রিক। অনুরূপভাবেই উপন্যাস বা ছোটগল্পের ভাষা থেকে কবিতা বা জীবনী, আত্মজীবনীর ভাষা হবে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ ভাষা সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের প্রকাশক।

বাংলা সাহিত্যের নির্দিষ্ট একটি শাখা ক্রীড়া-সাহিত্য, যা দীর্ঘদিন ছিলো প্রায় অনালোচিত। ক্রীড়ার ন্যায় একটি গতিশীল কর্মকাণ্ড যখন সাহিত্যে উঠে আসছে তখন মনে রাখতে হবে তার ভাষা বহন করবে সেই ক্রীড়াকে। অর্থাৎ যখন ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হবে তখন ভাষা বর্ণনাই পাঠককে সেই ক্রিকেট তথা মাঠকে প্রত্যক্ষ করাবে। আমরা তাই আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ রূপ অর্থাৎ উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, আত্মজীবনীতে ক্রীড়া কেন্দ্রিক ভাষার নির্মাণকে যেমন আলোচনা করবো, তেমনি সেই ভাষার শব্দ প্রয়োগ, বাক্য গঠন পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিককে বিশ্লেষণও করবো। এর পাশাপাশি প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে বর্তমান শতাব্দীতে ক্রীড়া সাহিত্যের ভাষাবিন্যাসে যে পরিবর্তন ঘটছে সেই দিকটি নিয়েও আলোকপাত করবো।

Corresponding author's email ID: priyankamaitra103@gmail.com

মানুষ যখন সামাজিক তখন সে প্রকাশ উন্মুখ। মানুষের ভেতরে প্রবাহমান অনুভূতি, উপলব্ধি, চিন্তা, ধারণা ব্যক্ত হলেই আদান-প্রদান সম্ভব। ভাব বিনিময়ের মাধ্যমেই মানুষ বেঁচে থাকে। আর এক্ষেত্রেই চলে আসে ভাষার প্রসঙ্গ। ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমাজের সংযোগ গড়ে তোলে। যে কোনো সৃষ্টি প্রকাশলাভ করে ভাষার হাত ধরে। সাহিত্য লেখকের সৃষ্টি। লেখক তার অভিপ্রেত বিষয় বা ধারণাকে মূর্ত করে তোলে তার রচিত ভাষার মধ্যে দিয়ে। প্রতিটি রচনাই সময়ের ফসল। সেই সময়, সমাজ, চরিত্রের স্তর, লেখকের জীবনভাবনা, রচনারীতি প্রায় অনেককিছুই প্রতিফলিত হয় ভাষায়। বলা ভালো দেশ, কাল ও সময়ের প্রেক্ষিতেই নির্মিত হয় লেখকের ভাষা। আর তাই যে কোন সৃষ্টিকর্মের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির জন্য ভাষা বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

যেদিন থেকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে, তার চিন্তা চেতনাকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছে, নিজেকে সকলের মধ্যে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে সেদিন থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। বহু প্রাচীন কাল থেকে আজকের আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে বহুভাবে। প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা ও যুগের চাহিদা সাহিত্যে এনে দিয়েছে বিভিন্ন ধারার সমাহার। সাহিত্যের এই প্রতিটি শাখাকে আমরা গঠন, বিন্যাস, ভাষার মাধ্যমে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারি। সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই তার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

মানুষের জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো চাহিদার পাশাপাশি আরও কিছু চাহিদা পরিলক্ষিত হয় যার মধ্যে অন্যতম খেলার চাহিদা। একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই খেলার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে বা আনন্দ লাভ করে থাকে। শুধু শিশুই নয়, ছোট থেকে বড় সব স্তরের মানুষই বিভিন্নভাবে খেলার দ্বারা আনন্দ লাভ করে থাকে। সময় ও সমাজের দাবি অনুসারেই বিভিন্ন খেলা ও তার নিয়ম নীতির উদ্ভব। অন্যদিকে পরিবেশে উপলব্ধ উপাদান থেকেই মূলত খেলাগুলির উৎপত্তি হয়। যেমন প্রাচীন নদীমাতৃক বাংলার জলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সাঁতার খেলাটি। বিভিন্ন লৌকিক ক্রীড়ার উপাদানও পরিবেশ থেকেই উঠে আসে। এগুলি সব জীবনের অঙ্গ বলেই ক্রীড়া বা খেলাও সাহিত্যে উঠে আসতে শুরু করে। প্রাচীনকালে জীবিকা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত অস্ত্র তীর ধনুক থেকে চলে এসেছে তির নিয়ে খেলা। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রাচীন ও মধ্যযুগে ক্রীড়া শুধুমাত্র সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে উপাদান রূপে। উনিশ শতকের বিভিন্ন লেখায় টেনিস খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ শতকের শেষের দিকে ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে রচিত হতে শুরু করে মূলধারার সাহিত্য যার সার্থকতম স্রষ্টা বলা যায় মতি নন্দীকে। ইংরেজদের আগমনের পর থেকে ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো খেলা গ্রাম বাংলার দেশীয় খেলা গুলির স্থান দখল করে নিয়েছে। পরিবর্তিত প্রবণতা সাহিত্যে এনেছে পরিবর্তন।

বহুদিন ধরেই বাংলা সাহিত্য আলোচনায় ক্রীড়া সাহিত্য থেকে গেছে প্রায় অনালোচিত। অথচ বিশেষ এই শাখাটি সম্পর্কেও মানুষের অবগত হওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্রীড়া যখন বাঙালি জাতীয়তাবোধের একটি অংশ। তাই সময় এসেছে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার। আর পরিপূর্ণভাবে ক্রীড়া সাহিত্যকে জানা ও বোঝার জন্য ক্রীড়া সাহিত্যগুলির ভাষার অভিমুখ ও বিবর্তনের রূপরেখাটি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা ও ভাষা বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন।

লেখক মূলত একক ব্যক্তিত্ব। ফলস্বরূপ কখনো কখনো চরিত্র বা রচনার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় তার ভূমিকা। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে লেখকের রচনার উদ্দেশ্য, লেখকের উদ্দীষ্ট পাঠক, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস। আর লেখকের উদ্দেশ্যকে সংহত রূপ দেওয়ার জন্য লেখকের শব্দ ব্যবহার, অন্তরঙ্গ ভাবভঙ্গি, বাক্য গঠন পদ্ধতি, অপভাষার প্রয়োগ, পরিভাষার প্রয়োগ, প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে বুদ্ধিদীপ্ত ইঙ্গিত প্রয়োগ প্রভৃতি দিকগুলিও বিচার বিশ্লেষণের অধীন হয়ে পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন ক্রীড়া যেহেতু এক বিরাট কর্মকান্ড, ফলে কাহিনির মাঝখানে সেই কর্মকান্ডকেও স্থাপন করতে হয়। লেখকের ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমরা চরিত্রের খেলাকে আমাদের মানসচোখে দেখতে পাই। অতএব শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে খেলার সেই দ্রুততা থাকা প্রয়োজন হয়। মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাসের কিছু অংশ এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যায়—

> "একটা আট সিলিন্ডার এঞ্জিনে হঠাৎ যেন স্পার্ক প্লাগ থেকে বিস্ফোরণের বার্তা পৌঁছেছে। প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল কোনি। চমকে হাতটা টেনে নিল হিয়া।
> "ক্ষিদ্দা!"
> হিয়া ঠেলে দিয়ে বলল, "কোনি ওঠো, কুইক্।"
> ব্লকে উঠতে উঠতে কোনি বলল, "ক্ষিদ্দা এসেছে।"
> রমা যোশি জলে পড়ল। তিন সেকেন্ড পর কোনি।
> পুলে যদি জলের বদলে মাটি থাকত তাহলে বলা যেত একটা কালো প্যান্থার শিকার তাড়া করেছে। কোনির শিকার টাইম-কীপারদের হাতের ঘড়ি।" (কিশোর সাহিত্য সমগ্র, ২০১৩)

ব্ল্যাক প্যান্থারের সঙ্গে তুলনা এখানে কোনির গতিকে যেমন পরিষ্কার করে দেয়, তেমনি কোনির পরিশ্রম, কোনির হাতের ওঠানামা, কোনির সাঁতারের ভঙ্গি কোনির খেলাকে আমাদের চোখের সামনে দেখিয়ে দেয়।

ক্রীড়া সাহিত্যের চরিত্রেরা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষ। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ। ফলে তাদের মধ্যে যেমন শ্রেণিগত, বর্গীয় বৈষম্য রয়েছে, তেমনি বৃত্তগত বিভাজনও বর্তমান। বস্তির নোংরা খিস্তির গলি থেকে শুরু করে আইটিতে কর্মরত সুসজ্জিত অন্দরমহল পর্যন্ত ক্রীড়া সাহিত্যের পথ। অর্থাৎ আরবান বাঙালির চেনা বৃত্তের বাইরের বৃহত্তর বৃত্তকেও লেখকেরা ফ্রেমবন্দি করতে চেষ্টা করেন এই ক্রীড়া সাহিত্যে। স্বভাবতই চরিত্রের ব্যবহৃত ভাষাতেও শ্রেণিগত পার্থক্য ধরা পড়ে। তাই আমরা গৌতম ভট্টাচার্যের 'বারপুজো' উপন্যাসের অর্চিতকে যে ভাষায় কথা বলতে দেখি সায়ন্তনী পুততুন্ডের 'যমপুরাণ' উপন্যাসের বিশ্বজিৎকে সে ভাষায় কথা বলতে দেখি না। আবার সামাজিক স্তরভেদে দুই নারীর মুখের ভাষাও আলাদা। সামাজিক অবস্থানে ইতর বিশেষেও ভাষায় খানিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার শিশুর ভাষাতেও কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। এই ধরনের পার্থক্যের কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে।

শ্রেণি পার্থক্য—

১) "হঠাৎ দেখল অভিষেকের ফোন আসছে। "স্যর, এভাবে চলতে পারে না। আমি অ্যাটাকিং লাইনের সামনেটা পুরো দায়িত্ব নিচ্ছি। পরশু আপনি যা বলবেন তাই করব। ম্যাচ হেরে মাঠ থেকে বেরোব না আপনি দেখে নেবেন।" (বারপুজো, ২০২০)

অন্যদিকে বস্তির মেয়ে মীরার ভাষা—

২) "...মীরা কোমরে হাত দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, "এরম ভাবিস্ না যে আমি দৌড়ুতে পারি না কো। একনই দসটা পাক মেরে আসচি। পয়সাটা রেডি রাখ। আমার উধার আর ইনছলমেন্ট ভাল্লাগে না!" (যমপুরাণ, ২০২১)

বা

"রঞ্জন দেখল বিশ্বজিৎ খুব নির্লিপ্ত মুখে পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে তার নাকের সামনে ধরল। মীরা বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছে, "আ-ই- ব্বা-স! বড় পাত্তি! দৌড়ুলে পয়সা ওড়ে নিকি? আমি তো জানতুম চিকনি আইটেমরা ঠুমকা মারলে নোট ওড়ে। কিন্তুক দৌড়ুলেও ওড়ে জানতুম নে…।" (যমপুরাণ, ২০২১)

সামাজিক স্তরভেদে নারীর মুখের ভাষা—

১) উর্মি উদ্ধতভঙ্গিতে বলে, "কিন্তু ও জানে কি? ওর চোখে তুমি একটা জোয়ান পুরুষ! নিজেকে কখনও আয়নায় দেখেছ! তুমি জানো, আগে যখন ভোর ভোর ছাদে গিয়ে এক্সারসাইজ করতে তখন পেছনের বাড়ির মিন্টি ছাদে উঠে এসে হাঁ করে দেখত? তোমার চোখে তো কিছুই পড়ে না। তাই আমাকেই বাধ্য হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে তোমায় বারণ করতে হয়! মিন্টির মতো ভদ্রঘরের মেয়ের যদি মতিভ্রম হতে পারে তবে এ মেয়ে কোথাকার চরিত্রবতী গান্ধারী!" (যমপুরাণ, ২০২১)

২) সপাং করে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ উত্তরের চাবুক এসে পড়ল। গোল্ডি বিরক্ত হয়ে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বের করে দেয়। মালিনী ফের একগাল হেসে নোট দুটো ব্লাউজের ভেতরে চালান করে দেয়। গোল্ডি সেটা দেখে একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, "মেয়েটাকে কবে পাব?"

এ তো সবে মু দিখাই! টেরেলার। পুরো ফিলিম দেখতে হলে আরও দানা ছড়া। গোটা কয়েক সোনার গয়না গড়াই।" (যমপুরাণ, ২০২১)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন লেখিকা উর্মি ও মীরা দুজনের ভঙ্গিকে বোঝাতে শুধুমাত্র 'উদ্ধতভঙ্গি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মীরার ক্ষেত্রে উদ্ধত ভঙ্গির সঙ্গে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো বিষয়টিকে যখন যোগ করেন, তখন দাঁড়ানোর ভঙ্গিই সামাজিক স্তরের পার্থক্য ঘটিয়ে দেয়। আবার বস্তির জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে বেশ কিছু অশ্লীল শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগও দেখা যায় 'যমপুরাণ' উপন্যাসে—

১) 'সবাই পিঠপিছে তোরে 'রান্ডি' বলে।' (যমপুরাণ, ২০২১)
২) 'একদম ডবকা সেক্সি লেডি হবে' (যমপুরাণ, ২০২১)
৩) তা'লে চিঁড়ে আঁটি বাঁধ! ফো-ট্!' (যমপুরাণ, ২০২১)

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অর্থাৎ ক্রিকেট ফুটবলের মতো খেলার সঙ্গে জড়িত থাকে বিজ্ঞাপন। এক্ষেত্রে খেলা বা খেলোয়াড় সেই বিজ্ঞাপনের অংশ হন। বিজ্ঞাপনের ভাষা অধিক বর্ণনাধর্মী হয় না। সংক্ষেপে অথচ নাটকীয় ভঙ্গিতে বিক্রিত পণ্যটির গুনাগুন তুলে ধরা হয় বিজ্ঞাপনে। সঙ্গে বিশেষ ক্রীড়াটিও একটি বা দুটি শব্দের প্রয়োগে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গৌতম ভট্টাচার্যের 'বারপুজো' উপন্যাসে এরকম একটি বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেনের উল্লেখ পাওয়া যায়–

> "শোভাবাজারের গোলে নেট ছেঁড়ে/
> জুম্পার ব্যাগ ছেঁড়ে না।" (বারপুজো, ২০২০)

এখানে বোঝাই যায় খেলাটি ফুটবল এবং এই ক্রীড়ার মাধ্যমে নেটের থেকেও মজবুত জুম্পার ব্যাগের বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা হয়েছে।

খেলার সঙ্গে যুক্ত ধারাভাষ্য, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিষয়। মতি নন্দী, রূপক সাহা থেকে শুরু করে গৌতম ভট্টাচার্যের লেখাতেও আমরা এই সাংবাদিকতা সুলভ ভাষা ব্যবহার এবং কাহিনি বর্ণনায় ধারাভাষ্যপাঠকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। যথা—

সাংবাদিকতা সুলভ ভাষা—

> "ওরা স্টোরি দিচ্ছে 'ট্রফিজয়ী কোচের অভব্যতা।" (বারপুজো, ২০২০)

ধারাভাষ্য পাঠসুলভ ভাষা—

> "জলকণায় তৈরী একটা আচ্ছাদনের ঘেরাটোপের মধ্যে কোনি যেন অশরীরী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। টার্নিংয়ের পরই দেখা গেল সে রমা যোশির পাশে। বিপদ এসে গেছে, এটা বুঝতে পেরেছে জোশি" (কিশোর সাহিত্য সমগ্র, ২০১৩)

ক্রীড়ার খাদ্য অভ্যাস, শরীরচর্চা সমস্তটাই বিজ্ঞান নির্ভর। তাই চরিত্রের ক্রীড়ায় বা জীবনযাপন প্রণালীতে এই বিজ্ঞানের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠা প্রয়োজন। আবার ক্রীড়া যেহেতু টেকনিক ও স্কিল নির্ভর তাই ভাষা ব্যবহারে এগুলির প্রতিফলনও প্রয়োজন। যেমন গৌতম ভট্টাচার্যের উপন্যাসে আমরা এই বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকি। লেখক উপন্যাসে বিজ্ঞানের পরিচিত সেই শব্দগুলিকেই ব্যবহার করেছেন। কোচ যখন তার খেলা বা টিম সাজিয়েছেন সেখানে ভিডিও অ্যানালিস্ট, আইটি এক্সপার্ট, ম্যাসিওর, মোটিভেটর, থ্রোয়িং কোচ, সেট পিস কোচদের মতো ব্যক্তিদেরও রেখেছেন তার টিমে। খাদ্য বিজ্ঞানের ব্যবহারও ভাষা বর্ণনায় দেখা যায়—

> "এখুনি সবার জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড ডায়েট হয়ে গেল। কার্বোহাইড্রেট বেশি। ম্যাচের আগে প্রোটিন যথাসম্ভব কম। বড়জোর মাছ ভাজা, আলু ভাতে অবধি চলতে পারে। ম্যাচের চার ঘন্টা আগে মেন খাওয়া শেষ করে নিতে হবে। তারপর কলা খাওয়া যাবে, ফ্রুট জুস খাওয়া যাবে। বিস্কুট চলতে পারে। চকোলেট খাওয়া যাবে। যেগুলোর মধ্যে হয় গ্লুকোজ আছে। বা রেডিমেড এনার্জি দেয়। আর কিছু নয়।" (বারপুজো, ২০২০)

স্কিল ও টেকনিকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ৩-১-৩-৩, ৩-৫-২, ৪-৪-২, ২-৬-২ প্রভৃতি স্ট্র্যাটেজির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা যায় স্ট্র্যাটেজির বিষয়ে—

> "আমি জানতাম আমাকে দেখে ওরা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে। গোটা হাফটাইম ঠিক করবে আমাকে কীভাবে মার্ক এবং শেষে মেরে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া যায়? ওদের মাথাতেই আসবে না যে আমি একটা ঢোড়া সাপ। বাধ্য হয়ে খেলতে নেমেছি। মানুষ ব্যক্তিগত হিংসাকে প্রাধান্য দিলে বিজ্ঞান ভুলে যায়। আমি জানতাম ওদের ঠিক তাই হবে। ওরা কোরোকোর মার্কারকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়ে বলবে, একে আগে মার। ঠিক তখনই আমার গোখরোটা ফাঁকা জমি পেয়ে যাবে।" (বারপুজো, ২০২০)

ক্রীড়া সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক নিজস্ব সৃষ্টি। ক্রীড়া সাহিত্যের নিজস্ব ভাষাবিন্যাস ক্রীড়া তথা ক্রীড়া সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের দরবারে এক পৃথক স্থান প্রদান করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১) সম্পা নন্দী, ন. (২০১৩)। কিশোর সাহিত্য সমগ্র মতি নন্দী, ২য় খন্ড, কলকাতা: ০৬৭ পাবলিশিং প্লাস

২) ভট্টাচার্য, গ. (২০২০)। বারপুজো, কলকাতা: ০১৫ দীপ প্রকাশন

৩)পূততুন্ড, স. (২০২১)। যমপুরাণ, কলকাতা: ১৫৭ বিভা পাবলিকেশন

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

ভাষার সংমিশ্রকরণ ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব—প্রসঙ্গ *সেকশুভোদয়া*

পার্থসারথি ভট্টাচার্য

সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 06/09/2024
Accepted 06/03/2025

সূচক শব্দ:

সেকশুভোদয়া-র রচনাশৈলী ও হলায়ুধ মিশ্র,
হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি,
গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য,
রূপতত্ত্ব,
ভাষা ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব।

অতিথি সম্পাদক

শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

ভাষা ঠিক কী? এককথায় বলতে গেলে বহুমাত্রিক, বহুজনিক ও বহুস্বরজনিত প্রকাশভঙ্গি। ভাষা ও সমাজ একে অপরের সাথে এমনভাবেই মনস্তাত্ত্বিকরূপে জড়িত যে কোনটা কাকে, কীভাবে, কখন প্রভাবিত করে তা বলা মুশকিল। আমরা এখানে সংস্কৃতবিষয়ক একটি তুলনামুলক কম চর্চিত গ্রন্থ *সেকশুভোদয়া* নিয়ে আলোচনা করব। এই গ্রন্থটির একটি আদিরূপ ছিল *পুঁথিমুবারক* নামে যা মালদহের বাইশহাজারি মজসিদে রক্ষিত ছিল। গ্রন্থটি হলায়ুধ মিশ্রের নামে প্রচলিত, তবে রচিত নয়, যা মূলত সেক জলালুদ্দিনতাব্রিজি নামক এক মুসলিম সেকের উদ্দেশ্যে রচিত। গ্রন্থটিকে আমরা এখানে নির্বাচিত করেছি বিশেষত তার ভাষার জন্যে যা কিনা সংস্কৃত, কিন্তু পড়লে মনে হবে যেন বাংলার ছাঁচে লেখা। প্রশ্ন হল তাহলে কি এটি সরলীকৃত সংস্কৃতকরণ? নাকি প্রচলিত কোনও ব্যবহৃত রূপের বহিঃপ্রকাশ (colloquial usage)? শোনা যায় গ্রন্থটি বছরের এক বিশেষ দিনে কোনও এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত সামাজিক সংস্কার ও তৎজনিত বিশ্বাস থেকে পাঠও করতেন মারণ, রোগ, ব্যধি ইত্যাদি নানান পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। এখানেই সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গটি ধরা দেবে। কোনো ভাষাকে সরলীকৃত করার পেছনে প্রধান কারণ হল লেখক যেটি বলতে চাইছেন সেটি তার target audience এর কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কি না? হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করবে সেই সমস্ত জনের সামাজিক অবস্থানের ওপরে। আমাদের গ্রন্থের সময়কাল আনুমানিক দ্বাদশ শতক, সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক, তুর্কি আক্রমনের ডামাডোল বেজে গেছে, চারিদিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অধঃপতন, উচ্চস্তরীয়দের দ্বারা নিম্নবৃত্তীয় মানুষের নিষ্পেষনের ভয়াল রূপ প্রকটিত হয়েছে। এমতাবস্থায় লেখক ইসলামীয় ভাবাভেগে আকৃষ্ট হয়ে সেকসুফিতাব্রিজির ঐশ্বরিক বাণী প্রচার করতে প্রয়াসী হয়েছে যার target audience মূলত সমাজের নিম্নবৃত্তীয় মানুষজন। যেমন কৃষক, তাঁতি, চামার, গণিকা এমনকি মধ্যবিত্ত সমাজের দিন-আনা, দিন-খাওয়া মানুষেরা। তাদের বোঝানোর জন্যে ভাষার সরলীকরণের দরকার তো অবশ্যই। তাই সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বরিক গরিমা এই গ্রন্থে স্থান পায়নি,

Corresponding author's email ID: parthakatwa.bhattacharya6@gmail.com

বরং ভাষা এখানে হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের জ্বলন্ত এক প্রতিচ্ছবি, প্রবহমান জীবন-নদীর তরঙ্গ।

পটভূমি

সেকশুভোদয়া পুথিটি হলায়ুধ মিশ্রের নামে প্রচলিত যিনি লক্ষ্মণ সেনের সভাসদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পুথিটি তৎকালীন সময়ের মালদহের ডিএম উমেশচন্দ্র বটব্যাল কর্তৃক প্রথম প্রকাশ্যে আসে। তিনি উল্লেখ করেছেন "পুথিটি প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লিখিত, মালদহের বাইশ হাজারি মসজিদে সংরক্ষিত থাকত এবং স্থানীয় লোকাচারজনিত কারণে বছরের একটি বিশেষ দিনে গ্রন্থটি হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্তৃক পাঠ করানো হত যাতে খারাপ বা অশুভো কোনও দৃষ্টি মানুষকে প্রভাবিত না করতে পারে"।[1] পুথিটি সম্পর্কে তিনি অবগত হন বাবু হরিদাস পালিত কর্তৃক, পরে বাবু হরিদাস পালিত ও পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী একত্রে পুথিটির একটি খসরা তৈরি করেন যেখান থেকে উমেশচন্দ্র বটব্যাল এটিকে সকলের সামনে আনার জন্যে প্রস্তুত নেন। কিন্তু বটব্যাল বাবুর মৃত্যুর পরে সেই নথিটি হারিয়ে যায়। ফলত পুররায় বাবু হরিদাস পালিত একটি খসড়া রচনা করেন যেখান থেকে বাবু মণীন্দ্রমোহন বোস সেটিকে প্রকাশ করেন। পরে আচার্য সুনীতি বাবুর নির্দেশে অধ্যাপক সুকুমার সেন ১৯২৭ সালে এটিকে প্রথম প্রকাশ করেন। পরে আরও ভালো ভাবে ১৯৬৭ সালে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।

লেখক ও রচনাকাল: কিছু প্রশ্ন

সামগ্রিকভাবে বলা চলে পুথিটির রচনাকাল লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক অথবা তাঁর পরবর্তীকালীন। তবে কোনভাবেই তাঁর পূর্ববর্তী নয়, তবে যে পুথিটিকে উদ্ধার করা হয় সেটির রচনাকাল খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী।[2] পুথিটিকে অনেকেই জাল নথি (forgery-document) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মূলত সেক জলাউদ্দিন তাব্রিজী নামক এক সুফি পীর সাধকের জীবনে ঘটে যাওয়া নানান লৌকিক ও অলৌকিক দিগ্‌সমূহ

[1] "The Manuscript, which was written on paper and in early Bengali script, was used to be kept at the Bāis Hāzāri mosque at Gour…the manuscript was regarded as sacred, and would occasionally be taken out and read, and this reading was supposed to avert evil during epidemics and other public troubles." *Sekasubhodayā*, 2002, p ix-xi.

[2] Now I doubt it very much. The manuscript probably belonged to the late seventeenth or the early eighteen century." Ibid.

(ইংরাজিতে যাকে বলে Hagiological Literature) তবে তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে মধ্যযুগীয় আপামর মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, অন্তজ শ্রেণি থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গৃহবধূ, বারবনিতা, মুচি, তাঁতি, কৃষক-দের জীবনচিত্র, তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিনিয়ত অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার এবং সেকের সাথে তাঁদের কথোপকথন। এর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের কিছু বিখ্যাত গল্প তথা শ্লোকের পুনরাবৃত্তি। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাই *হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, শুকসপ্ততি, প্রবন্ধচিন্তামণি, বেতালপঞ্চবিংশতি*-র মতো গল্পের উপস্থাপনা, তেমনি আবার মাধবী, গংগানটবধূ, বিদ্যুৎপ্রভার মতো সাধারণ গৃহবধূর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় যা কিনা অতি ধূর্ত লোককেও ঘুরিয়ে আনার সামর্থ রাখে, যা সেকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে বলতে বাধ্য করেছিল "*ধন্যে'য়ং নর্তকী*' (এই রমণী ধন্য)। গল্পের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে লেখক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে হলায়ুধ মিশ্রকে যেমন "*ইতি হলায়ুধমিশ্রকৃতৌ সেকশুভোদয়ায়াং সেকে সমায়াতে প্রথমে রাজদর্শন নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ*' (*সেকশুভোদয়া*, ২০০২, পৃ. ৪), তবে হলায়ুধ মিশ্রের মতো লেখক যিনি কিনা *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ইত্যাদি নানান বিদগ্ধ গ্রন্থের জনক তিনি এইধরণের গ্রন্থ লিখবেন কিনা তা নিয়ে সন্ধেহের অবকাশ তো থেকে যাবেই। যদিও দীনেশচন্দ্র সেনের মতটিকে আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই

> "লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ সুপ্রসিদ্ধ *ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব* গ্রন্থপ্রণেতা 'হলায়ুধ' এই পুস্তকের রচয়িতা, ভণিতায় বারংবার এই কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, এই পুস্তক হলায়ুধকর্তৃক কখনও লিখিত হয় নাই; যেহেতু ইহার পত্রে পত্রে ব্যাকরণের ভুল দৃষ্ট হয়, হলায়ুধের মতো মহাপণ্ডিত যে এরূপ ভাষার ভুল করিবেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই যুক্তির আমরা কোনো সার্থকতাই দেখি না। শাহ জলাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণ সেনের সভায় আসিয়া থাকিবেন। কিন্তু যে পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের। এই চারিশত বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারি পাঁচবার পুস্তকখানির নকল হইয়াছে। যেহেতু এই পুস্তক সেই মসজিদের বৃত্তিসম্বন্ধে একটি প্রধান দলিল...তাহার ধারে কাছে হিন্দু ছিল না। এমতাবস্থায় যে সকল লোক ইহার নকল করিয়াছেন তাহাদের সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য থাকিবার কথা। চার পাঁচ বার নকলে আসল খাস্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই...বাঙ্গালী হাতের বাঙ্গলা পুঁথি যদি এরূপ বিকৃত হইতে পারে তবে পাঠশালার গুরুমহাশয় কি সংস্কৃতের বর্ণজ্ঞানশূন্য কোন গ্রাম্য পুরোহিত বা পল্লী-তসীলদারের হাতে বারংবার পড়িয়া যে হলায়ুধের দুর্গতি হইবে তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সর্ব্বশেষ নকলকারী রামভদ্র শর্ম্মার বিদ্যার দৌড় পুঁথিতেই দেখা যায়"।[3]

এখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যদি মেনেও নিই যে হলায়ুধ যিনি কিনা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন (গ্রন্থে যার বহুবার নামোল্লেখ আছে সেক তাব্রিজির সঙ্গে) যদিও বা এই গ্রন্থের রচয়িতা হন তাহলে তিনি একজন কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও কেন একজন বিদেশবিভূই সেকের উদ্দেশ্যে কোনও গ্রন্থ রচনা করবেন? কেউ যদি বলেন লক্ষ্মণসেন তো স্বয়ং সেকের ক্রিয়াকলাপের প্রতি এতোটাই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন (গ্রন্থে যার বারংবার উল্লেখ আছে) যে বাইশ হাজার একর জমি তাঁর উদ্দেশ্যে সম্প্রদান করেছিলেন (যেখান থেকে **বাইশ-হাজারি** নামটি এসেছে) তাহলে তাঁর সভাপণ্ডিত সেকের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি লিখতেই তো পারেন। তাহলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে যদি লেখেনও বা তাহলে তিনি কেন পাঁচমিশালি যুক্ত নানান গল্প যেগুলোর হয়তো কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক নেই

[3] *বৃহৎবঙ্গ* (১৩৪১) পৃ ৪৫৮-৫৯।

সেইগুলোর একত্রে উপস্থাপনা করবেন? তিনি কি গল্প লিখতে জানতেন না, নাকি সংস্কৃত ভাষায় দখল ছিল না? ভাষা বিকৃত হতে হতে অনেককিছুরই পরিবর্তন ঘটে, তাই বলে নকলকারি একেবারে "পার্বতীসুতো-লম্বোদরঃ" থেকে একেবারে "পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর"-এর মতো এতোটা সুতো লম্বা করে দেবেন যে তার কোনও খেই থাকবে না? তাছাড়া গল্পে পারিপার্শ্বিক চরিত্রদের সাথে শৃঙ্গার রসের এমন নগ্ন বহিঃপ্রকাশ (Bold Expression) আমরা এখানে দেখব যে যার রচনাশৈলী (style) মোটেও হলায়ুধ মিশ্রের ব্যক্তিসত্ত্বার (personality) সাথে সামঞ্জস্য খায় না। তাহলে যিনি লিখেছেন তিনি কি তাঁর নামটিকে ব্যবহার করেছিলেন, নাকি ইনি অন্য কোনও হলায়ুধ? তবে সবথেকে বেশি আকর্ষণের বিষয় গ্রন্থটির রচয়িতা কেন হলায়ুধ? কারণ যেখানে জয়দেব, উমাপতিধর, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী, শরণের মতো (পঞ্চরত্ন) কবিরা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় বিরাজমান সেখানে কেন হঠাৎ হলায়ুধের নামে গ্রন্থটি উঠে এল? সুকুমার সেন বলেছেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা সেকশুভোদয়া বইটি হলায়ুধ মিশ্রের লেখা...যেভাবে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য তুর্কী কবলিত হল তাতে মনে হয় মুসলমান শাসন মেনে নেবার মতো ভাব লক্ষ্মণ সেনের কোন কোন প্রভাবশালী সভাসদের মনে গড়ে উঠেছিল। তার পিছনে কোন মুসলিম জিন্দাপীরের প্রভাব থাকা অসঙ্গত নয়।"[4] প্রাচীন পুথিটিতে সর্বসাকুল্যে ২৭-টি অধ্যায় ছিল যার মধ্যে এখন ২৫টি পাওয়া যায়। পুথিটির শেষাংশে লিপিকার নিজের পরিচয় দিয়েছেন রামভদ্র শর্মা নামে। তিনি শ্রীজগন্নাথ রায়ের জন্যে ভাদ্র মাসের পঞ্চমী তিথিতে ভৃগুপক্ষে অতি যত্নসহকারে পুথিটি রচনা করেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন ৬০৮ হিজরি বা বিক্রমাদিত্য ১১৩৪ সনে কার্ত্তিক মাসে সেকের শুভাগমন আর ৬১০ হিজরি বা ১১৩৬ সনে তাঁর বঙ্গপ্রদেশ থেকে বহির্গমন।[5] যদিও ঐতিহাসিকদের মতে এটি মূলত দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি। তবে গ্রন্থে আমরা কিছু কিছু প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত লোকসঙ্গীত তথা গাঁথার উল্লেখ পাই যেটি প্রাচীন বা মধ্যভারতীয় বাঙ্গলা-ভাষার নিদর্শন সম্ভবত চর্যাপদের পরবর্তী, তবে সুকুমার সেনের মতে গ্রন্থটি মূলত ষোড়শ শতকে রচিত।[6] টোডরমলের সময়ে ভূমিরাজস্বজনিত কর থেকে এই সুবিশাল জমিকে মুক্ত রাখার জন্যে নাকি প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থটিকে তৈরি করা হয় জাল প্রমাণপত্র হিসাবে (forgery-document), প্রসঙ্গত টোডরমলের ভূমিরাজস্বনীতি বাংলায় সেই অর্থে কোনোদিন প্রচলিত হয়ইনি। তাহলে গ্রন্থটি লেখা হল কেন? শুধু কি পীরবাদ প্রচারের জন্যে?

---

[4] *বঙ্গভূমিকা* (১৯৭৪), সুকুমার সেন, পৃ 205।

[5] *"শ্রীমৎসাহজলালস্য কথাং জনমনোরমাম। শ্রীজগন্নাথরায়স্য পাঠার্থং বহুযত্নতঃ।। ভাদ্রমাস্যস্থিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে। যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং শ্রীরামভদ্রশর্ম।।...যাবনিক সন ৬০৮ শাকে বিক্রমাদিত্য ১১৩৪ কার্ত্তিক শ্রীমৎসাহজালালস্য আশ্রমে আগমনম...যাবনিক সন ৬১০ শাকে বিক্রমাদিত্য ১১৩৬ চৈত্র কৃষ্ণতৃতীয়ায়াং অত্র দেশাৎ গনমং রজ্জব চন্দ্রে শ্রীমৎসাহজালস্য..."* *সেকশুভোদয়া* (২০০২), পৃ ১৩১।

[6] "...the linguistic features of *Sekaśubhodayā* belong distinctly to early middle Bengali. On whole the core of *Sekaśubhodayā*, as we have it, can be assigned to a time not later than the second half of the sixteenth century." *Sekaubhodayā* (1963), p xix.

বিষয়বস্তু ও পীরসাহিত্য

সুকুমার সেন গ্রন্থটিকে দেখেছেন বাংলায় আবিষ্কৃত সংস্কৃতে লেখা প্রথম পীর-উৎসর্গীকৃত এক সাহিত্যিক নিদর্শন।[7] তাহলে আমরা কি এটিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পীর সাহিত্যের প্রথম উদাহরণ বলতে পারি? *সেকশুভোদয়া* মূলত সেক তাব্রিজীর উদ্দেশ্যে রচিত পীর-জীবনীমূলক ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ (Hagiological liretature) তবে বাংলায় পীর-সাহিত্য বা পীরের পাঁচালি বলতে ঠিক যা বোঝায় এটি কিন্তু তা নয়। এখানে বিভিন্ন ধরণের গল্পসাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংমিশ্রণ (compilation) আমাদের চোখে পড়ে। যেমন একদিকে *হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, প্রবন্ধচিন্তামণি, পুরুষপরীক্ষা*-র মতো গল্পের প্রভাব, তেমনই আবার অন্যদিকে লোকপ্রসিদ্ধ নানান গাঁথা (folk-stories) থেকে প্রাচীন বাংলা লোকসঙ্গীতের (folksongs) অবতাড়নাও আমাদের নজর কাড়ে। কিন্তু লেখক এখানে গল্পে এতো সংমিশ্রিত রূপ দিলেন কেন? নাকি এখানেও গল্পের মূল অংশের সাথে প্রক্ষিপ্ত (sub-plot) অংশগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল?

গল্পের বিষয়বস্তু প্রধানত সেক নির্ভর, সব ঘটনাই তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে আর এখানেই এসে পড়েছে নানান পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সামাজিক গতি পরম্পরা। গল্পের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই সেকের অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ওপরে লক্ষ্মণসেন আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং ক্রমশ তিনি তাকে তাঁর রাজসভায় স্থান পর্যন্ত দেন যেখানে সেককে বিষক্রিয়ায় মারার চেষ্টা করেন স্বয়ং তাঁর মন্ত্রী উমাপতি ধর কিন্তু ক্রমশ সেক সাধারণ জনমানসের মধ্যে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন যেন তিনি ধীরে ধীরে তাঁদের পরিত্রাতা হয়ে উঠতে থাকেন। গল্পের প্রথমাংশে তাঁর নারীবিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশিত হলেও মাধবী, বিদ্যুৎপ্রভার মতো গ্রাম্য নারীদের ব্যবহারিক ও শিক্ষণীয় জ্ঞান তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গল্পে পাল ও সেন রাজাদের নানান কীর্ত্তিকলাপ আলোচিত হয়েছে।. যেমন রামপাল কীভাবে নিজ পুত্রকে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং বিজয় সেন কিভাবে কাঠুরিয়া থেকে সেনবংশীয় রাজা হয়ে উঠলেন ইত্যাদি। গল্পগুলোর মধ্যে কতোটা ঐতিহাসিক সত্যাসত্য আছে তা প্রশ্ননির্ভর, তবে সমগ্র *সেকশুভোদয়া* জুড়ে মধ্যযুগীয় একটি সচল সমাজের যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অধঃপতিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা কেউই অবহেলা করতে পারি না, যেখানে রাজার শ্যালক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করার মতো ঘটনায় পার পেয়ে যাওয়া, রাজা ও তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে ব্যভিচারিতার মতো কার্যকলাপ ও পরস্ত্রীগামীতা, সেকের প্রতি পরশ্রীকাতরতার জন্যে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা, সমাজে ঘটে যাওয়া নানা অন্যায়, অত্যাচার, নিষ্পেষণ, দমন যেন তৎকালীন সমাজের **দোজখনামা**[8] হয়ে উঠেছিল। গল্পে সেক নিজেই দেখেছেন রাজা,অমাত্য, মন্ত্রী প্রায় সবাই ব্যভিচারিতায় লিপ্ত। সেককে তো প্রকাশ্যে বলতে শোনাই গেল...

> "যত্র রাজা চ মন্ত্রী চ দ্বাবপি পারদারিকঃ।
> তস্য রাষ্ট্র বিনাশঃ স্যাৎ সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে"।। (সেক, ২০০২, পৃ ৮৬)

[7] "The title of the book gives away the purpose of the work. It celebrates the auspicious coming of a muslim saint in a country which yet did not know Islam. In a way *Sekaśubhodayā* is a first literary record in Bengal which purports to honour a Pīr. The overall structure of the book is that os a historical Kāvya written in prose and verse." *Ibid,* p xi.

[8] *দোজখ* শব্দের অর্থ হল নরক বা নিয়তি। দোজখনামার অর্থ হল নরকে শয়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কথোককথন।

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্তের মতে "যুগটাই ছিল নীতিশিথিলতার, আভিচারিক ক্রিয়াকর্মের, আভিজাতবর্গের অত্যাচার, গণিকাগমন, বিষপ্রদান ও যাদুবিশ্বাসের যুগ"।[9] কিন্তু এতো কিছুর মধ্যেও আমরা দেখতে পাই সেকের প্রতি মানুষের ভালোবাসা তথা ভালোলাগার এবং সেকেও মানুষের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় দিকে দিকে বালক, বৃদ্ধ, বণিতা থেকে প্রসূতি সবাই সেককে একবার দেখার তাগিদে ছুটে আসছেন।[10] এটি কি একজন পিরের পক্ষে কম পাওনা? এখানেই সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গটি ধরা দেবে। বাংলায় তুর্কি বা মুসলিম আক্রমণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের অগ্নিতে মুসলিম আক্রমণ শুধু ঘৃতাহুতি করেছিল।[11] *শূন্যপুরাণে*ও আমরা দেখি সদ্ধর্মীরা আরও একধাপ এগিয়ে তুর্কিদের স্বাগত জানিয়েছেন এবং ভেবেছেন এরা বুঝি ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার থেকে ওনাদেরকে রক্ষা করবে।[12] বাঙ্গলায় তুর্কি আক্রমণের পর থেকে ইসলামীকরণের জন্যে পীর সংস্কৃতি (Pir Culture) এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে, যে পর্যায়টিকে Eaton সাহেব 'গ্রহণ' বা Inclusion হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[13] সূদুর প্রাশ্চাত্য আরব, মক্কা থেকে এদেশে এসে ইসলাম ঘাটি জমিয়েছে শুধুমাত্র বাদশা, আমির, উলেমাদের ফতোয়া জারি করে নয় বরঞ্চ তাঁরা বুঝেছেন এই বহুত্বময় (heterogenous) বহুলোকসংস্কৃতিময় (diversities) দেশে একেশ্বরবাদের (monotheism or Unity of God) বা *তৌহিদের* মতো মত প্রতিষ্ঠা করা মুখের কথা নয়, তাই প্রথমে তাঁদের বহুত্বকে মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে আর এই কাজ যারা করতে পারবেন সেই সমস্ত লড়াকু, ধর্মপ্রাণ, সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাওয়া নেতৃত্বরাই হলেন পীর সন্ততি। আমরাও দেখি গ্রন্থে সাধারণ মানুষেরা তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য নানান সমস্যার কথা সেককে গিয়ে বলছে, সেকও তাঁদের সমস্যার সমাধান করছেন। নিজেদের যে কাজ সমাজের নেতা মন্ত্রীদের করণীয় তা তিনি করেছেন অবলীলাক্রমে। মানুষের ধারণা এখানে পোক্ত হয়েছে যে সেককে স্মরণ করলেই বুঝি তাঁদের বিপদ দুরীভূত হবে।

"মকদম সেক শহজলাল তবরেজ তব পাদে করোঁ পরণাম।
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম।।
বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রাণ।
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্দ্ধেক দান"।।[14]

---

[9] *বাচঃ পল্লবয়তি,* (১৯৮৩), পৃ ৭২।

[10] "*যথেচ্ছয়া দেশে দেশে লোকাঃ গচ্ছন্তি স্বেচ্ছয়া । কশ্চিন্ন বাধতে'পিষ্টো মহাত্মনঃ প্রসাদতঃ ।।*
আয়াতাঃ সকলাঃ লোকাঃ সেকং দ্রষ্টুং পুনঃ পুনঃ। প্রসূতির্বালকাশ্চৈব যত্র সেকো গতশ্চ বৈ"।। *সেকশুভোদয়াঃ* (২০০২),পৃ ৬৫

[11] সা'আদুল ইসলাম(২০১০), পৃ ৬২-৬৫।

[12] "*ধর্ম হৈয়া যবন রূপী   শিরে ধরি কালো টুপী,*
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদাএ বলিয়া এক নাম"।। *শূন্যপুরাণ,* নিরঞ্জনের রুষ্মা

[13] "The Hero of the *Sekaśubhodayā* is not a traditional Bengali deity, however, but Sheikh Jalal al-din Tabrezi himself." Eaton (1993), p 97.

[14] *সেক* (২০০২) পৃ ১০

সেকও রাজাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছে "হে রাজন, যে আমাকে সদ্ভাবে স্মরণ করবে সকল প্রকার বিপদ থেকে আমি তাঁকে উদ্ধার করবই"।[15] ইসলামীয় ধর্মপ্রচার মূলত দ্বিস্তরীয় প্রথমটি প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) বা পৌত্তলিকতা-বিরোধি এবং দ্বিতীয়টি হল সহাবস্থান ও সমন্বয়ের ধর্ম (syncretization) যেটি মূলত বাংলায় পীর সন্ততিদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন "চারটি প্রধান ভিত্তিস্তম্ভের উপর পিরিয় ইসলাম-এর প্রচার হয়েছিল। ১) রাজশক্তির আনুকূল্য বা সহযোগিতা, ২) জঙ্গল ও পতিতজমি সাফাই ও মনুষ্য-বসতি স্থাপন, ৩) ব্যাপক কৃষিকাজ, বিশেষত ধান-চাষের সম্প্রসারণ...৪) চতুর্থ ভিত্তিস্তম্ভ ছিল অবশ্য মসজিদ-দরগা-খানকা (monestry, hospice) নির্মাণ এবং জনসাধারণের সমবেত হওয়ার ও আলাপ আলোচনার সুবন্দোবস্ত করা"।[16] প্রসঙ্গত এই চারটি ভাবধারাই আলোচ্য গ্রন্থে আমরা খুঁজে পাব। গ্রাম-বাংলায় সুফি পীরদের এতো জনপ্রিয়তার পেছনে মূল কারণ ছিল গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের ওতোপ্রতোভাবে মিশে যাওয়া এবং তাঁদের জীবনের অঙ্গীভূত হওয়া। গ্রন্থে সেক স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন...

"মধ্যে আছে পীরের মোকাম।
তস্যোপরি বিদ্যতে প্রধান পুরুষের স্থান।।
তীয়াঞ্জলি তাহার নামে দান...
আমার মোকামে সাধিয়া অনেক লোক করিব প্রণাম।
কেহ বাঞ্ছে ধন পুত্র কেহ আরোগ্য দান।।
আমি তাহার করিব ত্রাণ।
দশম অঞ্জলি তাহার নামে দান"।।[17]

এই সমন্বয় সাধনের পক্রিয়াটি একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়ে যায় যার ক্ষেত্র ছুঁয়ে যেতে থাকে বাঙ্গলার নানান ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-কাব্য-মহাকাব্য-মঙ্গলকাব্য ও পিরসাহিত্যে। এর প্রভাব থেকে বোধহয় এড়িয়ে যেতে পারেন নি আমাদের গল্পের লেখকও।

সেকশুভোদয়ার সংস্কৃত ভাষা ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব

ভাষা হল সমাজ উপস্থাপনের এমন একটা মাধ্যম যার মধ্যে বহুস্বরীর একটা ভাবধারা ধরা দেয় যেটিকে রাশিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক Mikhail Bakhtin "Heterogliossia" নামে অভিহিত করেছেন। আমরা যে ভাষায় কথা বলি, বা যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন তা চালিত করে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বিচার পদ্ধতি, যেটি আবার প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত হয় সমাজ কর্তৃক। এককথায় ভাষা, মন ও সমাজ একে ওপরের সাথে এমনভাবে ওতপ্রতোভাবে জড়িত যে একে অপরকে ছাড়া অকল্পনীয়।

---

[15] "*অরণ্যে প্রান্তরে বাপি বিগ্রহে শত্রুসঙ্কটে। সদ্ভাবে স্মরতি যস্তু তত্র গচ্ছামি বৈ নৃপ ।।*
পরহন্তা পরদারী চৌরদস্যুভয়ানি চ । সততং স্মরতি যস্তু ন গচ্ছে'হং নৃপাত্মজ "।। তদেব, পৃ ১১।

[16] কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, "ইতিহাসের মধ্যযুগঃ পির ভারত ও পির বাংলা", *রাঢ়কথা* (২০১৪), পৃ ২৩।

[17] *সেকশুভোদয়া* (২০০২), পৃ ৬০-৬১।

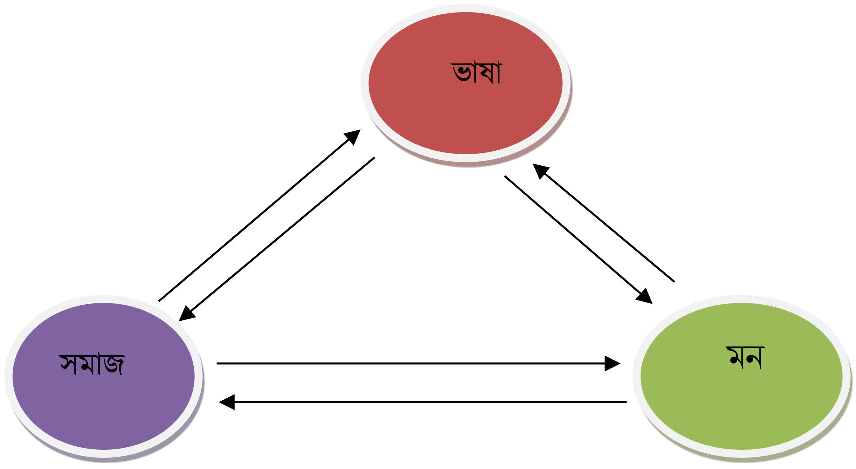

লেখক যে ভাষার ব্যবহার করেন তা মূলত তাঁর উপলক্ষ-পাঠক (Target Audience)-কে উদ্দেশ্য করেই ব্যবহৃত করেন। তবে আমরা যদি কালিদাসের *মেঘদূতের* ভাষার সাথে জয়দেবের *গীতগোবিন্দের* ভাষার তুলনা করি তাহলে এর উত্তর পাব না (যদিও দুটোই সংস্কৃত ভাষা কিন্তু তাদের স্থান, কাল, পরিপ্রেক্ষিত আলাদা)। দ্বাদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে সেন বংশীয় রাজা বিশেষত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য জগতে বিশেষত গ্রাম্য এবং নগরকেন্দ্রিক, রাজসভামূলক এবং সাধারণ বা স্বজাতীয় রচনাশৈলীর ওপরে হঠাৎ পরিবর্তন চোখে পড়ে।[18] আমরা যদি Classical Sanskrit Literature-এর সাথে সংস্কৃতের fictions, fables বা tales জাতীয় রচনার তুলনা করি তাহলে ভাষার উপস্থাপনার মধ্যে অনেক পার্থক্য চোখে পড়বে। *সেকশুভোদয়া* প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন "যিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন তিনি বেশি সংস্কৃত জানতেন না, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে পীরের মাহাত্ম্য প্রচার করা, যার ফলে এখানে ব্যবহৃত ভাষা কোনো মিশ্রিত সংস্কৃত নয় বরং সংস্কৃতের অসংশোধিত রূপ অনেকটা পরীক্ষার খাতায় লিখিত অশুদ্ধ সংস্কৃতের মতো, অর্থাৎ ভাষাটি সংস্কৃত কিন্তু ছাঁচের আদলটি বাঙ্গলা"।[19] সুনীতিবাবুরও মত মোটামুটি এইরকমই যে-লেখকের সংস্কৃত জ্ঞানের দৌড় গ্রামবাংলায় অমরকোষ ও সাধারণ কিছু ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করা পর্যন্ত। লেখক ভেবেছেন বাংলায় আর লিখেছেন ভাঙা সংস্কৃতে। তাই এই ভাষাকে তিনি 'Dog Sanskrit' বা খিঁচুড়ি ভাষা ছড়া অন্য কিছু বলতে চাননি।[20] তিনি আবার

[18] "At the turn of the twelfth century into the thirteenth, at the court of king Lakṣmaṇasena of Bengal, Sanskrit poetry showed profound and sudden changes…Courtly and pastoral, rural and urban, cosmopolitan and vernacular components confronted each other in a commingling f high and low styles." Knutson (2016), P 1.

[19] "The book as we have is now of the result of handling of old material by person or persons not knowing much Sanskrit, whose main purpose appears to have been popularizing the Pīr cult through interesting stories. The language of *Sekaubhaodayā*, therefore, is not a kind of deliberate Mixed or Dog Sanskrit but is miswritten Sanskrit, i.e., Sanskrit written in the Bengali manner as it now quite well known in examination scripts." *Sekaubhodayā* (2002), p xix.

[20] "Our author knew some Sanskrit; and he had undoubtedly some old material to go by: and he had the stories. All these he combined into a book of 27 chapters and he invented a language on his own which would be intelligible to the more learned among his village audience…His language be should be called Dog Sanskrit; 'Corrupt Sanskrit' would be too flattering a term for it. The author thinks in Bengali, and he makes his Sanskrit (so called) follow the Bengali." *Sekasubhodayā* (1334), p viii.

সেকশুভোদয়ার ভাষার সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা (Buddhist Hybrid Sanskrit Language) এর প্রভাবও দেখতে পেয়েছেন। তিনি দরগার পূজা পদ্ধতি, নিয়ম নীতির সঙ্গে বৌদ্ধ চৈত্যসেবা ও পূজা পদ্ধতির মিল দেখেছেন।[21] এছাড়াও *সেকশুভোদয়া*তে আমরা বাংলা ভাষায় রচিত কিছু গান তথা ছড়াও পেয়ে থাকি তবে সেগুলো প্রাচীন না আদি মধ্যযুগীয় বাঙ্গলার নিদর্শন তা নিয়েও বিস্তর চর্চা হতে পারে।[22]

গ্রন্থের ভাষা: রূপতত্ত্বগত কিছু বৈশিষ্ট্য

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটির মূল বিশেষত্ব হল এটি পুরোটাই বাংলার ছাঁচে মোড়া সংস্কৃত লেখা, মানে খুব একটা সংস্কৃত জ্ঞান না থাকলেও যে কারুরই বোধগম্য হবে যে লেখক কি বার্তা দিতে চেয়েছেন। আমরা কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি যেমন প্রচলিত বাংলায় আমরা যেমন বলি "বলছ না কেন?" লেখকও লিখেছেন "*বদসি কথন্ন* " (*সেক,* ২০০২, পৃ ৫), তারপর "শোনো আমি কিন্তু তোমাকে জানি না"। এখানে লেখক লিখেছেন "*শৃণু ময়া ত্বাং ন জানামি*' (তদেব, পৃ ৫) এখানে লেখক বাক্যটির বাচ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন, কিন্তু ভুল করেছেন। প্রকৃত সংস্কৃতে এটি হওয়া উচিৎ *অহং ন জানামি* বা *ময়া ন জ্ঞায়তে,* কিন্তু এখানে আমরা তা দেখছি না। আবার "কেউ এসে নিয়ে যায় যদি এই ভেবে..." "*কশ্চিদায়াতি নীত্বা যাতি বা তৎহেতুনা বিধৃত্য পিবতি*'(তদেব, পৃ ৫)। বাংলার প্রচলিত ভাবধারার সাথে (Idiosyncratic usage) সংস্কৃত ভাবধারাকে লেখক এখানে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। এই রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আমরা এই গ্রন্থে পাব যেমন "*মম হৃদয়ে শল্য ইব ভূতো ললাগ*' (তদেব, পৃ ১০) আমার হৃদয়ে শূলের মতো লাগল। "*হে মূঢ় কামান্ধ ত্বমপি কঃ অহমপি কঃ*' হে মূর্খ কামুক তুমি কে আর আমি কে (তদেব, পৃ ১৩) আবার "*ময়া যথোচিতং করিষ্যামি*' (তদেব পৃ ১৫) আমি আমার মতো যথেষ্ট করেছি। এখানেও কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সাযুজ্য নেই সংস্কৃতে syntax হিসাবে, শুদ্ধ রূপটি হল *অহং করিষ্যামি* বা *ময়া ক্রীয়তে*। আরো হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যখন লেখক লিখেছেন "*কশ্চিৎ চিল্লঃ সমাগত্য মাংসার্থী ছুরিং দত্ত্বা নখাঙ্কুরেণ স্বর্ণশলাকাসমিতেন মণিং নীত্বা গতো'সৌ*' (তদেব পৃ ৭৯) মানে কোনো "এক চিল ছোঁ দিয়ে নিয়ে চলে গেল..." । বা "*দৃষ্টং দৃষ্টং শ্রুতং শ্রুতং ব্রুতং ব্রুতং*" (তদেব পৃ ১১) মানে যা দেখার দেখা হয়েছে, যা শোনার শোনা হয়েছে আর যা বলার বলা হয়েছে। এটাকে কি আমরা সংস্কৃতের সরলীকরণ বলব? নাকি সংস্কৃতের বাংলাকরণ (Bengalized Sanskrit)? নাকি বলব শুধুই লিপিকারের ভ্রান্তি? লিপিকারের ভুল তো আছেই কিন্তু যখন আমরা দেখি "*দৃষ্টা রাজা ভার্যযা সহ পাদৌ অপতৎ*" (তদেব, পৃ ১২৫) তখন সেটা কি শুধুই লিপিকারের ভ্রান্তি নাকি লেখক ভেবেছেন বাংলায় অর্থাৎ "রাজা পত্নীর সঙ্গে একসাথে পায়ে পড়ল" এখানে লেখক 'সঙ্গ' অর্থে করণে তৃতীয়া ভেবে **সহ** শব্দটির ব্যবহার করেছেন। সেই তিনি ভাবছেন বাংলায় আর লিখছেন সংস্কৃতে। আরও কিছু উদাহরণ যেমন "*সা সাধুর্বৃহন্নৌকাং কৃত্বা...*" (তদেব, পৃ ৫১) বড় নৌকা করে, "*ত্বং মাং নয়সি ন ত্যজসি* (তদেব, পৃ ৫৪) তুমি

---

[21]"The language may be described as Buddhist Sanskrit run mad: and in fact it may be pertinently questioned whether the *Sekaśubhodayā* does not represent in a later, post Mohammedan from the Buddhist tradition of writing Sanskrit by making all conscious and unconscious attempts at reconciling it with the spoken vernacular the Prakritis".

[22] সুকুমার সেনের মতে এটি মধ্য যুগীয় বাঙ্গলায় নিদর্শন যদিও রামেশ্বর শ' এর মতে এটি প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার উদাহরণ। রামেশ্বর শ' (২০১২), পৃ ৫৯৭।

আমাকে নাও নাহলে ছাড়ো, আবার "*একদিবসে সর্বাণি পত্রাণি ন পতন্তি, দিবসে দিবসে পতন্তি* (তদেব, পৃ ৬৮) মানে "একদিনে গাছের সব পাতা পড়ে না, দিনে দিনে পড়ে"। এখানে Classcical Sanskrit তে এইএকম ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব। তারপর "*অহং জলে বা প্রবিশ্য প্রাণান্ ত্যক্ষ্যামি* (তদেব ৮৬) আমি জলে ডুবে প্রাণ দেব বা "*অস্মাকং রাজমহিষীং ধৃত্বা নীত্বা যাতি*' (তদেব, পৃ ১১৪) অর্থাৎ আমাদের রাজমহিষীকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল । এমনকি কোনো এক বণিকবধূ গানের সুরে এতোটাই আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে কুঁয়োতে কলসি ফেলতে গিয়ে নিজের ছেলের গলায় দড়ি বেঁধে ভুলবশত ফেলে দিয়েছিল। লেখকের ভাষায় *"কাচিদ্ বণিগ্‌বধূঃ কূপে জল তোলয়মানে ধ্বনি শ্রুতে সতি সা মুমূর্ষা ভূয় ভাণ্ডং ত্যক্তা পুত্রস্য গলে রজ্জুং দত্বা কূপে সমানয়ামাস'*। (তদেব ৬৫)। এসমস্ত বাক্য ব্যবহার কিন্তু কোনোভাবেই লিপিকারের ভ্রান্তি হতে পারে না, বরঞ্চ লেখকেরই ভাষার সীমাবদ্ধ ব্যবহার। এখানে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে লেখক এহেন ভাষার ব্যবহার করলেন কেন? তিনি তো পারলে স্বচ্ছ, সহজ, সরল, বাংলা ভাষাতেই গ্রন্থটি লিখতে পারতেন?

এখানেই ধরা দেবে সমাজভাষাবিজ্ঞান বা Socio-Linguistics-এর প্রসঙ্গটি। আগেও বলে হয়েছে লেখক অর্থাৎ যিনি লেখেন তিনি মূলত তাঁর পাঠকদের (Target Audience) কথা ভেবেই লেখেন যাতে বিষয়টির মাধ্যমে তিনি যা বোঝাতে চাইছেন তা যেন স্পষ্টতরভাবে ধরা দেয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখক (হলায়ুধ মিশ্র না হলেও) সম্ভবত এমন একজন যিনি সেকের আগমনে খুশি তথা ইসলাম ভাবধারায় আকৃষ্ট এবং সেকের মাহাত্ম্য প্রচারে সচেষ্ট আর তাঁর target audience কিন্তু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা যেমন কৃষক, মুচি, তাঁতি, ডোম, চর্মকার ইত্যাদি। তাই তাঁদের বোঝার সুবিধার্থে এই রকম একটা প্রচলিত কথ্য সংস্কৃতের রূপ লেখককে তৈরি করতে হয়েছিল প্রচারে আনার জন্যে, প্রসঙ্গত কালিদাসী বাক্য তথা কাব্যশৈলী এখানে চলত না। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল তাহলে সোজাসুজি বাংলায় না লিখে এটি এইরকম মিশ্র-সংস্কৃতে লেখা হল কেন? আমাদের অনুমান গ্রন্থটি যখন লেখা হয়েছিল তখন সংস্কৃতের প্রভাব মধ্যগগনে। লেখক হয়তো ভেবেছেন সংস্কৃতে না লিখলে গ্রন্থটি বৃহত্তর সমাজর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই উচ্চস্তরীয় সমাজে (Elite society) সেকের ভাবধারা প্রচারের জন্যে সংস্কৃতই হতে পারে একমাত্র মাধ্যম। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার গ্রন্থটির সংস্কৃত কিন্তু সর্বত্রই ভুলভ্রান্তিতে ভারাক্রান্ত নয় বরঞ্চ সম্পূর্ণটা দেখলে বোঝই যায় যে এর নিশ্চয় কোনও আদি রূপ ছিল যা অনেকটাই সুন্দর ও স্বাভাবিক সংস্কৃতে লেখা।[23] তাই আমাদের মনে হয় গ্রন্থটির একটা শুদ্ধরূপ নিশ্চয় পূর্বে বিদ্যমান ছিল কিন্তু ক্রমশ তা কালের আবর্তনে পরিবর্তিত হতে থাকে।

উপসংহার

সাহিত্য আর কিছুই নয়, সমাজের ঘটে যাওয়া চলচ্চিত্র (cinema or drama), সাহিত্যিক পরিভাষায় যাকে বলে *দৃশ্যকাব্য*। আমাদের আলোচ্য *সেকশুভোদয়া* গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় বাংলার এমন এক অবক্ষয়ের দৃশ্যপট রচনা করে

[23] "There is, however some evidence to show that the work was based on an earlier composition…the verses, verse lines and imbedded verse-feet, other than quotations, are usually written in very good Sanskrit. The prose too sometimes shows good Sanskrit words, phrases and idioms. Not a few stories carry an atmosphere of pre-Muslim days." *Sekaśubhodayā* (2002), p xix.

যেখানে সমাজের প্রতিটা আনাচে-কানাচে দুর্নীতি, দুর্দশা ও নৈরাজ্যের করালগ্রাসে আচ্ছন্ন এবং মানুষ সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে। এমতাবস্তায় বাংলায় বুক আক্রান্ত হল তুর্কি অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা। তবে এই আক্রমণ কি অতর্কিত নাকি পূর্বপরিকল্পিত? কারণ গ্রন্থে উমাপতি ধর যখন সেককে বিষ প্রয়োগ করে মারার চেষ্টা করেন তখন হলায়ুধ মিশ্র তাঁকে বারণ করে বলেন "শত্রু মিত্র ভেদ এভাবে না করতে কারণ যাবনিক (ধর্মান্তকরণ) করতে এলে কেউই বাঁচাবার থাকবে না। শোনা যায় ১১২৪ শকাব্দে বিহার পাটনা থেকে তুর্কীরা বাঙ্গলায় আসবে"[24]। তুর্কি আক্রমণের সময়কাল আনুমানিক ১২০২-১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। "*তবকাত্-ই-নাসিরি*" গ্রন্থে মিনহাজ বলেছেন, বখতিয়ার খলজি ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন "নোদীয়া" আক্রমণ করেন, ফলত, লক্ষ্মণসেন সেখান থেকে পলায়ন করেন। মিনহাজ কিন্তু একবারও বলেননি যে, লক্ষ্মণসেন তখন মারা যান বা গেছেন। বরং, তিনি একথাই বলেছেন যে, সেই সময়ে লক্ষ্মণ সেনের বয়স ছিল আশি বছর। সুকুমার সেন লিখছেন "১২০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে যদি লক্ষ্মণ সেনের আশি বছর বয়স হয় তবে তাঁর রাজ্যলাভ সময়ে (১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) বয়স হয়েছিল ৫৩...সুতরাং পিতা বল্লাল সেনের রাজ্যলাভকালে তাঁর বয়স ২০ বছরের কম ছিল না। যদি ২০ বছরই ধরা যায় তবে বল্লাল সেনের রাজ্যলাভ কাল হয় ১১৪২ এবং লক্ষ্মণ সেনের জন্মকাল হয় ১১২২ খ্রীষ্টাব্দ। ...তাহলে *সেকশুভোদয়ার* গল্পে কিছু সত্য আছে বলে ধরে নিতে পারি" (তদেব, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯)। এমনকি পাহাড়পুরে প্রাপ্ত এক টেরাকোটা ফলকে একটি কাহিনির প্রতিরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে -- যেখানে দেখা গেছে এক রমণী গান শুনতে শুনতে এমনই মোহিত হয়ে পড়েছে যে সে তার সন্তানকে নিজেরই অজান্তে কলসী ভেবে গলায় দড়ি বেঁধে কুয়োতে ফেলে দিয়েছে। এই গল্পের হুবহু উল্লেখ পাই *সেকশুভোদয়া* গ্রন্থে। এরকম বহুধরনের গল্প, সে রামপালকে নিয়েই হোক, বা বিজয়সেনকে নিয়েই হোক, অথবা জয়দেবকে নিয়েই হোক, কিংবা তৎকালীন সামাজিক অধোগতির দৃষ্টান্তকে কেন্দ্র করেই হোক, এই গ্রন্থ থেকে পাই। আসলে গ্রন্থটি এমন এক সময়ে লেখা যেখানে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী (হিন্দু-মুসলিম) মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান (Cultural exchange) আরম্ভ হয়েছে। একজন পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে আর একজন নিজেকে পরিত্রাতা হিসাবে ধরা দিতে চাইছে। অর্থাৎ একে অপরকে বুঝতে ও জানতে চাইছে যার প্রধান মাধ্যমই হল ভাষা। ভাষা সর্বদাই নিজেকে পরিস্থিতির সাথে অভিযোজিত করে নেয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের ভাষাও যেন মধ্যযুগীয় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া এক সংমিশ্রিত ভাষা যা খুবই নজিরবিহীন বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে। শুধু কি তাই? ভাষার বাইরে আমরা তৎকালীন যুগের যে সমাজচিত্র এবং যে সমস্ত গল্পগুলো পাচ্ছি (যেমন রাজা রামপালের, বিজয়সেনের, সেক তাব্রিজীর, কবি জয়দেবের, ধোয়ী) তাছাড়াও যেসমস্ত লোকপ্রচলিত গল্পগাঁথার উল্লেখ পাই তাতে মনে হয় গল্পগুলোর মধ্যে একটা সচল প্রবহমানতা ছিল যা তৎকালীন বাংলার হাওয়া-বাতাসে মিশে ছিল। লেখক সম্ভবত চারণ কবির মতো গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেরিয়ে সেগুলোকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই সেই জীবনপুরের-পথিক যেই হোন না কেন তাঁর প্রতি আমাদের ঋণ কি কোনও অংশে কম? পুথিটি জাল বা ঐতিহাসিক সত্যতা নেই বলে এটিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়াটা যে-কোনো সিরিয়াস গবেষকের পক্ষে একটু বেশিই অবিমৃশ্যকারিতা হয়ে যাবে। প্রথমত, যদি কোনও পুঁথিকে জাল বলে ধরা হয়, তবে এটিও প্রকারান্তরে মানতে হয়, জাল পুথিটির কখনও

[24] "*ভো পাপবুদ্ধিমন্ত্রিন ঈদৃশং কর্ম্ম ন দৃষ্টং ন শ্রুতমিতি। কথমেতদ্ গৃহাগতে সমায়াতে শত্রু মিত্রো বা বিষভোজনং দীয়তে? যদ্যপি যাবনিকং কর্ত্তুং সমায়াত তদা রক্ষিতুং কো'পি শক্তঃ...চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতাধিকে। বেহারপাটনাত্ পূর্বং তুরঙ্ক সমুপাগতঃ*"।। তদেব, পৃ. ৯।

একটি আদি রূপ (Mother copy) ছিল; না হলে জাল (forgery) হবেই বা কোথা থেকে? আরেকটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ না করলেই নয় সেটি হল এই গ্রন্থের ভাষা। এখানে বেশ কিছু মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়, যার মধ্যে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকটি গাথা রয়েছে একটি ভাটিয়ালি সঙ্গীতসহ, যেটিকে আবার কোনো কোনো পণ্ডিত চর্যাপদ-পরবর্তী বাংলা ভাষার নিদর্শন বলে মনে করেছেন। পরিশেষে বলা চলে কোনও গবেষণাই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। হতে পারে *সেকশুভোদয়া* গ্রন্থটি আধা সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তবে সেখান থেকে আমাদের সত্যরূপ আলোটিকে কর্ষণ করে বের করে আনতে হবে। বিষয়টি কঠিন, কিন্তু আবাদ করলেই তো ফলবে সোনা।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

ইসলাম, ডঃ সা'আদুল. (২০১০)। *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ*, কলকাতা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন।

চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ. (২০১৪)। ইতিহাসের মধ্যযুগঃ পীর ভারত পীর বাঙ্গলা, *রাঢ়কথা*, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১-১২৯।

পণ্ডিত, রামাই. (১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ১৯১৬)। *ধর্ম্মপূজা-বিধান* (শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ্।

পণ্ডিত, রামাই. (২০১৩, প্রথম প্রকাশ ১৯০৭ বঙ্গাব্দ)। *শূন্য-পুরাণ* (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার।

পালিত, হরিদাস. (১৩২০ বঙ্গাব্দ, ১৯১৩)। *আদ্যের গম্ভীরা (বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়)*, মালদহ: জাতীয় শিক্ষা সমিতি।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ. (১৯৪৭)। *বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা: কলকাতা বুক হাউস।

শ', ডঃ রামেশ্বর. (২০১২)।সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

সেন, দীনেশ্চন্দ্র. (১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। *বৃহৎবঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেন, সুকুমার. (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। *সেকশুভোদয়া*, কলকাতা: সিদ্ধেশ্বর প্রেস।

সেন, সুকুমার. (১৯৪০)। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* (*আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত*), কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সী।

সেন, সুকুমার. (১৯৫৫)। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী)*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, সুকুমার. (১৯৭৪)। *বঙ্গভূমিকা (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রীষ্টপর)*, কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

Bhattacharya, Partha Sarathi. (2019). *The Sekaśubhodayā: A Critical Study*, Calcutta: University of Calcutta (Unpublished Thesis).

Chatterji, Suniti kumar. (1926). *The Origin and Development of Bengali language* (with Vols I & II), Calcutta: Calcutta University Press.

Dasgupta, Shashibhusan. (1946). *Obscure Religious Cults* (*As Background of Bengali Literature*), Calcutta: University of Calcutta.

Eaton, Richard, M. (1993). The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, Berkeley: University of California Press.

Knutson, Jesse Ross. (2014). *Into the Twilight of Sanskrit Court Poetry* (*The Sena Salon of Bengal and Beyond*), New Delhi: Yoda Press.

Śāstrī, Haraprasād. (1897). *Discovery of Living Buddhism in Bengal*, Calcutta: Hare Press.

Sen, Dinesh Chandra. (1911). *Bengali Language and Literature*, Calcutta: Calcutta University.

Sen, Sukumar (Ed.). (2002 first edition 1963). *Sekaśubhodayā of Halayudha Miśra (Translated into English and Edited with Notes and Introduction*), Kolkata: The Asiatic Society.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

ভারতে ভাষাগত সমস্যা: ভাষানীতি ও মানবাধিকার

ঋষিকৃপা দাস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 14/09/2024
Accepted 20/03/2025

সূচক শব্দ:
রাষ্ট্র,
অঙ্গরাজ্য,
কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল,
ভাষা,
মাতৃভাষা,
জনগণনা,
ভাষানীতি,
মানবাধিকার

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

বহু ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সম্মিলিত রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত। ভারত বহু অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সমাহার। নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা খাদ্যাভাস, নানা আচারের মানুষদের নিয়ে গঠিত ভারতের মানুষদের কাছে সম্ভাব্য সবথেকে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। ভারতের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান সম্ভব সঠিক ভাষানীতির প্রয়োগের মাধ্যমে। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে তা অবশ্য ভিন্ন হয়। তবে, এই দাপ্তরিক ভাষা পরিবর্তনযোগ্য এবং সংশোধন করা সম্ভব সংবিধানে উল্লেখিত নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে। মানবজাতির ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় কোনোও মানুষের কাছে খুব সহজে কোনোও বার্তা পৌঁছিয়ে দিতে চাইলে মাতৃভাষার কোনোও বিকল্প হয় না। মানুষ যা চিন্তা করে তা মাতৃভাষাতেই চিন্তা করে। ভারতের গড় সাক্ষরতার হার দেখলে দেখা যায় যে প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ এখনো সাক্ষর নয়। অথচ এই মানুষগুলোও ভারতেরই সম্পদ। এই মানুষগুলোর কাছে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছিয়ে দিতে চাইলে তাদের মাতৃভাষাকে হাতিয়ার করা প্রয়োজন। শেষ কয়েকবারের ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কর্তৃক যে জনগণনা করা হয়েছিল তা অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে কোনোও কোনোও রাজ্যের মানুষের প্রায় নব্বই শতাংশেরও বেশি মানুষ কেবল তাদের মাতৃভাষাটুকু জানেন। তারা ভারত রাষ্ট্রকে করও প্রদান করেন,তাদের পরিশ্রমের ওপর রাষ্ট্রের অর্থনীতি নির্ভর করে অথচ তারা তাদের মাতৃভাষায় নাগরিক পরিষেবা পান না। ফলতঃ তারা পদে পদে নানাপ্রকার বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। একটি রাষ্ট্রের সম্পদ সেই রাষ্ট্রের জনগণ। বিশেষ করে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের নাগরিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা একপ্রকারের অন্যায়। ভারতীয় সংবিধানে সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানে ন্যায় ও সাম্যের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবিকক্ষেত্রে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা পায় না সঠিক ভাষানীতির অভাবে। সঠিক ভাষানীতির অভাবে কোটি কোটি মানুষ বঞ্চিত হন, অবহেলিত হন যা মোটেও কাম্য নয়। আমি নানাধরনের তথ্যের মাধ্যমে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশপাশি আইনিভাবে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব তা আলোচনা

Corresponding author’s email ID: rishikripadas@gmail.com

করেছি। যদি ঘটনাগুলোকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় তাহলে খুব সহজেই বোঝা যাবে যে রাষ্ট্রবাসীরা কীভাবে তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং এই সমস্যার সমাধান সম্ভব একমাত্র সঠিক ভাষানীতির প্রয়োগের মাধ্যমে।

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম। জাতিসত্তার গঠন এবং জাতির সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা অতুলনীয়রূপে অপরিসীম। একটি রাষ্ট্রের সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমস্ত ধরনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাতৃভাষাতেই ঘটে। মাতৃভাষাকে কোনো ধরনের ভৌগলিক সীমানা, রাজনৈতিক প্রভাব সহজে দমিয়ে রাখতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য, মাতৃভাষায় অধিকার অর্জনের জন্য মানুষের আত্মবলিদানের বহু নজির আছে।

বহু ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সম্মিলিতভাবে একত্রিত বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ভারত অর্থাৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জনসাধারণ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব, খাদ্যাভাস, আচারের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে ভাষাও ব্যতিক্রম নয়। ভাষাও একই পথের পথিক। সময়ের নিয়মে ভাষার ক্রমাগত বিবর্তন ঘটার দরুন ভারত ভাষাগত দিক থেকে বৈচিত্র্যময়।

ভারতের সংবিধানের ১৭তম ভাগের, প্রথম অধ্যায়ের ৩৪৩তম অনুচ্ছেদে দেবনাগরী হরফে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাকেও সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহারের নিদান দেওয়া হয়েছে। তবে, ৩৪৪তম অনুচ্ছেদে সংঘের সরকারি প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার সঙ্কোচনের পাশাপাশি হিন্দি ভাষার উত্তরোত্তর অধিক ব্যবহারের সম্পর্কে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪৫তম অনুচ্ছেদে রাজ্যসমূহের সরকারি ভাষার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩৪৬তম অনুচ্ছেদে দুই বা ততোধিক রাজ্যের সমাযোজনের ক্ষেত্রে কিংবা কোনোও রাজ্য ও সংঘের মধ্যে সমাযোজনের ক্ষেত্রে সরকারি ভাষা কী হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রয়োজনে হিন্দি ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে ৩৪৭তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্তে কোনোও নির্দিষ্ট ভাষাকে সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন। ৩৪৮-এর ১ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের এবং হাইকোর্টের সকল কার্যবাহ ইংরেজি ভাষাতে পরিচালনা করতে হয়। তবে, ৩৪৮-এর ২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনোও রাজ্যের রাজ্যপাল চাইলে, রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে হাইকোর্টের কাজে হিন্দি অথবা সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা (বাংলা, তামিল, মারাঠি, তেলুগু, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া ইত্যাদি) ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারেন। তবে, হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা আদেশ সম্পর্কে এই প্রকরণ প্রযুক্ত

হবে না। ৩৫০তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনোও ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য সংঘের বা রাজ্যের কোনোও আধিকারিকের কাছে ক্ষেত্রানুযায়ী, সংঘে বা কোনোও রাজ্যে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের যেকোনোওটিতে নিবেদন পেশ করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির থাকবে। ৩৫০-এর (ক) অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ৩৫১তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংঘের কর্তব্য হবে হিন্দি ভাষার বিস্তৃতি বর্ধন করা এবং অষ্টম তফসিলে বিনির্দিষ্ট ভারতের অন্য ভাষাসমূহের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা।

অষ্টম তফসিলে [৩৪৪ (১) এবং ৩৫১তম অনুচ্ছেদ] উল্লেখিত ভাষাসমূহ হচ্ছে: ১) অসমীয়া ২) বাংলা ৩) বোড়ো ৪) ডোগরি ৫) গুজরাতি ৬) হিন্দি ৭) কানাড়া ৮) কাশ্মীরি ৯) কোঙ্কণি ১০) মৈথিলী ১১) মালয়ালম ১২) মণিপুরী ১৩) মারাঠি ১৪) নেপালি ১৫) ওডিয়া ১৬) পাঞ্জাবি ১৭) সংস্কৃত ১৮) সাঁওতালী ১৯) সিন্ধি ২০) তামিল ২১) তেলুগু ২২) উর্দু

১৯৬৩ সালের সরকারি ভাষা আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদটি মূল সংবিধানের ৩৪৮-এর ২ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। তবে মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা আদেশ সম্পর্কে এই প্রকরণ প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভাষা আইন, ১৯৬৩ সালে তা সংশোধন করা হয় এবং বলা হয় যে হিন্দি বা আঞ্চলিক ভাষাতেও হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রকাশ করা যাবে তবে হাইকোর্টের প্রাধিকারাধীনে সর্বদা ইংরেজি অনুবাদ জুড়ে দিতে হবে।

এবার একটু অতীতে তাকিয়ে দেখা যাক—

১৯৬৫ সালের ২১শে মে-র ক্যাবিনেট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হাইকোর্টসমূহের ক্ষেত্রে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করতে হলে ভারতের মহামান্য প্রধান বিচারপতির অনুমতি লাগবে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৮-এর ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে, ১৯৫০ সাল থেকে রাজস্থান হাইকোর্টে [যোধপুরের প্রিন্সিপাল সিটে এবং জয়পুরের পারমানেন্ট বেঞ্চে (রাজ্য পুনর্গঠনের আগে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত জয়পুর প্রিন্সিপাল সিটে)], ১৯৬৯ সাল থেকে উত্তরপ্রদেশের হাইকোর্টে (অর্থাৎ এলাহবাদ হাইকোর্টে এবং লক্ষ্ণৌর পারমানেন্ট বেঞ্চে), ১৯৭১ সাল থেকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে (অর্থাৎ জব্বলপুরের প্রিন্সিপাল সিটে এবং ইন্দোরের পারমানেন্ট বেঞ্চে ও গোয়ালিয়রের সার্কিট বেঞ্চে), ১৯৭২ সাল থেকে বিহারের হাইকোর্টে (অর্থাৎ পাটনা হাইকোর্টে এবং রাঁচীর পারমানেন্ট বেঞ্চে (২০০০ সাল পর্যন্ত) ইংরেজির পাশাপাশি ভারতের প্রধান বিচারপতির অনুমতিক্রমে হিন্দি ভাষা ব্যবহার করা হয়।

অতীতে ফিরে তাকালে দেখা যায় প্রাচীন গ্রিসের স্টোইক দর্শনে ও রোমের আইন ব্যবস্থায় মানবাধিকারের বীজ নিহিত ছিল। মূলত ত্রয়োদশ শতকে ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে মহাসনদ বা 'ম্যাগনা কার্টা' গৃহীত হলে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সংকুচিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে মানবাধিকারের জয়যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮

খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিস শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউএনও'র) সাধারণ সভায় গৃহীত হয় বিখ্যাত মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি যা মানব জাতির ইতিহাসে মাইলস্টোন হয়ে আছে। ভারত প্রথম থেকেই এই ঘোষণাপত্রটিকে সমর্থন জানিয়ে এসেছিল। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করে। তারপর জাতীয় ও রাজ্য স্তরে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হতে থাকে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মানবাধিকারের উপযুক্ত বিস্তৃতির জন্য দেশের সার্বিক সাক্ষরতা ও জনচেতনার বিকাশ ঘটানোর কথা বলেছেন।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ১২ থেকে ৩৫তম অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৪তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে যে কোনও ব্যক্তির বিধিসমক্ষে সমতা বা বিধিসমূহ দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়া রাজ্য অস্বীকার করবে না। অর্থাৎ সমতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মৌলিক অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সেই সকল অবস্থা যা ছাড়া কোনোও মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পরমতম বিকাশ ঘটাতে পারেনা। মানবাধিকার এমন মানদণ্ড যা সমস্ত মানুষের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয় এবং রক্ষা করে।

ভাষা জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, এবং ভারতের মতো বহুভাষাভাষী ও বহুজাতিক রাষ্ট্রে ভাষার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য রয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১৯৫৬৯ রকমের মাতৃভাষার উল্লেখ পাওয়া গেছে। এবং তারপর বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ১৩৬৯টি যুক্তিপূর্ণ মাতৃভাষার উপস্থিতি অনুধাবন করা গেছে এদের মধ্যে ২২টি ভাষা ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে উল্লেখিত আছে। ১০০০০ জনের বেশি মানুষের মাতৃভাষা এমন ভাষার সংখ্যা প্রায় ১২১টি। ৯৬.৭১ % মানুষের মাতৃভাষা হচ্ছে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে উল্লেখিত সম্মিলিত ভাষাসমূহ। মাতৃভাষার সংজ্ঞা হিসেবে শৈশবে যে ভাষাটি ব্যক্তির মায়ের দ্বারা ব্যক্তির কাছে বলা হয় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শৈশবে মা মারা গেলে, শৈশবকালে ব্যক্তির বাড়িতে প্রধানত যে ভাষাটি বলা হয় সেটিই হবে মাতৃভাষা। শিশু এবং বধিরদের ক্ষেত্রে সাধারণত মায়ের দ্বারা বলা ভাষা রেকর্ড করা উচিত। সন্দেহের ক্ষেত্রে, প্রধানত পরিবারের কথা বলা ভাষা রেকর্ড করা যেতে পারে।

একটি সমাজ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে নাগরিকদের মাতৃভাষায় সকলপ্রকার নাগরিক পরিসেবা প্রদানের বিকল্প কিছু হতে পারে না এবং হয়না। মাতৃভাষায় সকলপ্রকার পরিষেবা প্রদান করা হলে সমাজের সমগ্র চিত্রটিই পাল্টে যেতে বাধ্য। এই বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীর সকল জাতির ক্ষেত্রে সত্য। বিষয়টি ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের জন্যও একইভাবে সত্য। একটি রাষ্ট্রের সম্পদ হচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের বাসিন্দারা। তাঁদের পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার যদি সদ্ব্যবহার করা যায়, তবে সেই রাষ্ট্রের উন্নতি অবধারিত। জণগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী, কেরালার প্রধান মাতৃভাষা মালয়ালম। তামিলনাড়ুর প্রধান মাতৃভাষা তামিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মাতৃভাষা বাংলা। ঝাড়খন্ডের প্রধান মাতৃভাষা বাংলা, সাঁওতালি, খোট্টা। বিহারের প্রধান মাতৃভাষা মৈথিলী, ভোজপুরী এবং মাগহী। আসামের প্রধান মাতৃভাষা অসমীয়া, বোডো এবং বাংলা। ছত্তিসগড়ের প্রধান মাতৃভাষা ছত্তিসগড়ী এবং হিন্দি। উত্তরাখন্ডের প্রধান মাতৃভাষা গাড়োয়ালী, কুমায়নী, হিন্দি ইত্যাদি। প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলেই এইরূপ এক বা একাধিক ভাষা সেই রাজ্যের মানুষের মাতৃভাষা। এবার ধরা যাক, বিহারের কথা। বিহারে তখনই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব যখন সাধারণ মানুষের কাছে মৈথিলী (মৈথিলী ভাষার সুপ্রাচীন লিপি আছে, সাহিত্য আছে, কবি বিদ্যাপতি এই ভাষায়

লিখতেন), ভোজপুরী (ভোজপুরী ভাষার লিপি আছে) এবং মাগহী এই তিনটি ভাষাতে সকল সরকারি সুযোগ সুবিধা, পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। তখনই সাধারণ মানুষ তাদের নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে, আইন কানুন সম্বন্ধে, স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে কিংবা শিক্ষাগ্রহণের বিষয়ে সচেতন হবেন। এর ব্যতিক্রমী হয়ে বিহারের পক্ষে অগ্রগতি ঘটানো এককথায় অসম্ভব। ইংরেজি ও হিন্দিভাষার মাধ্যমে বিহারের মুক্তি নেই। বিহারকে সুজলা সুফলা হয়ে উঠতে হলে মৈথিলী, ভোজপুরী এবং মাগহী ভাষায় সকল নাগরিক সুবিধা প্রদানই একমাত্র মুক্তির পথ। একই কথা প্রযোজ্য ঝাড়খন্ড, ছত্তিসগড়, উত্তরাখন্ড সহ সকল রাজ্যের ক্ষেত্রে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ফিরে আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাঙালি ছাড়াও সাঁওতালি এবং নেপালি (হিমালয়ের কোলে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায়) ইত্যাদি ভাষাভাষী মানুষরা দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তখনই এগোনো সম্ভব যখন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ ইংরেজিতে নয় একমাত্র বাংলা, সাঁওতালি এবং নেপালি ইত্যাদি ভাষায় সকল নাগরিক সুযোগ, সুবিধা পাবেন। এখন দেখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা কাদের কাছ থেকে নাগরিক সুযোগ সুবিধা পান? উত্তর হচ্ছে–পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন মন্ত্রক, দপ্তর, বিভাগ থেকে অথবা কিছু স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার (যেমন নির্বাচন কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির) কাছ থেকে।

সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮৩% মানুষ (প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ) বাংলা ভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনোও ভাষায় লিখতে বা পড়তে পারেন না। বর্তমান যুগ ডিজিটাল যুগ। আজকের দিনে অধিকাংশ নাগরিক পরিষেবাই অনলাইনে পাওয়া সম্ভব। তার জন্য দিস্তা দিস্তা কাগজের প্রয়োজন হয় না। শুধু দরকার সদিচ্ছা এবং নানা ভাষায় পারদর্শী ওয়েব ডেভেলপারদের। এক্ষেত্রে অর্থ জটিলতার মূল কারণ নয়। কারণ, সরকারের এক বছরের মোট বাজেটের নগন্য পরিমানের থেকেও কম খরচ হবে এই কাজগুলো করতে। তাছাড়া বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে নানা ভাষায় এই বিষয়ে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে একমাত্র অভাব থাকতে পারে সরকারের সদিচ্ছার। পশ্চিমবঙ্গে আজ বাংলাভাষার অবস্থা চূড়ান্তভাবে ভয়ঙ্করী। সাধারণ মানুষের মধ্যে পদে পদে ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু ভাষা চাপানোর প্রচেষ্টা চলে। উচ্চশিক্ষিত বাঙালিদের একটি অংশ নির্লজ্জভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে মাতৃভাষায় অধিকারের বিপক্ষে এবং ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এক্ষেত্রে সমানভাবে দায়ী। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা মন্ত্রক রয়েছে। তাদের অধীনে নানা দপ্তর এবং বিভাগ রয়েছে। মন্ত্রকগুলো হল: ১) অর্থ ২) স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক ৩) বিদ্যালয় শিক্ষা ৪) উচ্চশিক্ষা ৫) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ৬) জনস্বাস্থ্য কারিগরী ৭) শিল্প ও বাণিজ্য ৮) রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন ৯) ভূমি, ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন ১০) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ১১) নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক ১২) কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার ১৩) পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান ১৪) বিজ্ঞান,প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি ১৫) তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স ১৬) পরিবেশ ১৭) বন ১৮) পরিবহণ ১৯) খাদ্য ও সরবরাহ ২০) কৃষি ২১) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন ২২) প্রাণী সম্পদ বিকাশ ২৩) পর্যটন ২৪) বিদ্যুৎ ২৫) পূর্ত ২৬) আবাসন ২৭) ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র শিল্প ২৮) জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ২৯) অচিরাচরিত শক্তি উৎস ৩০) সেচ ও জলপথ ৩১) শ্রম ৩২) আইন ৩৩) বিচার ৩৪) সমবায় ৩৫) জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা ৩৬) তথ্য ও সংস্কৃতি ৩৭) কর্মসূচি রূপায়ন ৩৮) পরিষদ বিষয়ক ৩৯) উপভোক্তা বিষয়ক ৪০) যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া ৪১) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা ৪২) নারী ও শিশু

উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ ৪৩) উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ৪৪) সুন্দরবন বিষয়ক ৪৬) পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক ৪৭) অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ৪৮) আদিবাসী উন্নয়ন ৪৯) সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা ৫০) কারিগরীশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন ৫১) অগ্নি নির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা ৫২) সংশোধন প্রশাসন ৫৩) মৎস্য ৫৪) কৃষি বিপণন ৫৫) স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি।

প্রতিটি মন্ত্রক ও বিভাগের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যেতে পারে প্রত্যেকটি ওয়েবসাইট অন্ততপক্ষে রাজ্যের সরকারি ভাষাগুলোতে নিদেনপক্ষে বাংলাতে আছে কি না। ওয়েবসাইটে আপলোড করা নানা ধরণের বিজ্ঞপ্তি, আদেশনামা ইত্যাদির পিডিএফ ফাইলগুলো, ডকুমেন্টগুলো, ফর্মগুলো বাংলাতে আছে কি না। দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষায় পরিষেবা পাওয়া যায় না। এগুলি সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েবসাইট। এছাড়া স্বশাসিত সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটেও একই ঘটনা দেখা যায়। এরপর আমরা যদি জেলার বা ব্লকের ওয়েবসাইটে যাই তাহলে দেখতে পাবো কিছু কিছু জেলা এমনকি কয়েকটি ব্লকও ওয়েবসাইটকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে। কিন্তু সাধারণত বাংলায় ডেভেলপ করা ওয়েবসাইট দেখতে পাওয়া যায় না। যাতে একজন সাধারণ মানুষ বা স্কুল-পড়ুয়া একজন ছাত্র একটি বিষয় সহজেই অপরের সাহায্য ছাড়া বুঝে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা সরকার করেনি। অথচ গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণও বর্তমানে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহারে খুব পিছিয়ে নেই।

একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই উন্নতি সম্ভব। উদাহরণসহ বিষয়টি আলোচিত হতে পারে। আমরা ভারতের কিংবা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কৃষি দপ্তরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি পটল চাষ বা ধান চাষ বা মাছ চাষে কীভাবে উন্নতি করতে হয়, কোন কীটনাশক দেওয়া উচিত নয়, কোন সার দেওয়া উচিত ইত্যাদি পড়তে চাই তাহলে আমাদেরকে ইংরেজিতে অথবা হিন্দিতে পড়তে হবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের ৮৩% মানুষ বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনোও ভাষায় লিখতে পড়তে জানেন না। এবং ঘটনাক্রমে এই ৮৩% মানুষের একটি বড়ো অংশ মূলত সরাসরি কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে তারা জানতেই পারেন না তারা কোন কীটনাশক ব্যবহার করছেন বা তার ফলাফল কী হতে পারে । সেই মারাত্মক রকমের ক্ষতিকারক ফসল, ফল বা মাছ বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সকলে সেই বিষাক্ত খাবার খাচ্ছে। অথচ সাধারণ মানুষ নিজে অন্তত একবার মাতৃভাষায় পড়লে বা বাড়ির লোকজন পড়লে বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়লে অন্তত কিছুটা হলেও সচেতনতা তৈরী হওয়া সম্ভব ছিল।

এবার অপর একটি উদাহরণ দিই। একজন সাধারণ মানুষ কোনোও সরকারি পরিষেবার জন্য আবেদন করছেন সেখানে ফর্মটি শুধুই ইংরেজিতে পাওয়া যায়। ফলে মানুষ মাতৃভাষায় পড়ে বোঝার ক্ষমতা রাখলেও ইংরেজি ভাষা না জানায় তিনি কিছু করে উঠতে পারছেন না। অপরের ওপর তাদের নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। অথচ মাতৃভাষায় সকল পরিষেবা থাকলে তারা নিশ্চিতভাবে এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতেন না।

রাজ্যের সরকারি বিভিন্ন পরিষেবার কথা বললাম। এবার যাই ব্যাঙ্কিং এবং ফিনান্সিয়াল সেক্টরে। ব্যাঙ্কগুলোর অধিকাংশ কাগজে বাংলা থাকে না। মানুষ নানা ধরনের বিমা করেন, জীবন বিমা করেন। সেখানে বাংলাতে কিছু লেখা থাকে না। সাধারণ মানুষ পড়ে বুঝতে পারেন না সেখানে কোন বিষয়ে লেখা আছে। কোন কোন শর্তাবলি প্রযোজ্য। অথচ বাংলাতে কিংবা মাতৃভাষায় থাকলে বড়ো অংশের মানুষ নিজে পড়ে নিজেই বুঝতে পারতেন। এই

বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকার দেখে। কেন্দ্রীয় সরকারেরও রাজ্য সরকারের মতো অনেকগুলো মন্ত্রক এবং বিভাগ রয়েছে। সেখানেও একই অবস্থা। হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষাতে অধিকাংশ কেন্দ্রীয় পরিষেবা পাওয়া যায় না। এটা রাষ্ট্রের নির্লজ্জতা প্রমাণ করে। সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকার চায় না সাধারণ মানুষ সহজে মাতৃভাষায় তার নাগরিক সুযোগ সুবিধা পাক। অথচ বিভিন্ন মাতৃভাষায় পারদর্শী ওয়েব ডেভেলপার, যারা মাতৃভাষা এবং ইংরেজি দুটি ভাষা জানেন এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেই এই কাজটি করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি এবং হিন্দি হওয়ার অর্থ এই নয় যে নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও সেই পদক্ষেপ মেনে চলতে হবে। একমাত্র দপ্তরের কাজের ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। যখন নাগরিক পরিষেবা ও মানবাধিকারের প্রশ্ন আসবে সেক্ষেত্রে নাগরিকের ভাষাকে মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে ভাবা উচিত একটি সুসভ্য রাষ্ট্র (ও রাজ্য) হিসাবে।

শুধু তাই নয় ভারতে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অধিকাংশ ভাগই ইংরেজি ভাষা নির্ভর। অথচ পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় সারা বিশ্বজুড়ে সকল উন্নত জাতি মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ তথা গবেষণার কাজ করেন। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, চীন, পোল্যান্ড, রাশিয়া কোনোও রাষ্ট্রই ব্যতিক্রম নয়। অথচ ভারত ব্যতিক্রমী। ভারতে সেই ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেভাষা বৃহত্তর জনসাধারণের মাতৃভাষা নয়। মানুষ নিজের মাতৃভাষাতে মৌলিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং তার প্রভাব গবেষণাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থানের অংশরূপে (সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস) ন্যাশনাল ট্রান্সলেশন মিশন কিছু খ্যাতনামা বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে যা প্রশংসনীয় কিন্তু কোনোওভাবে যথেষ্ট নয়। এই উদ্যোগকে সফল করা খুবই প্রয়োজনীয় এবং বিভিন্ন ভারতীয় মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি করা উচিত। পাশাপাশি মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের সরকারি উদ্যোগে উৎসাহিত করা উচিত।

আমরা আগেই দেখেছি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের হাইকোর্টে একজন আইনজীবি তার মাতৃভাষা হিন্দিতে সওয়াল করতে পারেন। কিন্তু পাশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট কিংবা দক্ষিণের তামিলনাডু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন আইনজীবি যথাক্রমে বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, মালয়ালম, তেলুগু ভাষাতে সওয়াল করতে পারেন না। বিচারবিভাগের নানা ধরণের রায়, ডিক্রি, আদেশ হিন্দি ভাষাতে প্রকাশের সুযোগ থাকলেও এইসকল ভাষাতে প্রকাশ করা হয় না। অথচ যদি তা করা হতো তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজবোধ্য হয়ে উঠত। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারের মতো তামিলনাডু, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটকও চেয়েছিল সেই রাজ্যের হাইকোর্টগুলোতে কাজের ক্ষেত্রে যথাক্রমে তামিল, গুজরাটি, বাংলা এবং কন্নড় ভাষাকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হোক। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে সেই অনুমতি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে তামিলনাডু সরকার পুনরায় ভারত সরকারের কাছে বিষয়টি তুলে ধরার পর, ভারত সরকার তা ভারতের প্রধান বিচারপতিকে জানায় এবং অনুরোধ করে বিষয়টি দেখার জন্য। কিন্তু ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে কোনোও আশার আলো দেখা যায়নি। সমগ্র সুপ্রিম কোর্ট নাকি বিষয়টি অনুমোদন করতে আগ্রহী নয়। এখন প্রশ্ন তাহলে, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারের হাইকোর্টে সংবিধানের ৩৪৮-এর ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইংরেজি ছাড়া হিন্দি

ভাষা ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা থাকলেও অন্যান্য রাজ্যের সরকারি ভাষাগুলোতে সংবিধানের ৩৪৮-এর ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন মাতৃভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়?

মাতৃভাষায় নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য ভারতে মানভূমের মানুষদের হিন্দি ভাষা-বিরোধী আন্দোলন (১৯১২-১৯৫৬), আসামের বরাক উপত্যকার বাংলাভাষা আন্দোলন (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ), তামিলদের হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন (১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য। ভারত ভেঙ্গে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তানে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা-আন্দোলন যদি কারণ হয় তার ফলাফল ছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে মনে রাখার জন্য ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) '২১ শে ফেব্রুয়ারি'কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই মে জাতিপুঞ্জ তার সদস্যদের মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করতে বলে, "to promote the preservation and protection of all languages used by the people of the world".

মহান কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন– "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে"।

ভারতীয় সংবিধান সংশোধনযোগ্য, ভারতীয় আইন পরিবর্তনযোগ্য। তাই আশা করা যেতেই পারে যে অন্ততপক্ষে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্ত সকল মাতৃভাষাতেই মানুষ তার মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকারের সুযোগ সুবিধা পাবেন। সরকার তথা রাষ্ট্র ও রাজ্য এই বিষয়ে আরও মানবিক হবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—"অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক"।

গ্রন্থঋণ ও তথ্যসূত্র

১) ভারতের সংবিধান, বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২১ (ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত)

২) সরকারী ভাষা আইন, ১৯৬৩; ভারতের গ্যাজেট, বিশেষ, ভাগ-৭, অনুভাগ-১, ১০ ই জানুয়ারী,১৯৮৫

৩) লোকসভা ইউ.এস.কিউ (আনস্টারড কোয়েশ্চেন) ৪১৫১, ২৯.০৩.২০২২

৪) The Contributions of Professor Amartya Sen in the Field of Human Rights, Polly Vizard, CASE paper 91, January 2005

৫) CENSUS OF INDIA 2011, PAPER 1 OF 2018, LANGUAGE; INDIA, STATES AND UNION TERRITORIES (Table C-16), OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 2A, MANSINGH ROAD, NEW DELHI 110011

৬) http://wbcmo.gov.in/bangla/ministers.aspx

৭) https://www.un.org/en/chronicle/article/safeguarding-cultural-and-linguistic-diversity-context-global-citizenship

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, বিশ্বভারতী, বুলেটিন নম্বর ২০, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

বঙ্গে পাণিনীয় ব্যাকরণের পরম্পরা: জ্ঞাপকসমুচ্চয় ও আচার্য পুরুষোত্তম দেব

স্বয়ম্ভা দাস

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 04/09/2024
Accepted 20/03/2025

সূচক শব্দ:

পাণিনীয় ব্যাকরণ,

ব্যাকরণ চর্চা,

জ্ঞাপকসমুচ্চয়,

আচার্য পুরুষোত্তম দেব,

অতিথি সম্পাদক

শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের লীলাভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ, বিবিধ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং সংস্কৃতির এক মহাসঙ্গম। বিভিন্নতার মাঝে প্রতিনিয়ত ঐক্যের সুর বাজে এখানে। এই মহাজনসমুদ্রমাঝে লীলায়িত একটি তরঙ্গের মতোই আমরা বঙ্গজাতি নিজেদের ভাব, ভাষা আর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছি।

সংস্কৃত ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে বাঙালির অবদান কতটা তা আলোচনা করতে হলে শুরুতেই বলতে হয় সেই ইতিহাসের সুপ্রাচীনতার কথা। সংস্কৃত ভাষার আলংকারিকগণ কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায় যে কাব্যরীতিগুলির কথা বলেছেন তাদের মধ্যে গৌড়ীরীতি অন্যতম। অতএব সংস্কৃত রচনার ক্ষেত্রে গৌড়বাসীদের নিজেদের একটি বিশিষ্ট শৈলী ছিল। কিন্তু সারস্বত সাধনায় বাঙালির অবদান কেবল সাহিত্যনির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিবিধ শাস্ত্রের গম্ভীর তত্ত্বগুলির প্রতিপাদনেও তাদের সুগভীর প্রজ্ঞার নিদর্শন পাওয়া যায়। মীমাসা, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, নব্যন্যায় প্রভৃতি ষড়দর্শনপ্রস্থান, স্মৃতিশাস্ত্র, ভক্তিতত্ত্ব, ব্যাকরণশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, বৌদ্ধদর্শন ইত্যাদি সমস্ত শাখায়, জ্ঞানচর্চার সমস্ত মার্গে তাঁদের অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। এই বিষয়গুলিতে রচিত প্রৌঢ় গ্রন্থগুলি আজও সেই গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে।

সংস্কৃত জ্ঞানচর্চার পরম্পরায় বিকশিত শাখাগুলির মধ্যে ব্যাকরণশাস্ত্র বা শব্দবিদ্যা অন্যতম। শব্দশাস্ত্রের নিরুপণে বঙ্গীয় মনীষার বিচার করতে গেলে অবাক হয়ে দেখতে হয় যে পাণিনীয় ও অপাণিনীয় উভয়বিধ শাখাতেই বঙ্গীয় বিদ্বৎকুলের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে চান্দ্রব্যাকরণ, মুগ্ধবোধ, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের হরিনামামৃত ব্যাকরণ ইত্যাদি গ্রন্থগুলি অপাণিনীয় পরম্পরাকে রক্ষা করেছে এবং তাকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছে। এই অপাণিনী য়চর্চার বহু আগে থেকেই পাণিনীয় পরম্পরা বঙ্গে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। পাণিনীয় ব্যাকরণের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালির অবদানরূপে ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি, মৈত্রেয়রক্ষিত, নরপতিমহামিশ্র, ইন্দুমিত্র, পুরুষোত্তম দেব, শরণদেব, সর্বরক্ষিত, উজ্জ্বলদত্ত, সীরদেব প্রভৃতি আচার্যগণের নাম অমরত্ব লাভ করেছে। আধুনিক সময়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির হাত ধরে বঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত হতে দেখা যায়। কেবলমাত্র চর্বিতচর্বণ নয়, নব নব বৈজ্ঞানিক চিন্তনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বিভিন্ন

Corresponding author’s email ID: swyambhadas@gmail.com

মৌলিক রচনাগুলি এইসময় আমাদের সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ইত্যাদি নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তাঁদের প্রতিভাজাত সারগর্ভিত রচনাস্রোত এখনো কলকলনাদিনী গঙ্গার মতোই নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে গুণীজনের মনে। আলোচ্য শোধপ্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হল বঙ্গে পাণিনীয় পরম্পরা। খ্রিষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশশতক এখানে সময়কাল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা যে পরম্পরার কথা আলোচনা করব, তা ন্যাস পরম্পরা নামে প্রসিদ্ধ। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর উপর বামন ও জয়াদিত্যের দ্বারা রচিত কাশিকাবৃত্তি এবং তার উপর বৌদ্ধ আচার্য জিনেন্দ্রবুদ্ধিকৃত কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা, যা ন্যাসটীকা নামে সুপ্রসিদ্ধ, তাকে অবলম্বল করেই এই পরম্পরা গড়ে ওঠে। এই পরম্পরা মূলত গ্রন্থ রচনার এক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা যা অনুন্যাস থেকে আরম্ভ হয়। এই ধারার বিখ্যাত আচার্যগণ ন্যাসের উপর টীকা রচনা করেছেন। তাঁদের ব্যাকরণকৃতি বহুলাংশে ন্যাস প্রভাবিত ছিল। এই পরম্পরার অন্যতম আচার্য ছিলেন পুরুষোত্তম দেব। পুরুষোত্তম দেব রচিত ভাষাবৃত্তি, পরিভাষাবৃত্তি, জ্ঞাপকসমুচ্চয় ইত্যাদি গ্রন্থগুলির পঠনপাঠন তৎকালে বঙ্গদেশে পাণিনীয় পরম্পরায় সুপ্রচলিত ছিল। পরবর্তিকালে পাণিনীয়পরম্পরার হ্রাসের সাথে সাথে এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হ্রাস পায়। পাণিনীয়পরম্পরার পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে আজ পুরুষোত্তম দেবের নামের সাথে আমরা পরিচিত। কিন্তু ভাষাবৃত্তি ও পরিভাষাবৃত্তি ছাড়া তাঁর অন্য গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন এখন আর প্রায় হয় না। বিশেষভাবে বঙ্গদেশে তার চর্চা অত্যন্ত বিরল। এই প্রবন্ধে আমরা আচার্য পুরুষোত্তম দেবের তেমনই একটি বর্তমানে অপ্রচলিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের আলোচনা করব, যার নাম জ্ঞাপকসমুচ্চয়। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হল জ্ঞাপক। জ্ঞাপকসমুচ্চয় অর্থাৎ জ্ঞাপকের সংগ্রহ। অষ্টাধ্যায়ীস্থিত বিভিন্ন জ্ঞাপকগুলির বিবেচন এখানে করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মৌলিকত্বের পাশাপাশি এই গ্রন্থটির শব্দশাস্ত্রগত মূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। এই গ্রন্থটির আলোকে আমরা গ্রন্থকার পুরুষোত্তম দেবের মূল্যায়ণের চেষ্টা করব, পাশাপাশি সমসাময়িক আচার্যদের উল্লেখের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব সেই কালখণ্ডকে।

১. বঙ্গে পাণিনীয় ব্যাকরণের পরম্পরা

বঙ্গদেশে পাণিনীয় ব্যাকরণের চর্চার ইতিহাসটি সুপ্রাচীন এবং সম্ভবত তা অপাণিনীয়চর্চার অনেক পূর্ববর্তী। কাশিকাবৃত্তি রচনার অনেক আগে থেকেই পাণিনিব্যাকরণের চর্চা বঙ্গদেশে হয়ে এসেছে। কিন্তু গ্রন্থগুলি অধুনা অনুপলব্ধ। কেবলমাত্র পরবর্তী আচার্যগণের দ্বারা নিজ গ্রন্থে তাদের উল্লেখের মাধ্যমে গ্রন্থগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কালীচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর গ্রন্থে (Bengal's Contribution to Sanskrit Grammar) সংক্ষেপে সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। এখানে সংক্ষেপে সেই গ্রন্থরচনার ধারাটি আলোচনা করব।

অষ্টাধ্যায়ীর উপর তিনজন বৃত্তিকারের নাম শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এদের নাম যথাক্রমে চুল্লিভট্টি, নির্লূর এবং কেশব। অনুমান করা হয় যে এই তিনজন বৈয়াকরণ কাশিকাকার বামন ও জয়াদিত্যের পূর্ববর্তী

এবং বঙ্গদেশ নিবাসী ছিলেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর শ্রুতপালরচিত কুণ্ডলি নামে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং একটি পরিভাষা গ্রন্থের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। শ্রুতপালকে ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি এবং কাশিকাবৃত্তির রচয়িতা বামনের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়। তিনি বঙ্গীয় ছিলেন। এরপরেই যাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি হলেন ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি। কাশিকাবৃত্তির উপর রচিত তাঁর টীকাটির সম্পূর্ণ নাম হল কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা। ন্যাসকার বৌদ্ধ ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি জন্মসূত্রে বঙ্গীয় হয়ে থাকতে পারেন অথবা পালবংশের শাসনকালে কর্মসূত্রে বঙ্গনিবাসী ছিলেন। ন্যাসটীকার অনুসরণে রচিত অপর একটি টীকা হল মহান্যাস। উজ্জ্বলদত্ত এবং সর্বানন্দ তাঁদের গ্রন্থে এই টীকার উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পূর্বে এই টীকাটি রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয় এবং তা বঙ্গদেশে রচিত হয়েছিল। কারণ, উজ্জ্বলদত্ত, সর্বানন্দ প্রভৃতি পাণিনি পরম্পরার বঙ্গীয় বৈয়াকরণদের অতিরিক্ত অন্যান্য আচার্যদের রচনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়না। অষ্টাধ্যায়ীর উপর রচিত অপর একটি বৃত্তি হল ভাগবৃত্তি। এই গ্রন্থটির কর্তা কে, তা নিয়ে পণ্ডিত সমাজে মতভেদ রয়েছে। ভাগবৃত্তির রচনাকার রূপে ভর্তৃহরি, বিমলমতি, বাভট প্রভৃতি একাধিক নাম পাওয়া যায়। ফলে গ্রন্থটির যথার্থ রচয়িতা কে, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ভাগবৃত্তির কর্তৃত্ববিচারে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য[i] ও যুধিষ্ঠির মীমাংসকের[ii] মত দ্রষ্টব্য। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে ভাগবৃত্তির রচনাকার বঙ্গীয় ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে শ্রীধর ভাগবৃত্তির উপর একটি টীকা রচনা করেন। দ্বাদশ শতকের আচার্য পুরুষোত্তম দেবের রচনায় আমরা গোবর্ধন বিরচিত উণাদিবৃত্তির সপ্রশংস উল্লেখ পাই। এছাড়া শাস্ত্রী মহাশয় উপাধ্যায়সর্বস্ব নামে দামোদর সেন রচিত গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। এর অধ্যয়ন তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল। গোবর্ধন এবং দামোদর সেন এই দুইজন বঙ্গীয় আচার্যের কাল খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগ থেকে একাদশ শতকের প্রথমভাগ বলে অনুমান করা হয়। এই পরম্পরার আরেকজন উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ ছিলেন ধরণিধর। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম হল ব্যাকরণসর্বস্ব। আচার্য ধরণিধর বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভারত্ন হলায়ুধের পূর্ববর্তী ছিলেন। বঙ্গদেশে পাণিনীয় পরম্পরার অপর একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন মৈত্রেয় রক্ষিত। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগ তাঁর সময়কাল রূপে বিবেচিত হয়। ন্যাসের উপর রচিত তাঁর বিখ্যাত টীকাটির নাম হল তন্ত্রপ্রদীপ। এছাড়া পাণিনীয় ধাতুপাঠের উপর তিনি ধাতুপ্রদীপ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন ও অধ্যাপন তৎকালীন বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পুরুষোত্তম দেব প্রভৃতি পরবর্তী আচার্যগণের রচনায় এই গ্রন্থগুলির পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা নিজ গ্রন্থে ব্যাকরণের আলোচনায় বহু প্রসঙ্গে মৈত্রেয় রক্ষিতের মতকে উদ্ধৃত করেছেন। ‘তন্ত্রপ্রদীপ’[iii] ও ‘ধাতুপ্রদীপ’[iv] এই দুইটি গ্রন্থই বর্তমানে প্রকাশিত আকারে পাওয়া যায়। তবে পর্যাপ্ত টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের অভাবে ও অধ্যাপন পরম্পরায় বর্তমানে অপ্রচলিত হওয়ায় এই গ্রন্থদুটির উপর যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণাকার্য হয়নি। মৈত্রেয় রক্ষিত একটি দুর্ঘটবৃত্তি রচনা করেছিলেন। উজ্জ্বল দত্ত তাঁর উণাদিবৃত্তিতে এই গ্রন্থটির আলোচনাকে উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া সীরদেব রচিত বৃহৎ পরিভাষাবৃত্তি থেকে মৈত্রেয় রক্ষিতকৃত একটি মহাভাষ্য ব্যাখ্যার কথাও জানা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় তন্ত্রপ্রদীপের উপর রচিত তিনটি টীকার উল্লেখ করেছেন। যথা:

---

[i] দ্র: ‘পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্’, সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ভূমিকাভাগ।

[ii] দ্র: ভাগবৃত্তিসঙ্কলনম্, সঙ্কলক: মীমাংসক, যুধিষ্ঠির. (২০০৪)। সোনীপত, হরিয়াণা: প্রকাশক রামলাল কপূর ট্রাস্ট।

[iii] দ্র: তন্ত্রপ্রদীপ, মৈত্রেয়রক্ষিত, সম্পা: সাধুখাঁ, সঞ্জিতকুমার ও সরকার, সাধনা. (২০১৮)। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

[iv] দ্র: ধাতুপ্রদীপ, মৈত্রেয়রক্ষিত, সম্পা: চক্রবর্তী, এস.সি. (১৯১৯)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি।

- সনাতনতর্কাচার্য কৃত তন্ত্রপ্রদীপপ্রভা।
- নন্দনন্যায়বাগীশ কৃত তন্ত্রপ্রদীপোদ্দোতন।
- তন্ত্রপ্রদীপালোক।

এই টীকাগুলি বর্তমানে অনুপলব্ধ।

দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন পুরুষোত্তম দেব। তাঁর রচিত ভাষাবৃত্তি, পরিভাষাবৃত্তি, জ্ঞাপকসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলির চর্চা সেইসময় ও পরবর্তী বঙ্গে সুপ্রচলিত ছিল। ১৮৩৫ সালে অ্যাডামসের সেকেণ্ড রিপোর্ট অনুসারে[v] বঙ্গদেশের সংস্কৃত পাঠশালাগুলিতে পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রাথমিক গ্রন্থ হিসাবে ভাষাবৃত্তি পড়ানো হোতো। বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভারত্ন ছিলেন শরণদেব। তিনি দুর্ঘটবৃত্তির রচনাকার রূপে সুপ্রসিদ্ধ। শরণদেবকৃত এই দুর্ঘটবৃত্তির সংস্কর্তা ছিলেন সর্বরক্ষিত। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে উজ্জ্বলদত্ত উণাদিবৃত্তি রচনা করেন। এরপরেই ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে সীরদেবের আবির্ভাব হয়। পুরুষোত্তম দেব-পরবর্তী এই আচার্য বৃহৎপরিভাষাবৃত্তি নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। পুরুষোত্তম দেবের রচনা থেকে অনুন্যাস টীকাটির কথা জানা যায়। এই টীকাটি ন্যাসের উপর রচিত এবং গ্রন্থকর্তা হলেন ইন্দুমিত্র। তিনি অষ্টাধ্যায়ীর উপর ইন্দুমতী নামে একটি বৃত্তিও রচনা করেছিলেন। এই দুইটি গ্রন্থই অনুপলব্ধ, পরবর্তী আচার্যদের গ্রন্থে তাদের প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতিমাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেছে। বৃদ্ধন্যাস নামে একটি টীকার কথাও শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক বা তার পূর্বে এটি রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

এইভাবে উপরের আলোচনায় শীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুসরণ করে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে পাণিনীয় ব্যাকরণের চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে তুলে ধরা হল।[vi]

২. বঙ্গে পাণিনি ব্যাকরণের পরম্পরায় আচার্য পুরুষোত্তম দেব

পাণিনীয় ব্যাকরণের বঙ্গীয় শাখার বিশিষ্ট আচার্য ছিলেন পুরুষোত্তম দেব। কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা বা ন্যাসকে অবলম্বন করে তৎকালীন বঙ্গদেশে যে গ্রন্থরচনা-পরম্পরার জন্ম হয়েছিল, পুরুষোত্তম দেব ছিলেন তার অন্যতম ধারক ও বাহক।

পরবর্তীলের বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্যগণ তাঁকে কেবল ‘দেব’ নামে উদ্ধৃত করেছেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে পরিভাষাবৃত্তির সমাপ্তিতে লেখা হয়েছে—“ইতি বৈয়াকরণগজপঞ্চাননশ্রীপুরুষোত্তম দেববিরচিতা ললিতাখ্যা পরিভাষা [- বৃত্তিঃ] সমাপ্তা।”[vii]

---

[v] ‘Adam William Second Report (1835) on the state of education in Bengal’, (1836). Rajshahi.

[vi] দ্র: ‘Bengal`s Contribution to Sanskrit Grammar’, শাস্ত্রী, কালিচরণ. (১৯৭২) ক্যালকাটা।

[vii] ‘পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্’, সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, পৃ. ৫৬।

এই পুষ্পিকাটি থেকে বোঝা যায় যে 'বৈয়াকরণগজপঞ্চানন'- এটি পুরুষোত্তম দেবের একটি উপাধি ছিল। কারকচক্র গ্রন্থটির পুষ্পিকাতে লেখা হয়েছে – 'ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীপুরুষোত্তম দেববিরচিত-কারকচক্রং সমাপ্তম্।'[viii]
এর থেকে অনুমান করা যায়, তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতেও বিভূষিত ছিলেন।

২.১ নিবাস

পুরুষোত্তম দেবের জন্মস্থান কোনটি, সেই বিষয়ে কোনো সংশয়াতীত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হল, আচার্য পুরুষোত্তম দেব তাঁর গ্রন্থে নিজের প্রকৃত জন্মস্থান বা বংশপরিচয়ের উল্লেখ করেননি। তাঁর সমকালিক বা পরবর্তী গ্রন্থকারগণও এই বিষয়ে নীরব থেকেছেন। এক্ষেত্রে যে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রমাণগুলি পাওয়া যায়, তা থেকে তাঁর নিবাস সম্পর্কে অনুমান করা গেলেও আচার্যের প্রকৃত জন্মভূমি কোনটি ছিল, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। পুরুষোত্তম দেব রচিত গ্রন্থগুলি থেকে যে অন্তরঙ্গ প্রমাণগুলি পাওয়া যায়, তার আধারে প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করেছেন যে বৈয়াকরণাচার্য পুরুষোত্তম দেব বঙ্গীয় ছিলেন। ভাষাবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থে যে উদাহরণগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অধিকাংশই বঙ্গসংস্কৃতির সাথে জড়িত। পুরুষোত্তম দেবের রচনায় বঙ্গদেশের ভাষা, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ছাপ সম্যক রূপে পরিস্ফুট, যা সেই প্রদেশের সাথে নিবিড় আত্মীয়তা ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্' নামক গ্রন্থটির ভূমিকাভাগে তিনি এই বিষয়ে যুক্তি সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[ix] পুরুষোত্তম দেব বঙ্গাধিপতি লক্ষণ সেনের সমসাময়িক ছিলেন। লক্ষণ সেনের অনুরোধে পাণিনীয় ব্যাকরণে সরল প্রবেশের জন্য তিনি ভাষাবৃত্তি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু লক্ষণ সেনের রাজত্বের সীমা বঙ্গদেশ, উৎকল ও মিথিলার অংশবিষেষ নিয়ে বৃহদ বঙ্গ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল। ফলে এই তিনটি প্রদেশের মধ্যে কোনটি পুরুষোত্তম দেবের জন্মস্থান ছিল, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়না। কিন্তু একথাটিও সত্য যে তাঁর লেখনী বঙ্গীয় ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। জন্মভূমিরূপে হোক বা কর্মভূমিরূপে, বঙ্গদেশের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। এইকারণেই নিজগ্রন্থে পুরুষোত্তম দেব তাঁর সমকালিক ও পূর্ববর্তী বঙ্গীয় বৈয়াকরণদের উল্লেখ প্রধানভাবে করেছেন। মৈত্রেয় রক্ষিতের মতো আচার্যদের মত তিনি বারবার উদ্ধৃত করেছেন। একইভাবে বহিরঙ্গ প্রমাণগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ন্যাসপরম্পরার পুরুষোত্তদেব-পরবর্তী বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ তাঁর গ্রন্থগুলির দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত ছিলেন। ভাষাবৃত্তি, পরিভাষাবৃত্তি, জ্ঞাপকসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলির পঠনপাঠন বঙ্গদেশেই বেশি প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে উৎকলপ্রদেশ বা মিথিলায় এই গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনক্ষেত্রেও এই গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশের বাইরে অন্যত্র অপ্রচলিত ছিল। এই সকল প্রমাণগুলিই বঙ্গদেশের সাথে তাঁর সুদৃঢ় যোগের সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত গবেষক হর্ষনাথ মিশ্র মহাশয় তাঁর গবেষণাগ্রন্থে বলেছেন – "যত্তু লক্ষণসেনস্য রাজ্যং মিথিলাপর্যন্তং বিস্তৃতমাসীৎ। অতঃ পুরুষোত্তম দেবস্য মৈথিলত্বমপি সম্ভাব্যতে বকারবকারয়োরুচ্চারণে লেখে চ প্রাচীনমৈথিলপণ্ডিতা অপি প্রমাদ্যন্তি

viii 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, পৃ. ১১৯।

ix দ্র: 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ভূমিকাভাগ, পৃ. ৩২-৩৩।

ইতি তন্ন, অন্যপ্রমাণপ্রতিকূলত্বাৎ। তেন ন কিমপ্যুদাহরণং তথা দত্তং বাক্যং চ লিখিতমেকমপি, যেন তস্য মিথিলাং প্রতি মাতৃ-ভূ-ভাবনাঽনুমেয়া স্যাৎ। অথ চ দৃশ্যতে বঙ্গপ্রান্তং প্রতি তস্য বিশেষস্নেহঃ।...”[x]

২.২ কাল

আচার্য পুরুষোত্তম দেব বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ছিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের অনুরোধে তিনি ভাষাবৃত্তি রচনা করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের অন্তিম চরণ থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম চরণ পর্যন্ত সময়কাল পুরুষোত্তম দেবের সময় রূপে বিবেচনা করা উচিৎ। তাঁর মতে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে পুরুষোত্তম দেব তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির রচনা করেছিলেন।

২.৩ ধর্ম

বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ পুরুষোত্তম দেবকে বৌদ্ধ আচার্যরূপে উল্লেখ করেছেন। ভাষাবৃত্তি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণশ্লোকে গ্রন্থকার ভগবান্ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছেন–

“নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথা ত্রিমুনিলক্ষণম্।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তির্বিধীয়তে।।”[xi]

কারকচক্র গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলা হয়েছে–

“মুনিং প্রণম্য সর্বজ্ঞং সর্বজ্ঞানপ্রকাশকম্।
বালানাং কথ্যতেঽর্থায় ময়া কারকচক্রম্।।”[xii]

অমরকোষ অনুসারে সর্বজ্ঞ শব্দটি ভগবান্ বুদ্ধের পর্যায়বাচক।

“সর্বজ্ঞ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগত।
সমন্তভদ্রো ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিন।।”[xiii]

মহাভাষ্যের উপর রচিত প্রাণপণা নামক টীকাটিতেও আচার্য পুরুষোত্তম দেব তথাগতকেই স্মরণ করেছেন।

“নমো বুধায় বুদ্ধায় যথা ত্রিমুনিলক্ষণম্।
বিধীয়তে প্রাণপণা ভাষায়াং লঘুবৃত্তিকা।।”[xiv]

---

[x] দ্র: ‘চান্দ্রব্যাকরণবৃত্তেঃ সমালোচনাত্মকমধ্যয়নম্’, মিশ্র, হর্ষনাথ. নিউ দিল্লী: শ্রীলালবাহাদুরশাস্ত্রীকেন্দ্রীয়সংস্কৃতবিদ্যাপীঠম্, পৃ. ৩৮।

[xi] ভাষাবৃত্তিঃ, পুরুষোত্তমদেব, সম্পা: চক্রবর্তী, এস.সি. (১৯১৮)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, পৃ. ১।

[xii] ‘পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্’, সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, পৃ. ১০১।

[xiii] অমরকোষঃ, সম্পা: পণ্ডিত শাস্ত্রী, হরগোবিন্দ. (১৯৯৭)। বারাণসী: চৌখাম্বাসংস্কৃতসংস্থান, প্রথম কাণ্ড, স্বর্গবর্গ, শ্লোক. ১৩।

[xiv] দ্র: ‘পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্’, সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, পৃ. ১২০।

ভাষাবৃত্তিগ্রন্থে প্রযুক্ত উদাহরণগুলি অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মবিষয়ক। এই ক্ষেত্রে কাশিকাবৃত্তির সাথে ভাষাবৃত্তির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন–

সূত্র – 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'।
- মাণবকায় ভিক্ষাং দদাতি। উপাধ্যায়ায় গাং দদাতি। (কাশিকাবৃত্তির উদাহরণ)
- প্রণম্য শাস্ত্রে সুগতায় তায়িনে।[xv] (ভাষাবৃত্তির উদাহরণ)

সূত্র – 'সুপ্ প্রতিনা মাত্রার্থে'।
শাকপ্রতি, সুপপ্রতি। (কাশিকাবৃত্তির উদাহরণ)
ন সুখপ্রতি সংসারে। ন দোষপ্রতি বৌদ্ধদর্শনে।[xvi] (ভাষাবৃত্তির উদাহরণ)

সূত্র – 'বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্'।
বোধিসত্তো মহাসত্ত্বঃ।[xvii] (ভাষাবৃত্তির প্রয়োগ)

এই উদাহরণটির প্রসঙ্গে গবেষক হর্ষনাথ মিশ্র মহাশয় লিখেছেন—"অত্র বোধিসত্ত্বস্য মহাসত্ত্বত্বপ্রতিপাদনমপি বোধিসত্ত্বমহাত্ম্যখ্যাপনপরং তস্য বৌদ্ধত্বধ্বননহেতুঃ।"[xviii]

গবেষক নরেন্দ্রকুমার দাস মহাশয় তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বিবিধ যুক্তিসহকারে পুরুষোত্তম দেবের বৌদ্ধত্বের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর মতে আচার্যের দেব পদবীটি তাঁর ব্রাহ্মণত্বের সূচক। অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও নিজের পদবী তিনি ত্যাগ করেননি।[xix]

২.৪ পুরুষোত্তম দেব বিরচিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

২.৪.১ ভাষাবৃত্তি

মহর্ষি পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ীর উপর রচিত একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এর অপর নাম হল লঘুবৃত্তি। পাণিনির বৈদিক স্বরসাধক ও বৈদিক প্রয়োগসাধক সূত্রগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র লৌকিক প্রয়োগসাধক সূত্রগুলিকেই এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৪.২ পরিভাষাবৃত্তি

আচার্য পুরুষোত্তম দেবের পরিভাষাবিষয়ক গ্রন্থটির নাম পরিভাষাবৃত্তি। এর অপর নাম ললিতাবৃত্তি। পণ্ডিতদের মতে পুরুষোত্তম দেব রচিত পরিভাষাবৃত্তির মূল আধার হল ব্যাড়িয় পরিভাষাবৃত্তি।

[xv] ভাষাবৃত্তিঃ, পুরুষোত্তমদেব, সম্পা: চক্রবর্তী, এস.সি. (১৯১৮)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ভাষাবৃত্তি. ১/৪/৩২।

[xvi] ভাষাবৃত্তিঃ, পুরুষোত্তমদেব, সম্পা: চক্রবর্তী, এস.সি. (১৯১৮)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ভাষাবৃত্তি. ২/১/৯।

[xvii] ভাষাবৃত্তিঃ, পুরুষোত্তমদেব, সম্পা: চক্রবর্তী, এস.সি. (১৯১৮)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ভাষাবৃত্তি. ২/১/৫৭।

[xviii] দ্র: 'চান্দ্রব্যাকরণবৃত্তেঃ সমালোচনাত্মকমধ্যয়নম্', মিশ্র, হর্ষনাথ. নিউ দিল্লী: শ্রীলালবাহাদুরশাস্ত্রীকেন্দ্রীয়সংস্কৃতবিদ্যাপীঠম্, পৃ. ৩৭।

[xix] 'Puurusottamadeva As Grammarian', দাশ, নরেন্দ্রকুমার. (১৯৯১)। দিল্লী: আগম কলা প্রকাশন, পৃ. ৬৫।

জ্ঞাপকসমুচ্চয়—এই গ্রন্থে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রোক্ত বিভিন্ন জ্ঞাপকগুলির আধারে জ্ঞাপকজ্ঞাপিত বাক্যগুলিকে পৃথক সংকলন করে তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৪.৩ কারকচক্র

এই গ্রন্থটিতে কারকসমূহের দার্শনিকবিবেচন করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল আধার হল ভর্তৃহরি বিরচিত বাক্যপদীয়।

২.৪.৪ প্রাণপণা

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর রচিত সংক্ষিপ্ত টীকাগ্রন্থ। প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

২.৪.৫ দুর্ঘটবৃত্তি

যুধিষ্ঠিরমীমাংসকমহাশয় তাঁর গ্রন্থে পুরুষোত্তম দেবকৃত দুর্ঘটবৃত্তির উল্লেখ করেছেন।[xx]

২.৪.৬ গণবৃত্তি

ভাষাবৃত্তির সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকাভাগে পুরুষোত্তম দেব রচিত গণবৃত্তির উল্লেখ করেছেন।[xxi]

২.৪.৭ উণাদিবৃত্তি

মহর্ষি পাণিনি কৃত উণাদিপাঠের উপর রচিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তিগ্রন্থ। যুধিষ্ঠিরমীমাংসক মহাশয় তাঁর গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।[xxii]

২.৪.৮ কারককারিকা

'New Catalogos Catalogorum'-এ কারককারিকা নামে দুটি পাণ্ডুলিপির বিবরণ পাওয়া যায়। কে.বী. অভ্যঙ্করের মতে কারককারিকা কোনো ভিন্ন গ্রন্থ নয়, পুরুষোত্তম দেব কৃত কারকচক্র গ্রন্থটিরই নামান্তর।

২.৪.৯ দশবলকারিকা

শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পুরুষোত্তম দেব কৃত এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।[xxiii]

[xx] 'সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র কা ইতিহাস'(দ্বিতীয়ভাগ),মীমাংসক, যুধিষ্ঠির. (১৯৮৪)। হরিয়াণা, পৃ. ৫২৬।

[xxi] ভাষাবৃত্তিঃ, পুরুষোত্তমদেব, সম্পা: চক্রবর্তী, এস.সি. (১৯১৮)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ভূমিকা, পৃ. ১।

[xxii] 'সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র কা ইতিহাস'(দ্বিতীয়ভাগ), মীমাংসক, যুধিষ্ঠির. (১৯৮৪)। হরিয়াণা, পৃ. ২২১-২২২।

[xxiii] ভাষাবৃত্তিঃ, পুরুষোত্তমদেব, সম্পা: চক্রবর্তী, এস.সি. (১৯১৮)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ভূমিকা, পৃ. ১।

২.৪.১০ কুণ্ডলীব্যাখ্যান

এটি শ্রুতপাল প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা। যুধিষ্ঠিরমীমাংসক মহাশয় তাঁর গ্রন্থে পুরুষোত্তম দেবের এই কৃতিটির উল্লেখ করেছেন।[xxiv]

৩. জ্ঞাপকসমুচ্চয়

আচার্য পুরুষোত্তম দেব বিরচিত তৃতীয় গ্রন্থটির নাম হল *জ্ঞাপকসমুচ্চয়।* অনেক পণ্ডিত এই গ্রন্থটিকে পুরুষোত্তম দেবের দ্বিতীয় গ্রন্থ পরিভাষাবৃত্তির বিস্তার বলে মনে করে থাকেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর দ্বারা সম্পাদিত 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্' শীর্ষক গ্রন্থে জ্ঞাপকসমুচ্চয়কে পৃথক্ রচনা রূপে প্রকাশিত করেন। যদিও পরিভাষাসূত্রগুলির উপর বহুবিধ গবেষণা তথা সমীক্ষা ইতিপূর্বে পাওয়া যায় কিন্তু পাণিনীয় সূত্র-বৃত্তি-ভাষ্য-স্থিত সকল জ্ঞাপকগুলিকে সংকলন করে তাদের উপর বিস্তৃত ব্যাখ্যাযুক্ত গ্রন্থ অতি দুর্লভ। সেই দিক থেকে এই গ্রন্থটিকে জ্ঞাপকের সংকলনের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়াস বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থটি মূলত অষ্টাধ্যায়ী-স্থিত জ্ঞাপক তথা জ্ঞাপকসিদ্ধ বচনের একটি বৃহৎ সংগ্রহ। বিভিন্ন পূর্বাচার্যদের মতের উল্লেখের পাশাপাশি স্বকীয় যুক্তির দ্বারা তিনি এখানে জ্ঞাপকসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটিতে প্রায় ৪০০ এর অধিক জ্ঞাপক তথা তাদের দ্বারা জ্ঞাপিত ২১২টি জ্ঞাপকসিদ্ধবচনের সংগ্রহ রয়েছে।

৩.১ অধ্যায়বিভাজন

জ্ঞাপকসমুচ্চয় গ্রন্থটিতে অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে সূত্রকার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমকেই অনুসরণ করা হয়েছে। অষ্টাধ্যায়ীর অধ্যায় ও পাদের ক্রমানুসারে এই গ্রন্থটিতেও ৮টি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায়ে চারটি করে পাদ রয়েছে। ফলে পাদের মোট সংখ্যা ৩২। এখানে লক্ষণীয় যে জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে প্রতিটি পাদের নামকরণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অষ্টাধ্যায়ীর প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রতিটি পাদের প্রথম সূত্রানুসারে সেই পাদের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- কুটাদিপাদ, ভূপাদ, কারকপাদ, সমর্থপাদ, অনভিহিতপাদ, দ্বিগুপাদ ইত্যাদি। বিক্রমপূর্ব পঞ্চদশ শতকের পূর্বে প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে অধ্যায়বিভাজনের ক্ষেত্রে এইরূপ নামকরণের ব্যবহার দেখা যায়। পুরুষোত্তম দেব-পরবর্তী সীরদেবের বৃহৎপরিভাষাবৃত্তি গ্রন্থেও এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে। জ্ঞাপকের বর্গীকরণের ক্ষেত্রে আচার্যের এই শৈলীটিও লক্ষণীয় যে জ্ঞাপকসিদ্ধবচনগুলির জ্ঞাপক সূত্র বা সূত্রাংশটি অষ্টাধ্যায়ীর যে অধ্যায়ের যে পাদে পঠিত হয়েছে, জ্ঞাপকসমুচ্চয়েও তদ্জ্ঞাপিত বচনটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সেই অধ্যায় ও পাদের ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- 'তরপ্তমপৌ ঘঃ' এই সূত্রটি অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে অবস্থিত। এই সূত্রটির দ্বারা জ্ঞাপিত বাক্যটি হল- 'প্রকর্ষার্থমন্তরেণ ক্বচিৎস্বার্থেঽপি তরবস্তি'। জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে পুরুষোত্তম দেব জ্ঞাপকসূত্রটির অধ্যায় ও পাদের ক্রমানুসারে এই বচনটিকে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে আলোচনা করেছেন।

[xxiv] 'সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র কা ইতিহাস'(দ্বিতীয়ভাগ), মীমাংসক, যুধিষ্ঠির. (১৯৮৪)। হরিয়াণা, পৃ. ৪৩০।

৩.২ জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে অধ্যায় ও পাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অধ্যায় ও পাদের নাম	যে সূত্রটি অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে	জ্ঞাপকসিদ্ধবচনের মোট সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়-প্রথম পাদ	কোনো নামকরণ করা হয়নি	১৭টি
প্রথম অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	কুটাদিপাদ- 'গাঙ্কুটাদিভ্যোঽঞ্ণিন্ঙিত্' (পাণিনি-১/২/১)	১১টি
প্রথম অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	ভূপাদ- 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' (পাণিনি-১/৩/১)	৬টি
প্রথম অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	কারকপাদ- 'কারকে' (পাণিনি-১/৪/২৩)- এক্ষেত্রে চতুর্থ পাদের প্রথম সূত্রটি অনুসারে নামকরণ করা হয়নি।	৬টি
দ্বিতীয় অধ্যায়-প্রথম পাদ	সমর্থপাদ- 'সমর্থঃ পদবিধিঃ' (পাণিনি-২/১/১)	৩টি
দ্বিতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	অপরপাদ- 'পূর্বোপরাধরোত্তরমেকদেশিনৈকাধিকরণে' (পাণিনি-২/২/১)	৭টি
দ্বিতীয় অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	অনভিহিতপাদ- 'অনভিহিতে' (পাণিনি-২/৩/১)	৫টি
দ্বিতীয় অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	দ্বিগুপাদ- 'দ্বিগুরেকবচনম্' (পাণিনি-২/৪/১)	৭টি
তৃতীয় অধ্যায়-প্রথম পাদ	প্রত্যয়পাদ- 'প্রত্যয়ঃ' (পাণিনি-৩/১/১)	১৯টি
তৃতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	কর্মণিপাদ- 'কর্মণ্যণ্' (পাণিনি-৩/২/১)	৮টি
তৃতীয় অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	বহুলপাদ- 'উণাদয়ো বহুলম্' (পাণিনি-৩/৩/১)	৭টি
তৃতীয় অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	ধাতুসম্বন্ধপাদ- 'ধাতুসম্বন্ধে প্রত্যয়াঃ' (পাণিনি-৩/৪/১)	৬টি
চতুর্থ অধ্যায়-প্রথম পাদ	ঙ্যাপ্পাদ- 'ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাত্' (পাণিনি-৪/১/১)	৩টি
চতুর্থ অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	রক্তপাদ- 'তেন রক্তং রাগাত্' (পাণিনি-৪/২/১)	৩টি
চতুর্থ অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	যুষ্মৎপাদ- 'যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্ চ' (পাণিনি-৪/৩/১)	২টি
চতুর্থ অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	ঠক্পাদ- 'প্রাগ্বহতেষ্ঠক্' (পাণিনি-৪/৪/১)	৫টি
পঞ্চম অধ্যায়-প্রথম পাদ	ক্রীতপাদ- 'প্রাক্ ক্রীতাচ্ছঃ' (পাণিনি-৫/১/১)	১টি
পঞ্চম অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	ধান্যপাদ- 'ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্' (পাণিনি-৫/২/১)	৩টি
পঞ্চম অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	বিভক্তিপাদ- 'প্রাগ্দিশো বিভক্তিঃ' (পাণিনি-৫/৩/১)	১টি
পঞ্চম অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	শতপাদ- 'পাদশতস্য সংখ্যাদের্বীপ্সায়াং বুন্ লোপশ্চ' (পাণিনি-৫/৪/১)	১টি
ষষ্ঠ অধ্যায়-প্রথম পাদ	একাচ্পাদ- 'একাচো দ্বে প্রথমস্য' (পাণিনি-৬/১/১)	১৭টি

ষষ্ঠ অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	বহুব্রীহিপাদ- 'বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্' (পাণিনি-৬/২/১)	১টি
ষষ্ঠ অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	অলুক্পাদ- 'অলুগুত্তরপদে' (পাণিনি-৬/৩/১)	৫টি
ষষ্ঠ অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	অঙ্গপাদ- 'অঙ্গস্য' (পাণিনি-৬/৪/১)	১৬টি
সপ্তম অধ্যায়-প্রথম পাদ	যুবপাদ- 'যুবরনাকৌ' (পাণিনি-৭/১/১)	৪টি
সপ্তম অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	সিচিপাদ- 'সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' (পাণিনি-৭/২/১)	৯টি
সপ্তম অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	দেবিকাপাদ- 'দেবিকাশিংশপাদিত্যবাড্দীর্ঘসত্রশ্রেয়সামাত্' (পাণিনি-৭/৩/১)	১৫টি
সপ্তম অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	ণৌপাদ- 'ণৌ চঙ্ব্যুপধায়া হ্রস্বঃ' (পাণিনি-৭/৪/১)	৩টি
অষ্টম অধ্যায়-প্রথম পাদ	সর্বপাদ- 'সর্বস্য দ্বে' (পাণিনি-৮/১/১)	৩টি
অষ্টম অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ	অসিদ্ধপাদ- 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' (পাণিনি-৮/২/১)	৪টি
অষ্টম অধ্যায়-তৃতীয় পাদ	মতুপ্পাদ- 'মতুবসো রু সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি' (পাণিনি-৮/৩/১)	৭টি
অষ্টম অধ্যায়-চতুর্থ পাদ	রেফপাদ- 'রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে' (পাণিনি-৮/৪/১)	৭টি

৩.৩ জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের উপলব্ধসংস্করণ

জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের মূল গ্রন্থটির একটিমাত্র প্রকাশিত ও উপলব্ধ সংস্করণ পাওয়া যায়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক এই ক্রিটিক্যাল অ্যাডিশনটি সম্পাদন করা হয়। পুরুষোত্তম দেব বিরচিত মহাভাষ্যের প্রাণপণা নামক টীকাটিও ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাত ধরেই প্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। তদ্বিষয়ক তাঁর গবেষণাপত্রটি 'INDIAN HISTORICAL QUARTERLY' নামক গবেষণাপত্রে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[xxv] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থটির নাম- 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্'। এই সংস্করণটিতে জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের সাথে পুরুষোত্তম দেবের আরো তিনটি গ্রন্থের সম্পাদনা করা হয়েছে। এগুলি হল, পরিভাষাবৃত্তি, কারকচক্র এবং মহাভাষ্যের প্রাণপণাটীকা। এই টীকাটির সাথে শঙ্কর ও মণিকণ্ঠ কৃত ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যব্যাখ্যাপ্রপঞ্চ নামক ব্যাখ্যাটির উপলব্ধ অংশগুলিও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

[xxv] 'Purusottamadeva`s Commentary On The Mahabhasya', Bhattacharya, Dinesh .Chandra. (September, 1943). The Indian Historical Quarterly, Vol. Xix, No.3, P-201.

৩.৪ জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে বর্ণিত জ্ঞাপকসিদ্ধবচনের উদাহরণ

জ্ঞাপকসিদ্ধ বচন	জ্ঞাপক সূত্র বা সূত্রাংশ	অধ্যায় ও পাদের নাম
প্রকর্ষার্থমন্তরেণ ক্বচিদ্ স্বার্থেঽপি তরবন্তি।	'তরপ্তমপৌ ঘঃ' (পাণিনি-১/১/২২)	প্রথম অধ্যায়-প্রথম পাদ
ভবন্তি অব্যয়াত্ স্বাদয়ঃ।	'অব্যয়াদাপ্ সুপঃ' (পাণিনি-২/৪/৮২)	দ্বিতীয় অধ্যায়-চতুর্থ পাদ(দ্বিগুপাদ)
ক্রিয়ার্থায়াং ক্রিয়ায়ামুপপদে বাসরূপেণ তৃজাদয়ো ন ভবন্তি।	'ণ্বুল্তৃচৌ' (পাণিনি-৩/১/১৩৩)	তৃতীয় অধ্যায়-তৃতীয় পাদ(বহুলপাদ)
অপত্যাধিকারে গোত্রশ্রুত্যা লৌকিকগোত্রং ন গৃহ্যতে।	'গোত্রোক্ষোষ্ট্রোরভ্ররাজরাজন্যরাজপুত্রবৎসমনু-ষ্যাজাদ্বুঞ্' (পাণিনি-৪/২/৩৯)	চতুর্থ অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ(রক্তপাদ)
কর্তৃকর্মণোঃ কৃতীতি সূত্রমনিত্যম্।	'তদর্হম্' (পাণিনি-৫/১/১১৭)	পঞ্চম অধ্যায়-প্রথম পাদ(ক্রীতপাদ)
ক্বিবন্তা ধাতুত্বং ন জহতি।	'অত্বসন্তস্য চাঽধাতোঃ' (পাণিনি-৬/৪/১৪)	ষষ্ঠ অধ্যায়-চতুর্থ পাদ(অঙ্গপাদ)
অধাতুভূতপূর্বস্যাপি যথা স্যাত্।	'উগিদচাং সর্বনামস্থানেঽধাতোঃ' (পাণিনি-৭/১/৭০)	সপ্তম অধ্যায়-প্রথম পাদ(যুবপাদ)
নুম্ অভক্তোঽস্তি।	'প্রাতিপদিকান্তনুম্বিভক্তিষু চ' (পাণিনি-৮/৪/১১)	অষ্টম অধ্যায়-চতুর্থ পাদ(রেফপাদ)

৩.৫ জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে বর্ণিত জ্ঞাপকসিদ্ধবচনগুলির উৎসস্থল

জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে ব্যাখ্যাত ৬২টি জ্ঞাপকের উল্লেখ সর্বপ্রথম মহাভাষ্যে পাওয়া যায়। এর অতিরিক্ত ২১টি জ্ঞাপকের উল্লেখ কাশিকাবৃত্তিতে রয়েছে। ২৪টি জ্ঞাপকের উৎসস্থল হল কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা বা ন্যাসটীকা এবং ৯টি জ্ঞাপকের উল্লেখ কৈয়ট রচিত মহাভাষ্যপ্রদীপটীকাতে পাওয়া যায়। তিনটি জ্ঞাপক অনুন্যাস[xxvi] থেকে, ৮টি জ্ঞাপক মৈত্রেয়রক্ষিত রচিত তন্ত্রপ্রদীপ থেকে এবং একটি জ্ঞাপক ভাগবৃত্তি[xxvii] থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নৈর্লুরীবৃত্তি[xxviii] থেকে একটি, দ্বিসূত্রী[xxix] থেকে একটি, একটি অনুপদ[xxx] থেকে এবং ধাতুপারায়ণ[xxxi] নামক গ্রন্থ থেকে ৫টি জ্ঞাপককে

[xxvi] 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ৩৫, ৪৬, ৫৮।

[xxvii] 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ১২।

[xxviii] 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ১৫৭।

[xxix] 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ৬৫।

[xxx] 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ৪৬.১।

[xxxi] 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ১৮, ১৫১, ২১১।

নেওয়া হয়েছে। পুরুষোত্তম দেব-পূর্ববর্তী আচার্য ব্যাডি কৃত ‘পরিভাষাসূচনম্’ নামক গ্রন্থটিতে ৬টি জ্ঞাপকের[xxxii] উল্লেখ রয়েছে। ‘ক্বিবন্তা ধাতুত্বং ন জহতি’- এই জ্ঞাপকটির উল্লেখ ব্যাডীয়-পরিভাষাপাঠে রয়েছে। জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে ব্যাখ্যাত ৫টি জ্ঞাপককে[xxxiii] সীরদেব, নাগেশভট্ট প্রভৃতি পুরুষোত্তম দেব-পরবর্তী আচার্যগণ নিজগ্রন্থে পরিভাষারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পুরুষোত্তম দেব ও তাঁর পূর্ববর্তী আচার্যেরা এদের কেবলমাত্র জ্ঞাপকরূপেই বর্ণনা করেছেন। জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে বর্ণিত ৮টি জ্ঞাপকের মূল আধার হল মহাভাষ্যস্থিত ইষ্টিসমূহ।[xxxiv] গ্রন্থটিতে এমন ৬টি জ্ঞাপকের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের দ্বারা দুটি করে পক্ষ জ্ঞাপিত হয়েছে। যেমন-

পদসংস্কারমিদং ব্যাকরণম্।
বাক্যসংস্কারমিদং চেদং ব্যাকরণম্।
একান্তাঃ অনুবন্ধাঃ।
অনেকান্তাঃ অনুবন্ধাঃ।
আর্ধধাতুকে(পাণিনি.সূত্র-৬/৪/৪৬) ইতি পরসপ্তমী।
আর্ধধাতুকে(পাণিনি.সূত্র-৬/৪/৪৬) ইতি বিষয়সপ্তমী।

জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে সংকলিত ২১২টি জ্ঞাপকসিদ্ধবচনের মধ্যে ৪৪টি স্বয়ং পুরুষোত্তম দেবের মৌলিক উদ্ভাবন। যেমন,

যদা দ্বন্দ্বো বিরোধিনাং তদা একবদ্ভাবঃ।
প্রক্রিয়ারূপেঽপি ব্যাকরণে ক্বচিন্নিত্যশব্দাভ্যুপগমঃ স্বীক্রিয়তে।
ন প্রত্যয়লোপলক্ষণেন সিচ ঈডস্তি।
অভেদৈকত্বমপি বিভক্তীনামুৎপত্তিনিমিত্তম্।
সমর্থাধিকারেঽপি ন সুবন্তাত্ প্রত্যয়ঃ।
ঋকারাকারসমুদায়স্থানিকস্যাপি অণো রপরত্বমিষ্যতে।
ছান্দসাঃ অপি ভাষায়াং প্রযুজ্যতে।
পূর্বত্রাসিদ্ধত্বমনিত্যম্।
ইৎসংজ্ঞায়াং পূর্বত্রাসিদ্ধত্বং নাশ্রীয়তে। ইত্যাদি।

[xxxii] ‘পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্’, সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ১৪, ৩৪, ৩৭, ৩৫, ১৪৯, ১৫৩।

[xxxiii] ‘পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্’, সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ২০, ৩৩, ৯০,৯৪, ১৯০।

[xxxiv] ‘পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্’, সম্পা: ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, জ্ঞা.স. ১৩, ২৪, ৫১, ৮২, ১৫৬, ১৯৯, ১৩২, ১৪৪।

৩.৬ জ্ঞাপকসমুচ্চয় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মহত্ব

জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে ২১বার মহাভাষ্য, ১৭বার কাশিকাবৃত্তি, ১৭বার ন্যাসটীকা এবং ৩বার কৈয়টকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনুন্যাসের মত ৪বার এবং ৩বার ভাগবৃত্তিকে উদ্ধৃত করেছেন গ্রন্থকার। মৈত্রেয়রক্ষিতকে উদ্ধৃত করেছেন ৯বার। এছাড়া নৈর্লুরীবৃত্তি এবং রূপাবতার গ্রন্থদুটিকেও উদ্ধৃত করেছেন পুরুষোত্তম দেব। জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে পারায়ণিক এবং অনুপদকার এই দুইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে অনুন্যাস গ্রন্থটি ইন্দুমিত্র কর্তৃক রচিত। ভাগবৃত্তি এবং নৈর্লুরীবৃত্তি এই দুটি অষ্টাধ্যায়ীর উপর রচিত বৃত্তিগ্রন্থ। কিন্তু দুইটি রচনাই বর্তমানে অনুপলব্ধ। নৈর্লুরীবৃত্তিকে কাশিকাবৃত্তির থেকেও প্রাচীন বলে মনে করা হয় এবং ভাগবৃত্তি কাশিকা-উত্তরবর্তী গ্রন্থ। অষ্টাধ্যায়ীর উপর রচিত সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি প্রক্রিয়ানুসারী গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন হল রূপাবতার। এর রচয়িতা হলেন বৌদ্ধ আচার্য ধর্মকীর্তি। কাশিকাবৃত্তির প্রারম্ভে নামপারায়ণ ও ধাতুপারায়ণ এই দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু উদ্ধৃতি ছাড়া মূল গ্রন্থ দুইটি এখনো পাওয়া যায়নি। জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে পারায়ণিক শব্দটির মাধ্যমে উল্লেখিত মতটি সম্ভবত ধাতুপারায়ণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অনুপদ নামক গ্রন্থটিও অধুনা অনুপলব্ধ। তন্ত্রপ্রদীপ, দুর্ঘটবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতিগুলির দ্বারা এই গ্রন্থটির প্রাচীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা হয়। অবলোকোপাধ্যায় এবং শশধর নামক দুইজন পণ্ডিতের মতের উল্লেখ পুরুষোত্তম দেব এখানে করেছেন। জ্ঞাপকসমুচ্চয়ে দ্বিসূত্রী গ্রন্থটির উদ্ধৃতিও পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞাপকসমুচ্চয় ছাড়া অন্যত্র কোনো গ্রন্থে পূর্বোক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের এবং দ্বিসূত্রী গ্রন্থটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না।

৩.৭ পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলিতে জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের উল্লেখ

সুভূতিচন্দ্র অমরকোশের টীকায়, শ্রীধর কাব্যপ্রকাশবিবেক নামক গ্রন্থে এবং বিরুপাক্ষ দেবীমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থের টীকায় জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের উল্লেখ করেছেন। শরণদেব তাঁর দুর্ঘটবৃত্তিতে জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের ৫বার উল্লেখ করেছেন।

৪. উপসংহার

জ্ঞাপকসমুচ্চয় ও আচার্য পুরুষোত্তম দেব বঙ্গে পাণিনীয় চর্চার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছেন। জ্ঞাপকসমুচ্চয় গ্রন্থটি যে কেবলমাত্র জ্ঞাপকের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি পৃথক্ প্রয়াস রূপে চিহ্নিত, তাই নয়, এই গ্রন্থটির ব্যাকরণগত গুরুত্বের পাশাপাশি ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। বহু লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ ও তাদের আলোচনাকে জ্ঞাপকসমুচ্চয় উদ্ধৃতির মাধ্যমে নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে। তৎকালীন বঙ্গে শরণদেব, সীরদেব প্রভৃতি পুরুষোত্তম দেব-পরবর্তী আচার্যদের রচনায় জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের সশ্রদ্ধ ও বারংবার উল্লেখ প্রমাণ করে যে এই গ্রন্থটি সুধীসমাজে কতখানি সমাদৃত হয়েছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরম্পরাতেও গ্রন্থটি সুপ্রচলিত ছিল। এইক্ষেত্রে ভাষাবৃত্তি ও পরিভাষাবৃত্তির পরেই ছিল জ্ঞাপকসমুচ্চয়ের স্থান। আচার্য পুরুষোত্তম দেবের এই তিনটি রচনাই সর্বাধিক প্রচার ও খ্যাতি লাভ করেছিল, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়ে পাণ্ডুলিপিমাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেছে। পুরুষোত্তম দেবের গ্রন্থকৃতিগুলিকে লোকলোচনে আনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদান

অনস্বীকার্য। বৃহত্তর বাংলায় পাণিনীয় চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষত পুরুষোত্তম দেবের গ্রন্থগুলি অনুসন্ধানের বিষয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিদ্বান্ গবেষকদের সাথে তাঁর নাম বাঙালি জাতি চিরকাল গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে। পুরুষোত্তম দেবের ভাষাবৃত্তি ও পরিভাষাবৃত্তি এখনও অধ্যায়ন পরম্পরায় সুপ্রচলিত। জ্ঞাপকসমুচ্চয় গ্রন্থটি বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও ভারতের অনেক প্রান্তে জ্ঞাপকের অধ্যয়নের জন্য এই গ্রন্থটির চর্চা আজও করা হয়।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

1. 'Bengal`s Contribution to Sanskrit Grammar', শাস্ত্রী, কালিচরণ. (১৯৭২)। ক্যালকাটা।
2. 'পরিভাষাবৃত্তিঃ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়ঃ, কারকচক্রম্', সম্পা: ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র. (১৯৪৬)। রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম।
3. 'চান্দ্রব্যাকরণবৃত্তেঃ সমালোচনাত্মকমধ্যয়নম্', মিশ্র, হর্ষনাথ. নিউ দিল্লী: শ্রীলালবাহাদুরশাস্ত্রীকেন্দ্রীয়সংস্কৃতবিদ্যাপীঠম্।
4. 'Puurusottamadeva As Grammarian', দাশ, নরেন্দ্রকুমার. (১৯৯১)। দিল্লী: আগম কলা প্রকাশন।
5. 'সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র কা ইতিহাস' (দ্বিতীয়ভাগ), মীমাংসক, যুধিষ্ঠির. (১৯৮৪)। হরিয়াণা।
6. জ্ঞাপকসমুচ্চয়, পুরুষোত্তমদেব, ব্যাখ্যাতা: শর্মা, অমিতা. (১৯৯৫)। দিল্লী: নাগ প্রকাশক।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

বঙ্গের ভোটে উদ্ভূত ভাষা-সংস্কৃতি: ঐতিহ্য যেন অতীত

বাসুদেব সরকার

রামপুরহাট কলেজ

ARTICLE INFO

Article history:
Received 06/09/2024
Accepted 03/03/2025

সূচক শব্দ:

বঙ্গ-ভোট,
ভোট-সংস্কৃতি,
শব্দ ব্রহ্ম,

অতিথি সম্পাদক

শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

আংশিক শিক্ষিত ও আংশিক সচেতন নাগরিক আমরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করেছি বঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ। এই পরিবেশ অতীত বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী—এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অধিকাংশ মানুষই এরকম পরিবেশ কামনা করে না। নির্বাচনের সময় যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার দায়ভার আমাদের সকলের। অতীতে বাংলার যে গৌরব ছিল তার অভিমুখ যে নিম্নগামী তা আমাদের সকলকেই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে এই শতাব্দীতেও।

নির্বাচন এলেই আমাদের কপালে ভাঁজ পড়ে। দেখতে পাই সন্ত্রাসের পরিবেশ। এই অস্থির পরিবেশে অশুভ শক্তির মুখ থেকে যে ধরনের ভাষা, সংস্কৃতি বেরিয়ে আসে এবং তা থেকে যে পরিবেশ তৈরি হয় তা অতীত ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এই পরিপ্রেক্ষিতে মূল প্রবন্ধে কতিপয় গৌরব-গাঁথা গান, স্বদেশপ্রেমী কিছু স্মরণীয় মানুষের কিছু আত্মত্যাগের কথা এবং বর্তমান সময়ে উদ্ভূত সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী নিম্নরুচির মানুষের মুখনিসৃত শব্দ, শব্দ-বন্ধ, বাক্য এবং সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করব মূল প্রবন্ধে। এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও খোঁজার চেষ্টা করব সুস্থ সংস্কৃতির প্রসঙ্গ টেনে।

বাংলা তথা অবিভক্ত বঙ্গদেশ ছিল মহাপুরুষদের পীঠস্থান। আদর্শ বহু মানুষের জন্মভূমি এই বাংলায়। কবিদের হৃদয় থেকে তাই বেরিয়ে এসেছিল এই কথাগুলি। মহাকবি মধুসূদনের কবিতায় পাই–

> “হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
> তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি।”

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় আছে–

Corresponding author’s email ID: basudeb9434mld@gmail.com

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।"

অথবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় উঠে আসে–

"কোন্ দেশেতে তরুলতা–
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?"

আবার শচীন কর্তার গানে পাচ্ছি–

"সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল।"

এই আবহাওয়া এবং এই বাংলার কোলে বেড়ে ওঠার কারণেই বাংলা পেয়েছিল বহু আত্মত্যাগী স্বদেশপ্রেমী বীর সন্তানদের। তাঁদের আত্মত্যাগ এই মাটিকে উজ্জ্বল করেছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মানবকল্যাণ। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে আদর্শ সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনে মনোনিবেশ করা। ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে একটা নির্ভেজাল সমাজ ও জাতি গঠনই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

বহু আত্মবলিদানের পর দেশ স্বাধীন হল। বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটল। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলার সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষতা লাভ করল (ব্যতিক্রম আছে)। একই সঙ্গে বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনিময় হল বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে। বাঙালি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করল। পাশ্চাত্যের ভাল দিকটা নেওয়ার পাশাপাশি খারাপ দিকটাও নেওয়া শুরু করল বাঙালি। অনেক খারাপ দিকের মধ্যে অন্যতম হল ভোগপ্রবণতা। ভোগপ্রবণতা ক্ষমতাবানদের সহজলভ্য ক্ষেত্রভূমি। বাঙালি জাতি ভুলতে বসল তার অতীত ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। আদর্শ শিক্ষিত বাঙালির ক্ষমতা ক্ষীণ হতে শুরু করল। রাজনীতির জগৎ অন্যরকম হল। পাল্টে গেল রাজনীতির মানচিত্র। এলো গণতন্ত্র, গণতন্ত্র এল বটে...। কলমজীবীদের লেখার ধার কমল, সামনে এল ভোগের শাসক-প্রশাসক। বন্দুকের নল হল ক্ষমতার উৎস। ভদ্র আদর্শ শিক্ষিত মানুষ আস্তে আস্তে প্রমাদ গুণতে শুরু করল। পক্ষান্তরে ভোগীশাসক জমিদারদের মতো ক্ষমতায় এল।

হাল আমলের রাজনীতির আঙ্গিনায় আসা যাক। 'রাজনীতি' শব্দের অর্থ ছিল নীতির রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নীতি। কালের নিয়মে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন বামের ভোট রামে গেল—অর্থ সকলের জানা। অতএব 'রাজনীতি' শব্দের অর্থ এখন বলা যেতে পারে রাজার নীতি। অর্থাৎ রাজা বা রানি যেমন নীতি হবে তেমন। এই কারখানাতেই তৈরি হচ্ছে এ যুগের নেতা প্রভুগণ। এঁরা কেউ কেউ কখনও কখনও 'সরীসৃপ' অবতার। বহু প্রকার বাহিনী এঁদের বাহন। যাঁর যত প্রকার বাহিনী তিনি তত ক্ষমতাশালী (ব্যতিক্রম আছে)। মুদ্রা এদের লক্ষ্য, মুদ্রা ছড়ালেই বাহিনীর দৈব ক্ষমতা বাড়ে। অতএব মুদ্রারাক্ষসই ক্ষমতার মধ্যমণি। মুদ্রারাক্ষস গ্রাস করে আদর্শকে, নীতি-নৈতিকতাকে। দেশপ্রেম হয় ক্ষুদিরাম। ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ যায় উবে, সকল প্রকার সম্পর্কের শিকল হয় আলগা। মানুষে

মানুষে সুসম্পর্কের জায়গায় চলে আসে সন্দেহ। এই সন্দেহের জাল বহু প্রকার ও বহু দূর বিস্তৃত। রাজনীতির কলঙ্কময় অধ্যায় শুরু হয়েছে এভাবে। এর শেষ ও শুরু নিয়ে আমরা প্রতীক্ষার পথে দাঁড়িয়ে।

শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক সংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন সর্বোপরি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চিরকালই সাম্যের পক্ষে সওয়াল করেছে। কিন্তু, ইদানিং মনে হচ্ছে কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে। শক্তি ও সাহসের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। নেমে আসছে অন্ধকার। এই অন্ধকার থেকে জন্ম নিচ্ছে অশুভ শক্তি। এই অশুভ শক্তির দায় এড়াতে পারেন না রাজনীতির নেতারা। তাঁরা আজ ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমে সিংহাসনে বসার জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমদানি করেছেন তা উল্লেখ করা কর্তব্য। কিছু শব্দ, কিছু বাক্য এবং নির্বাচনকেন্দ্রিক পরিস্থিতির উল্লেখ করলেই এই পর্যায়ের নেতাদের মানসলোক এবং কার্যকলাপ স্পষ্ট হবে।

শব্দ ব্রহ্ম। শব্দের অনেক ক্ষমতা। পরিবেশ-পরিস্থিতি-স্থান-কাল-পাত্র ভেদে 'শব্দ' নানা অর্থ হয়। 'বিভীষণ', 'মীরজাফর' শব্দের অর্থ কালের নিয়মে, কার্যকারণ সূত্রে পরিবর্তন হয়েছে। 'সারদা' শব্দের অর্থ 'চিটফাণ্ড'—এমন অর্থ করতে শুরু করেছে এই প্রজন্মের কেউ কেউ। পুরাণ থেকে বা ধর্মগ্রন্থ থেকে শব্দগ্রহণ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা রাজনৈতিক স্বার্থে যে সব শব্দ ব্যবহার করছেন তারও পরিবর্তন লক্ষ করছি। 'জয় শ্রীরাম' শব্দযুগলের কী অর্থ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তা আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের ভয় শব্দদূষণের (Word Pollution) এবং বাক্য দূষণের। মানানসই শব্দ ব্যবহার এবং সুন্দর করে কথা বলার শক্তিই আলাদা। রাজনীতির আঙিনায় বাহিনী সংখ্যায় বেশি হলেও মসিবাহিনী যদি কম হয় ক্ষতি নেই। আমরা জানি বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল শ্রেষ্ঠ। সুস্থ গণতন্ত্রে জনগণই অধিনায়ক একথা বলাই যায়।

সাহিত্যিক মহাজনদের সৃষ্ট শান্তি সুখ জাগানিয়া শব্দের (Word) কাছে আমরা কম বেশি সকলেই ঋণী। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাঁরাই আমাদের শক্তি, তাঁরাই আমাদের বল। শব্দের ব্যবহার নিজের ব্যাপার, রুচির ব্যাপার। কখন বলছি, কোথায় বলছি, কাদের উদ্দেশ্যে বলছি, কেমন করে বলছি, বলার ভঙ্গি ও মাত্রা কেমন হবে–ইত্যাদি বহু বিষয় আছে এই শব্দ ব্রহ্মের পরিমণ্ডলে। শব্দ একবার বেরিয়ে গেলে তা আর নিবারণ করা যায় না। তাই শব্দের ব্যবহারের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। দেশ ও দশের ভবিষ্যৎ 'শব্দব্রহ্মের' উপর দাঁড়িয়ে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য নেতাদের হৃদয় হতে যে ধরনের শব্দ, বাক্য ও সংস্কৃতি অবলীলাক্রমে নির্গত হচ্ছে তা কখনো কখনো উদ্বেগের। ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা যে ধরনের বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছেন তাতে আমাদের হৃদয় কেঁপে উঠছে। দীর্ঘ ২০-২৫ বছর ধরে যে ধরনের রাজনৈতিক শব্দ (ত্রাসের শব্দ) সংগ্রহ করেছি তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরে সামান্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেই নেতাদের জীবন চর্যা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

গণতন্ত্রের সেরা উৎসব নির্বাচন। নেতাদের অগ্নিপরীক্ষাও হয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই। একালের সেই নির্বাচনের আঙিনায় এল সংঘর্ষ, মৃত্যু মিছিল, দাঙ্গা, ছাপ্পা, সন্ত্রাস, বুথ জ্যাম, হার্মাদ বাহিনী, জল্লাদ বাহিনী, (এরূপ বহু প্রকার বাহিনী) বহিরাগত, প্রবল উত্তেজনা, পার্টি অফিস ভাঙচুর, মুড়ি মুড়কির মতো বোমা, গোপন আঁতাত, নজরবন্দি, গ্রামদখল, অগ্নিসংযোগ। (বহু প্রকার মাফিয়া তো আছেই), ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো, গণহত্যা, পুলিশের

সামনেই হামলা, রক্ত গঙ্গা বইবে, সংখ্যালঘু তাস, টাকা দিয়ে ভোট, রাস্তা কাটা, গ্রামছাড়া করা, ভুয়ো ভোটার, তোলাবাজি, গুলিবিদ্ধ যুবক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই হামলা, বাইকে আগুন, ক্যামেরা ভাঙচুর, সাংবাদিক আহত, রাস্তায় বাঁশ ফেলে বিক্ষোভ, শূন্যে গুলি, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, বহিরাগতদের নিয়ে এসে হামলা, আগ্নেয়াস্ত্র সমেত জমায়েত, ভোট সংঘর্ষে অ্যাসিড হামলা, সাদা থান পাঠিয়ে দেব, গণহত্যা লোহার রড দিয়ে মার, গো-ব্যাক শ্লোগান, ক্যাম্প করে পাহারা, চামড়া গুটিয়ে নেব, ভোটের পরে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেব, অতি স্পর্শকাতর বুথ, দফায় দফায় তল্লাশি, পচা আলু, নকুল দানা, গুড় বাতাসা, কুরুক্ষেত্র, মহারণ, জেলায় জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, কার্যালয় জ্বালিয়ে দাও, পার্টি অফিস দখল এবং অগ্নি সংযোগ—এরূপ শব্দাবলি, বাক্যবন্ধ সংগ্রহ করে নির্বাচনী অভিধান নির্মাণ করেছেন বর্তমান প্রাবন্ধিক।

শব্দে, শব্দবন্ধে, বাক্যে ভোট সংস্কৃতির যে চালচিত্র পেলাম তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ করে অভিধানগত, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা এবং সমাজভাষাবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিশ্লেষণ করলে প্রতিটি শব্দের, শব্দবন্ধের এবং বাক্যের যা অর্থ দাঁড়ায় তা বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে কলুষিত করে চলেছে। নগ্নরূপ আরো নগ্নতর হয়ে আসে আমাদের সামনে। এরূপ নগ্ন চেহারায় হয়তো অতীব সূক্ষ্মবস্ত্র আছে (চোখে পড়ছে না যদিও), বসন পরাতে হবে। কে কখন কীভাবে পরাবে? সন্তান হয়ে শক্তি সাধকের মতো বলতে হবে–

"বসন পরো মা, বসন পরো।"

রাজনীতিতে অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়। তবে মিথ্যারও সীমা-পরিসীমা থাকা দরকার। বিশ শতকে বহু রাজনৈতিক ব্যক্তি তাঁরা আদর্শের কারণে মিথ্যা না বলার পক্ষেই হাঁটতেন। আদর্শবাদী কর্মী এবং নেতারা একাধারে ছিলেন বিপ্লবীও। ছল-চাতুরী বা নানা কৌশল অথবা বিশেষ বিশেষ অজুহাত দেখালেই হয়তো বহু বিপ্লবীর দীপান্তর বা মৃত্যুদণ্ড হত না। ছলনার আশ্রয় না নেওয়া দেশ মাতার এইসব সন্তানেরা তাই আজও অমর। দেশ ও জাতি গঠনই ছিল বিশ শতকের মূল মন্ত্র। একুশ শতক মানবতার যুগ। ধর্মীয় গোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস রাজনীতির হাতিয়ার হতে পারে না। সমাজকে পলিটিক্যাল সোসাইটি বানালে হবে না। রাজনীতিবিদদের মূর্খতা এবং মিথ্যা কথার জন্য জনগণ যেন বিভ্রান্ত না হন। যদিও রাজনীতিতে অনেক মিথ্যাচার চলে। কিন্তু আধুনিক যুগ মানবতাবাদের যুগ এটাও মাথায় রাখতে হবে। যাঁরা দেশের জন্য মানুষের জন্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই দেশ গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের উত্তরসূরী হয়ে রাজনীতির এই নগ্নরূপ আমরা পেলাম। আজ আমরা দেখি–শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য উদযাপন করা হয় মহামানবদের জন্মজয়ন্তী। বাংলার প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, সরোজিনী নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরা, কল্যাণী দাস, ননীবালা দেবী, দুকড়িবালা দেবী, কমলা দাশগুপ্ত, শান্তি ঘোষ প্রমুখ নারী বিপ্লবীদের নাম আজ বাঙালি জাতি ভুলতে বসেছে। ক্ষুদিরাম আজ অনেকের কাছে হাসির পাত্র, উদাহরণ মাত্র। রাসবিহারী বসু, অরবিন্দ ঘোষ, নজরুল ইসলাম, যতীন দাস, উল্লাসকর দত্ত, বারীণ ঘোষ, আজিজুল হক, সতীনাথ ভাদুড়ী, গোপাল হালদার প্রমুখেরা দেশের জন্য জেল খেটেছেন এবং অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে যে সঙ্গীত সম্ভার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও আমাদের (ব্যক্তি বিশেষে) শিহরণ জাগায়। আন্দামানে দীপান্তর হয়েছে তাঁদের। কল্যাণমূলক সাহিত্যও কম সৃষ্টি হয়নি তাঁদের নিয়ে। কিন্তু বর্তমানের রাজনৈতিক এই উগ্র পরিস্থিতি

এবং উক্ত হুমকি-সংস্কৃতি এই দেশের মুখ ম্লান করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বদেশপ্রেমী নেতাদের কাছে দেশ ছিল সাধনার বস্তু। বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাঁরা। এঁদের হৃদয়ে ছিল পরাধীন মাতৃভূমির জন্য এক অন্তর্নিহিত বেদনাবোধ।

কালচার বা সংস্কৃতি হল উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, আর সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ। সভ্যতাতরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি। সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানসিক সৌরভই সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবন ভাবা যায় না। এই সংস্কৃতির মধ্যে আছে কতকগুলি জরুরি বিষয়–সংযম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, কৃপা, করুণা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, সৌজন্য, সুরুচি, সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ, স্নেহ, প্রীতি ও মমতার অনুশীলন। শুধু নাচ, গান সংস্কৃতি নয়। মানুষেরই একমাত্র সংস্কৃতি আছে, সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের নির্যাস। সংস্কৃতিবান মানুষের থাকে সু-আচার, আচরণ, মার্জিত রুচি, সৌজন্য, বিনয়, আদব কায়দা ইত্যাদি। সংস্কৃতির বাহ্য লক্ষণ হল–সততা, উদারতা, আদর্শ রীতিনীতি, শ্রেয়চেতনা, আলাপে আন্তরিকতা, চোখে প্রীতি-প্রসন্নতার প্রভা, মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে চেষ্টা করলে সভ্যতর হওয়া যায়। ক্ষমতাবান মানুষের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের এই সংস্কৃতি নামক বসন পরা দরকার। নিজে বসন না পরলে মায়ের বসন হবে কী করে?

আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন সংস্কৃতিবান হওয়া। কারণ সংস্কৃতি আমাদের মনের সংস্কার সাধন করে আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে উজ্জ্বলতর করে। সংস্কৃতি রূপ বসন নিজে পরার এবং মাকে পরানোর উপায় কী? বাঙালির ধী শক্তির অবক্ষয় হয়েছে বলতে অসুবিধা নেই। 'আলালী' বাঙালি থেকে আজ আমরা দালালী বাঙালিতে পরিণত হয়েছি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চারও ভাটা পড়েছে। নীতি-নৈতিকতার চাষ শিক্ষাঙ্গনেও কমেছে। আত্মপ্রকাশ অপেক্ষা আত্মপ্রচার জায়গা করে নিয়েছে। রাজনীতিতে অশুভ শক্তির প্রাধান্যে সমাজে আজ অবিশ্বাসের কালো মেঘ ঘণীভূত হয়েছে। মন সুস্থ করে, প্রেরণা দেয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি চর্চার ফলে মানুষ মার্জিত ও উন্নত হয়ে ওঠে। মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়। জীবন ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধানের নিরন্তর প্রয়াসের নামই সংস্কৃতি। উন্নত রুচি ও উৎকর্ষময় চিত্তের জন্ম দেয় সংস্কৃতি। সংস্কার বা পরিমার্জনাই হলো সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। মন বা চিত্তের উৎকর্ষের জন্যই সংস্কৃতি। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনে মানবীয় গুণাবলি ও দক্ষতা বৃদ্ধির এবং পরিবেশকে উন্নত ও জীবনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার চিন্তা ও চেষ্টাই সংস্কৃতি ভাবনার মূল কথা। সংস্কৃতির ফল রুচি, সমাজবোধ, কল্যাণ চেতনা এবং বিবেকবোধ। মানুষকে মহৎ করে ভাবতে শেখায় সংস্কৃতি। সকল সংস্কৃতিচিন্তকই একথা বিশ্বাস করেন যে, সদর্থক সংস্কৃতিই হচ্ছে মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। সংস্কৃতি মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রীবন্ধন ঘটায়, সংস্কৃতির স্পর্শে মানুষ পবিত্র হয়, মানুষ হয়ে ওঠে মানবপ্রেমিক। প্রসঙ্গে আসি-শাসককুলকে ভাবতে হবে পথ ও মতের পরিবর্তন করে এই (সংস্কৃতির) পথে আসা। পথিক সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন বলেছেন–

"মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

ধর্ম আর সংস্কৃতি এক না। সংস্কৃতিটাই যদি ধর্ম হয়, আলাদা করে ধর্ম পালন করার প্রয়োজন কমে যাবে। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ধর্ম' ভিন্ন অর্থ বহন করছে, কিন্তু ধর্মের মধ্যে সংস্কৃতির খামতি রয়েছে, আগমন ঘটেছে সাম্প্রদায়িকতার। সামনে উঠে আসছে ('ধর্ম'–অর্থে) religion। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম হল একজন মানুষের ন্যায়সম্মত কর্তব্য, যে কাজের মধ্য দিয়ে সে সমাজে অবস্থান করে। এর সঙ্গে বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি, নির্দিষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বর্গের ধারণা–এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর উপাসনা, পরম মুক্তি, আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ–সব ভাবনার স্বাধীনতা ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তি। 'রিলিজিয়ন' ঠিক এর বিপরীত, ফলে রিলিজিয়ন আক্রমণাত্মক, হিংসাশ্রয়ী।

নির্বাচনী বৃহৎ কর্মকাণ্ডের চালচিত্র দেখে আমরা ভীত। ভীত সর্বস্তরের মানুষ। নেতা-মন্ত্রী-প্রশাসন দিয়ে সব হবে না। মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সংস্কৃতির চাষ না বাড়ালে রবি-বিবেক-নজরুল-জীবনানন্দের বাংলা ম্লান হবে নিশ্চিত। সহৃদয় ব্যক্তির কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করাতেই হবে আদর্শ সংস্কৃতির পাঠ। শুধু নিজের উন্নতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থে যারা সংস্কৃতিচর্চা করেন তারা ঠিক পথে হাঁটেন না। বাংলার রবি-বিবেক-নজরুল-জীবনানন্দ কবি তো আছেন-এঁদের সংস্কৃতির সৌরভ আমাদের পাথেয়। বাউল কীর্তনের ডাক মিলনের ডাক। সুতরাং দ্বেষ ছেড়ে মিলনের মহামন্ত্রে সুসংস্কৃতিকে বাহন করে আমরা পৌঁছাব মুক্তবেণির ভারততীর্থে, এই বিশ্বাসেই বলতে চাই–

"বাঙালির কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালি জনম বিফল নহে এ প্রাণ।"

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অশিক্ষা, প্রতিদিন, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রোববার, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭২।
বিভিন্ন সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকা।
বাংলার বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল এবং অন্তর্জাল।
মনীষী স্মরণে: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
সঙ্গীত সংগ্রহ: স্বামী সৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী বেদানন্দ (গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, বেলুড় মঠ।
শাক্ত পদাবলী: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা ১১, সেপ্টেম্বর, ২০১৫, রাজা রামমোহন রায় রোড, কলি-২৬।
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি: বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, সপ্তম মুদ্রণ, মার্চ, ২০১০, কলকাতা-৭৩।
সংস্কৃতি কথা: মোতাহের হোসেন চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তার, ডিসেম্বর, ২০১৪, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।
বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি: বিশ্বজিৎ ঘোষ, সোনার বাংলা প্রকাশন, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা-৫৫।
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, ড. তুষারকান্তি ঘোষ, বলাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, কলকাতা-৯।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL
Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

মালতো ও বাংলা ভাষা সংযোগ

বাপী সরকার

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 31/12/2024
Accepted 15/04/2025

সূচক শব্দ:
দ্রাবিড়ীয়,
মাল পাহাড়িয়া,
রাজমহল পাহাড়,
দ্বিভাষিকতা,
ভাষাসরণ

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের একটি অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায় হলো 'মালতো'। 'মালতো' দ্রাবিড়ীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্গত একটি ভাষা। এই সম্প্রদায়ের ভাষা 'মালতো', 'মালতি', 'মালের', 'মাল পাহাড়িয়া' ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি কথ্য ভাষা। এই সম্প্রদায়ের ভাষার কোন নিজস্ব লিপিও নেই। এই ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষেরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা–'মাল পাহাড়িয়া', 'সাউরিয়া পাহাড়িয়া' এবং 'কুমারভাগ পাহাড়িয়া'। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে এই সম্প্রদায়ের মোট জনসমষ্টি প্রায় ২,৩৫০০০। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলত: বসবাস করে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও বাংলাদেশে। ইংরেজ আমলে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাজমহল পাহাড়ে বসবাস করত। তখন তাদের পেশা ছিল কৃষিকাজ (ঝুম চাষ), পশুপালন ও শিকার। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরাই প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৭৮১-১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু ইংরেজদের গোলা বারুদের কাছে তারা টিকতে পারে নি। তারা ইংরেজদের অত্যাচারে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যেতে থাকেন। তারা মূলত: বঙ্গ দেশের(অবিভক্ত) দিকে পালিয়ে যায়।

'মালতো' সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ,নদিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা দীর্ঘদিন (প্রায় দু'শো বছর) বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংস্পর্শে রয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকায় এবং পড়াশোনা ও অফিস, আদালতের ভাষা মাধ্যম বাংলা হওয়ায় তারা নিজেদের মাতৃভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষাকে অবাধে গ্রহণ করেছে ও করছে। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা দীর্ঘদিন বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংযোগ-সংস্পর্শে থাকায় যে সমস্ত সমাজভাষিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি হল- 'দ্বিভাষিকতা' (Bilingualism), 'কোড সুইচিং' (Code switching), 'কোড মিক্সিং' (Code mixing) , 'ভাষা ঋণ' (Language borrowing) এবং 'ভাষা সরণ' (Language shift)। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মালতো সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলা ভাষাতেই কথোপকথনে সাবলীল ও দক্ষ। তবে তারা বেশ কিছু মালতো ভাষার শব্দ ও বাক্যও

Corresponding author's email ID: bapisarkar7890@gmail.com

জানে। মালতো সম্প্রদায়ের অল্প কিছু মানুষ বাংলা ও মালতো দুটো ভাষাতেই সাবলীল। এই সমস্ত মানুষদের বয়স ৪৫/৪৫ বছরের উপরে । যাদের বয়স ৬-২০ বছরের মধ্যে ,তারা মালতো ভাষা বলতে পারে না, কিন্তু বুঝতে পারে। যাদের বয়স ২০-৪৫ বছর, তারা মালতো ভাষা কিছু কিছু জানে কিন্তু বাংলা ভাষাতেই কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ।'মালতো' সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন নন। মালতো সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যদি সচেতন না হন তবে অদূর ভবিষ্যতে এরা পুরোপুরি বাংলা ভাষায় Shift করে যেতে পারে।

ভূমিকা (Introduction)

যখন দুই বা ততোধিক ভাষাভাষী গোষ্ঠী একই জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি অবস্থান করে, একে অপরের ভাষা বুঝতে বা বলতে চেষ্টা করে তখন ভাষা সংযোগ (Language contact) প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ভাষা সংযোগ ঘটে থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে মালতো ও বাংলা ভাষা সংযোগ বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি। মালতো হল উত্তর একটা অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায়। মালতো দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটা ভাষা এই সম্প্রদায়ের ভাষা 'মালতো', 'মালের', 'মাল পাহাড়িয়া' ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি কথ্য ভাষা। এই সম্প্রদায়ের ভাষার কোন নিজস্ব লিপি নেই। এই ভাষাটি বাংলা ও দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়ের মানুষ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়া বা সাউরিয়া পাহাড়িয়া এবং কুমারভাগ পাহাড়িয়া। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে এই সম্প্রদায়ের মোট জনসমষ্টি ২,৩৫০০০। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলতঃ বসবাস করে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ও বাংলাদেশে। ব্রিটিশ আমলে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাজমহল পাহাড়ে বসবাস করত। তখন তাদের পেশা ছিল কৃষিকাজ (ঝুম চাষ) , পশুপালন ও শিকার। জমি দখল শোষণ ও অত্যাচারেরর কারণে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন । ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৭৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ইংরেজদের গোলা বারুদের কাছে তারা টিকতে পারেননি। তারা ইংরেজদের অত্যাচারে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যেতে থাকেন। তখন তাদের বেশিরভাগ মানুষ অবিভক্ত বঙ্গদেশের দিকে পালিয়ে আসেন। তারপর পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে অন্যান্য আদিবাসীদের সাথে মালতো সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যান। এরা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলায় বাস করেন। আর ঝাড়খণ্ডের পাকুড়, দুমকা, সাহেবগঞ্জ, গোড্ডা, জামতাড়া ও দেওঘর জেলায় বসবাস করেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে (প্রায় ২৫০-৩০০ বছর) বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংযোগ সংস্পর্শে থাকায় বিভিন্ন রকম সমাজভাষিক (Sociolinguistics) পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—দ্বিভাষিকতা (Bilingualism) বা বহুভাষিকতা (Multilingualism), কোড মিক্সিং (Code mixing), কোড সুইচিং (Code switching), ভাষাঋণ (Borrowing) এবং ভাষা সরণ (Language shift) ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

আমরা মালতো ও বাংলা ভাষা সংযোগ বিষয়ক এই প্রবন্ধের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মালতো সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা 'প্রশ্নমালা' (Questionnaire) পদ্ধতি অনুসরণ করেছি । তথ্য সংগ্রহ করেছি অংশগ্রহণকারীদের লিঙ্গ, বয়স, শহর/গ্রামীন ইত্যাদি মানক অনুসরণ করে । প্রাথমিক তথ্য (Primary Data) ছাড়াও সেকেন্ডারি তথ্যের (Secondary Data) জন্য Bijay Prasad Mahapatra রচিত 'Malto – An Ethnosemantic Study' এবং Masato Kabayashi রচিত 'Texts and Grammar of Malto' গ্রন্থ অনুসরণ করেছি।

দ্বিভাষিকতা (Bilingualism)

যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ একের অধিক ভাষা ব্যবহার করে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে দ্বিভাষিকতা (Bilingualism) বলে। কোন ব্যক্তি দুটি ভাষাতে সমান দক্ষ নাও হতে পারেন, তিনি একটি ভাষায় বেশি দক্ষ এবং অপর ভাষায় তুলনামূলক ভাবে কম দক্ষও হতে পারেন। তবে তারা একে অপরের মধ্যে সঠিক ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারলেই সেই পরিস্থিতিকে দ্বিভাষিকতা বলা যেতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে দ্বিভাষিকতার শ্রেণিবিভাগ করেছেন। আমরা এই প্রবন্ধের আলোচনার জন্য Lauren Landsberry কৃত দ্বিভাষিকতার শ্রেণিবিভাগটি গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। তিনি দ্বিভাষিকতাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন, সেগুলি হলো:

- Simultaneous Bilingualism – যারা দুটি ভাষা এক সঙ্গে শিখে বড়ো হয়ে ওঠে।
- Early Bilingualism – যারা শৈশবের গোড়ার দিকে দুটি বা তার বেশি ভাষা শেখে।
- Late Bilingualism – যারা শৈশবের পর নতুন করে অন্য একটি ভাষা শেখে।
- Passive Bilingualism – যারা কোন একটি ভাষা বুঝতে পারে কিন্তু বলতে বা লিখতে পারে না।
- Balanced Bilingualism – যারা দুটি ভাষায় সমানভাবে দক্ষতা অর্জন করেছে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের মালতো সম্প্রদায়ের মানুষদের বয়স এবং ভাষা বলার দক্ষতা অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছি, সেগুলি হলো—

ক) ৬ – ২০ বছর বয়স্ক ।
খ) ২০ – ৪০/৪৫ বছর বয়স্ক ।
গ) ৪০/৪৫ বছরের অধিক বয়সী ।

ক) শ্রেণির ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলতে পারে। এরা মালতো ভাষা বুঝতে পারে । কিছু কিছু মালতো শব্দ বলতে পারে। কিন্তু মালতো ভাষায় কথা বলতে পারে না। এই শ্রেণিকে আমরা 'Passive Bilingual' বলতে পারি। এরা মালতো ভাষা বলতে পারে না তাই এদের পিতা, মাতা এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই এদের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। বাড়ীর বাইরেও এই শ্রেণির ছেলেমেয়েরা সর্বত্র বাংলা ভাষাতেই কথা বলে।

খ) শ্রেণির ছেলেমেয়েরাও বাংলা ভাষাতে কথোপকথনে দক্ষ। এরা বেশ কিছু মালতো শব্দ ও বাক্যাংশ বলতে পারে। এদের আমরা 'Late Bilingual' বলতে পারি। এদের মধ্যেও মালতো ভাষা বলার কোন রকম আগ্রহ দেখা যায় না। বাংলা ভাষাতে কথা বলা এদের কাছে মর্যাদার বিষয়। তাই এরা সকলের সঙ্গে সাবলীলভাবে বাংলা ভাষাতেই কথা বলে।

গ) শ্রেণির পুরুষ ও মহিলারা মালতো ও বাংলা দুটো ভাষাতেই সমান দক্ষ। এই শ্রেণিকে আমরা 'Balanced Bilingual' এবং 'Simultaneous Bilingual' বলা যেতে পারে। এরা বাংলার পাশাপাশি মালতো ভাষাতে দক্ষ হলেও মালতো ভাষা বলার লোক বা সুযোগ পাই না । তাই এরাও বেশিরভাগ সময় বাংলা ভাষাতেই কথা বলে।

ভাষাঋণ (Borrowing)

যখন দুটি পৃথক ভাষা ভাষা সংযোগের ফলে একে অপরের থেকে উপাদান গ্রহণ করে, সেই প্রক্রিয়াকে ভাষাঋণ বলে। এই বিষয়ে অধ্যাপক রামেশ্বর 'শ লিখেছেন –

> "যখন দুটি ভাষাগোষ্ঠী ব্যবসায়িক, ভৌগোলিক, অবস্থানগত, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কারণে পরস্পরের সংযোগে আসে তখন ভাষার যদি মানগত বিকৃতিসাধন না করেও একটি ভাষার লোক অন্য ভাষার কিছু উপাদান (শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, উচ্চারণরীতি ইত্যাদি) তার নিজের ভাষার ঘাটতিপূরণ, বৈচিত্র্যসাধন, মান বা সম্মান বৃদ্ধির জন্যে নিজের ভাষায় গ্রহণ করে এবং গৃহীত উপাদানটি যদি পুরোপুরি ঐ ভাষায় প্রচলিত হয়ে যায়, তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে ভাষাঋণ (Borrowing) বলে।"[১]

ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস এফ হকেট ভাষাঋণের পিছনে দুটি 'Motive' এর কথা বলেছেন –

- 'Need feeling motive' – 'প্রয়োজনপূরক প্রেষণা' ।
- 'Prestige motive' – 'সামাজিক সম্মানলাভের প্রেষণা' ।

মালতো সম্প্রদায়ের মানুষদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের পেছনেও এই দুটি 'Motive' কাজ করে। বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল,কলেজ,অফিস, আদালতের সমস্ত কাজই বাংলা ভাষায় হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা মালতো ভাষার চেয়ে উঁচু মর্যাদার ভাষা। তাই মালতো সম্প্রদায়ের মানুষ সামাজিক সম্মানলাভের জন্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। এছাড়াও প্রতিদিনের জীবনযাপনে এমন অনেক শব্দের প্রয়োজন হয়, যখন মালতো ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন হয় অথবা সঠিক ভাবে বোঝান যায় না, এই রকম পরিস্থিতিতেও তারা মালতো ভাষা ব্যবহার করেন। আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য ভাষাঋণকে দুই ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেছি–

- অবিমিশ্র ভাষাঋণ (Unmixed Borrowing)
- মিশ্র ভাষাঋণ (Mixed Borrowing)

[১] শ' রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ৪৭০ ।

অবিমিশ্র ভাষাঋণ (Unmixed Borrowing)

যখন কোন ভাষায় অন্য ভাষার কোন উপাদানের সবটা অবিমিশ্র আকারে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়,সেই প্রক্রিয়াকে অবিমিশ্র ভাষাঋণ বলে। আমরা এই ধরনের শব্দগুলিকে 'কৃতঋণ শব্দ' বা 'Loanwords' বলতে পারি। যেমন - টাটকা - /ʈaʈka /, বড়শী - /boɽʃi/, বিজলী - /biɟli/, আলতা - /alta/, লড়াই - /loɽai /, মোটা - /moʈa/ ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষা থেকে অবিমিশ্র আকারে মালতো ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

মিশ্র ভাষাঋণ (Mixed Borrowing)

যখন কোন ভাষার একটি উপাদানের সঙ্গে অন্য ভাষার কোন উপাদানের অংশ বিশেষ যোগ করে একটি মিশ্র উপাদান গঠন করা হয়, তাকে মিশ্র ভাষাঋণ বলে। আমরা এই ধরনের শব্দকে 'Loanblend' বলতে পারি। যেমন—বিষ - /bi : ʃe/, কাজ - /ka : ɟe/ , কলম - /kol : me/, কম - /ko : me/ , ঘাস - /gʰa :si/ , বছর - /bacʰ: ri/, আলো - /albi/ , লজ্জা - /laɟi/ ইত্যাদি।

নীচে মালতো ভাষায় প্রাপ্ত কিছু শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো–

সংখ্যাবাচক শব্দ

মালতো ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দের বেশির ভাগই বাংলা বাংলা ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। কুড়ি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত শব্দ। মালতো সম্প্রদায়ে বড়ো সংখ্যার ক্ষেত্রে কুড়ি কে score অর্থাৎ এক কুড়ি হিসেবে ধরা হয় , যেমন - এক - /ei : ke/, দুই - /du : ye/, তিন - /ti : ɳe/, চার - /ca : re/, পাঁচ - /pa : ce/, বার - /ba : re/, তেরো - /ʈere/ ইত্যাদি ।

আত্মীয়বাচক শব্দ

মালতো সম্প্রদায়ের মানুষেরা আত্মীয়বাচক শব্দ হিসাবে প্রচুর বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন – বাবা - /baba/, বাবা অর্থে মালতো ভাষার শব্দ/aba/-এর ব্যবহার নেই। মা - /ma/, মালতো ভাষার শব্দ /ɖuɖu/-এর ব্যবহার নেই। এছাড়া এরা বাংলা ভাষার শব্দ /kaka/, /kaki/, /mama/, /mami/, /ʃɔʃur/, /ʃaʃuri/, /ɳaʈiɳi/, /bʰagɳa /, /bʰagɳi/ ইত্যাদি ব্যবহার করে। এছাড়াও এইরকম আরো অসংখ্য বাংলা ভাষার আত্মীয়বাচক শব্দের ব্যবহার করে।

সব্জী ও ফল

সব্জী ও ফলের নামের ক্ষেত্রেও তারা বেশিরভাগ বাংলা শব্দের ব্যবহার করেন - আলু - /alu/, পেঁয়াজ - /peaɟe/, পটল – /pɔʈole/, আপেল - /apele/, খেজুর - /kʰeɟur/, শশা - /ʃɔhaʃe/, কমলালেবু - /kɔmlalebu/, পেয়ারা - /peĕara/, গাজর -/gaɟor/, কুমড়ো - /kumɖo/, ভেন্ডি - /bʰenɖi/ ইত্যাদি।

বিবিধ

মুশকিল - /muʃkile/, বাদল - /badl̪i/, রান্নার জিনিস পত্র - /pat̪li/, বছর - /bɔcri/, গ্লাস - /glaʃʃ/, বালতি - /balt̪i/, আলো - /albi/, ঝগড়া - /ɟagr̪a/, কম - /ko : me/, দুঃখ - /d̪uke/, টুকরো /t̪ukr̪a/ ইত্যাদি। শুধুমাত্র এইগুলোই নয় আরো অসংখ্য বাংলা ভাষার শব্দ মালতো ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

মালতো ভাষায় ব্যবহৃত বাংলা শব্দের যে সমস্ত ধ্বনিপরিবর্তন গুলি দেখা যায়, তার কয়েকটি হল –

অন্ত্যস্বরাগম (Vowel catathesis)

অন্ত্যস্বরাগম হলো কোন শব্দের শেষে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যোগ করে উচ্চারণ করা। এটি সাধারণত বাংলা ভাষায় আগত বিদেশী শব্দে দেখা যায়। যেমন – বেঞ্চ - বেঞ্চি। মালতো ভাষায় গৃহীত বাংলা শব্দে অতিরিক্ত একটি স্বরধ্বনি যোগ করার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলা ভাষার অসংখ্য শব্দে অন্ত্যস্বরাগমের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন –

বাংলা	মালতো
/kɔm/	/ko : me/
/kɔlom/	/kol : me/
/biʃ/	/bi : ʃe/
/bacʰur/	/bacʰ :ru/
/bacʰar/	/bacʰri/ ইত্যাদি।

অঘোষীভবন (Devoicing)

শব্দমধ্যস্থ কোন ঘোষধ্বনি অঘোষ উচ্চারিত হলে তাকে অঘোষীভবন বলে। মালতো ভাষায় এই অঘোষীভবন দেখা যায়। যেমন –

বাংলা	মালতো
/kɔbɟa/	/kɔpca/

অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration)

শব্দমধ্যস্থ কোন মহাপ্রাণ ধ্বনি যদি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয়, তাকে অল্পপ্রাণীভবন বলে। মালতো ভাষায় অল্পপ্রাণীভবনের প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন-

বাংলা	মালতো
/kʰɔbor/	/kob : re/

/ɖukkʰo/	/ɖu : ke/
/bacʰor/	/bɔcʰri/

কোড মিশ্রণ (Code mixing) এবং কোড পরিবর্তন (Code switching)

বক্তা যখন একই পরিস্থিতিতে একটি ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্যাংশের ব্যবহার করে, তাকে কোড মিশ্রণ (Code mixing) বলে। যেমন -

- /eɳu ekʈa ɳatuɳ kolme lageli/
  (আমি একটা নতুন কলম চাই)
- /eɳur ʃobɟi kʰub ʃɔʃta/
  (এখন সব্জী খুব সস্তা)

বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে বক্তা যখন নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে অন্য ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার করে, তাকে কোড পরিবর্তন বলে (Code switching)। ভাষা সংযোগের ফলেই এই প্রক্রিয়াটি ঘটে। এই বিষয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার লিখেছেন -

> "যদি তার আয়ত্তে একাধিক ভাষা উপভাষা থাকে, তাহলে উপলক্ষ্য অনুযায়ী Shifting বা Switching যে সে করবে এ তো স্বাভাবিক ও সংগত ব্যাপার।"[২]

যেমন বাংলা ও ইংরেজি ভাষা দীর্ঘ দিনের ভাষা সংযোগের ফলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে কথা বলি। আবার কোন সময় বাংলা ভাষায় কথা বলতে বলতে ইংরেজি ভাষার কোন বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করি। মালতো ভাষার ক্ষেত্রেও এই রকম ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। মালতো ভাষায় বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া মালতো ভাষায় কথা বলতে বলতে বাংলা ভাষায় 'Switch' করার প্রবণতা দেখা যায়। মালতো সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা যদি মালতো ভাষায় কিশোর–কিশোরী বা যুবক–যুবতীদের কিছু বলে, তবে তারা বাংলা ভাষায় উত্তর দেয় (যদি বুঝতে পারে)। যেমন –

- বয়স্ক ব্যক্তি - /ɳiɳu ikoɳɳo baɟare e-ke -ɳe?/
  (তুই কখন বাজারে যাবি?)
  যুবক – আমি বিকেল চারটের সময় বাজারে যাব।
- বয়স্ক ব্যক্তি - /ɳiɳu ikoɳɳo ʃkule e-ke-ɳe?/
  (তুই কখন স্কুলে যাবি?)
  যুবক - আমি দশটার সময় স্কুলে যাব ।

---

[২] সরকার পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ , কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ১৬৩ ।

ভাষা সরণ (Language shift)

দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে যখন কোন সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে নতুন এক ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে ভাষা সরণ বলে (Language shift)। কোন সম্প্রদায়ে দীর্ঘকাল ধরে দ্বিভাষিক পরিস্থিতি বর্তমান থাকলে, ভাষা সরণ হতে দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে ভাষা সরণ হয়ে থাকে, যেমন—অভিবাসন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, বিদ্যালয়ের ভাষা, ভাষার উচ্চ মর্যাদা, সংখ্যালঘুর ভাষা ইত্যাদি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মালতো সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা গেছে। মালতো সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভাষা বলতে লজ্জাবোধ করে। পশ্চিমবঙ্গের মালতো সম্প্রদায়ের বয়স্ক লোকদের মধ্যেও নিজেদের ভাষা সম্পর্কে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মালতো সম্প্রদায়ের শিশুরা প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা অর্জন করে। শিশু-কিশোর ছাড়াও মালতো সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাড়ী, বাজার, মাঠ, রাস্তা প্রায় সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। মালতো সম্প্রদায়ের মানুষেরা জীবন-জীবিকার তাগিদে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছে। এমনকি তারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়, কেরালা প্রভৃতি স্থানে কাজ করতে গিয়ে হিন্দি এবং তামিল ভাষা শিখে নিচ্ছে।

উপসংহার

ভারতবর্ষের মতো দেশে ভাষা সংযোগ (Language contact) একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষজন পাশাপাশি বসবাস করে। এই সমস্ত মানুষদের ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথক পৃথক। তাই কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষজন যদি নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তবে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে মালতো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেখা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মালতো সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের পাশে তারা ভীষণ ভাবে সংখ্যালঘু । বর্তমানে মালতো সম্প্রদায়ের শিশু-কিশোর এবং যুবক-যুবতীরা প্রায় সর্বত্রই বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি মালতো সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যদি সচেতন না হন, তবে অদূর ভবিষ্যতে এরা পুরোপুরি বাংলা ভাষায় ‘Shift’ করে যেতে পারে। আমরা মালতো সম্প্রদায়ের ভাষার বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘Severly endangered language’ বলতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- চক্রবর্তী উদয়কুমার, চক্রবর্তী নীলিমা, ভাষাবিজ্ঞান, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬ ।
- নাথ মৃণাল, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯ ।
- শ’ রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২।
- সরকার পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২২।
- Fishman A. Joshua, who speakes what languages to whom and when, The Bilingualism Reader, Edited by Li Wei, Routledge, London and New York, 2001.

- Fishman A. Joshua, what do you loss when you loss your language, Stabilizing Indigenous Languages, Edited by Gina Contoni, A center for Excellence in Education Monograph, Northern Arizona university, 2007.
- Fishman A. Joshua, Maintaining Languages: what works and what doesn't, Stabilizing Indigenous languages, Edited by Gina Contoni, A center for Excellence in Education Monograph, Northern Arizona University, 2007.
- Hocket Charles F., A Course in Modern Linguistics, Oxford and IBH Publshing Co., New Delhi, 1970.
- Kabayashi Masato, Texts and Grammar of Malto, Kotoba Books, Vizianagaram, India, 1970.
- Landsberry Lauren, Defining Bilingualism, April 2019,
- Mahapatra Bijay Prasad, Malto – An ethnosemantic study, Central Institute of Indian Language, 1979.
- Myers-Scotton Carol, Multiple Voices An Introduction to Bilingualism, Blackwell Publishing, UK, 2006.
- Singh Uday Narayan, Bhattacharjee Bidisha, Chakraborty Rajib, Tripathi Arimardan Kumar, Languages and Cultures on the Margin, CFEL, Shantiniketan 2018.
- Thomson Sara G., Language contact an Introduction, Edinburgh University Press, 2001.
- Wardhaugh Ronald, An Introduction to sociolinguistics, Blackwell, UK, 2006.

Journal

- Jadavpur Journal of Languages and Linguistics, A Questionnaire Developed for Conducting Fieldwork on Endangered and Indigenous languages, Vol. 2, 2018.

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

ছড়া, গীতি, প্রবাদে ব্যবহৃত রাঢ়-বাগড়ির আঞ্চলিক ভাষা: একটি সমীক্ষা

দেবাশিস পাল

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত)

ARTICLE INFO

Article history:
Received 02/09/2024
Accepted 20/03/2025

সূচক শব্দ:
রাঢ়-বাগড়ি,
ছড়া-গীতি-প্রবাদ,
মিশ্র আঞ্চলিক ভাষা।

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

সমাজের মানুষই লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেই আঞ্চলিক ভাষা-সমাজ ও ইতিহাসের বীজ নিহিত থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় (ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়) ও বাগড়ি (ভাগীরথীর পূর্ব পাড়)-র বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত লোকসংস্কৃতির বাক্ কেন্দ্রিক উপাদানগুলি যেমন– ছড়া; মুসলমানী ভাষায় রচিত গ্রাম্যগীতি, কৃষক রমণীদের গীতি, বোলান গান, কবি গান; প্রবাদ-এ মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে।

প্রতিটি অঞ্চল বিশেষেই সেখানকার মানুষের পারিপার্শ্বিক নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও মননশীল বিকাশের ছাপ পড়ে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। আর ভৌগোলিক, সামাজিক, আঞ্চলিক সবরকম প্রভাবের ফলেই যে কোনো অঞ্চলের ভাষার রূপ গড়ে ওঠে। লায়েক আলী খানের মতানুযায়ী বলা যেতে পারে– ভাষাতাত্ত্বিকেরা আধুনিক বাংলা ভাষার যে কয়টি উপভাষার বিভাগ দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের উপভাষায় কমবেশি সবকটি বিভাগেরই ছাপ লক্ষ করা যাবে।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত বাগড়ি অঞ্চলে গ্রাম্য খেলায় শিশুদের দ্বারা ব্যবহৃত ছড়া ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থান সম্বন্ধীয় ছড়ায় ব্যবহৃত বাগড়ির মানুষের কথ্য ভাষার উচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহার লক্ষণীয়, যেমন–

১. ঐ দেখ চাঁদ, বুচকা বাঁধ,/বুচকা নিলো চোরে,/বুক দব্দর করে-এ-এ-এ।

২. নেপলে পুচলে মাটি,/সাইজলে গুজলে বিটি।

উপরিউক্ত ছড়ায় দেখা যায় শব্দের আদ্য 'ও' -কারের স্থানে 'উ' -কারের ব্যবহার যথা– বোচকা> বুচকা। এছাড়াও পদের শেষে স্বর প্লুত (করে-এ-এ-এ) করে উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়।

রাঢ় অঞ্চলের কৃষক রমণীদের গীতে রাঢ়ী উপভাষার বিশেষ কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যেমন–

আলগা কোর‍্যা বাঁধিনিখো/ বেঁধ্যাছিলাম দৌড়্যাতে
পড়াণ্‌-নাথ ছেড়্যা গ্যালা সই/ সন্ধ্যাব্যালার ঝটকাতে।

উপরিউক্ত গীতিটিতে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে 'এ'-কারের স্থানে 'অ্যা'-কারের ব্যবহার– ছেড়ে> ছেড়্যা, বেলা> ব্যালা ইত্যাদি।

Corresponding author's email ID: debasishpaldeba@gmail.com

বাগড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের নিভাষার নিজস্ব ঢঙে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত একটি প্রবাদ নারীর নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গির ঢঙে বা স্বরাঘাতে উচ্চারিত হওয়ায় বাগড়ি অঞ্চলের প্রচলিত রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার মিশ্রণ লক্ষণীয়–

শাগের মইধ্যে আখালি, কত রঙ্গ দ্যাখালি।

উপরিউক্ত প্রবাদে রাঢ়ী ভাষার বৈশিষ্ট্যে অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত (শাক> শাগ) হতে যেমন দেখা যায়, তেমনি আবার বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যে ‘এ’-কারের ‘অ্যা’- উচ্চারণও হয়েছে (দেখালি> দ্যাখালি)। আবার নিভাষায় ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ ‘আখালি’(ছোটো পাথরের টুকরো বিশেষ) এর ব্যবহারও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আলোচ্য প্রকল্পের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় ও বাগড়ি অঞ্চলে ব্যবহৃত, নির্বাচিত কিছু ছড়া, গীতি ও প্রবাদ-এ আঞ্চলিক কথ্য ভাষার মধ্যে মিশ্রভাষার যে, বীজ নিহিত আছে তা ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচিত হবে।

মুর্শিদাবাদ নগর কলকাতা থেকে উত্তরে দু’শ কিমি দূরে অবস্থিত। এই জেলার ভৌগোলিক সীমানা বারংবার পরিবর্তন ও প্রসারের মধ্য দিয়ে বর্তমান মানচিত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভাগীরথীর প্রবাহ এই জেলাকে রাঢ় (ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়) ও বাগড়ি (ভাগীরথীর পূর্ব পাড়) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। সীমানা পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের সংযুক্তির ফলে বিবিধ আঞ্চলিক মিশ্র উপভাষার বৈশিষ্ট্য এই জেলার ভাষায় রয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন এই জেলার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি উচ্চবর্ণের পাশাপাশি বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মানুষ যেমন—সাঁওতাল, মুণ্ডা ও চাঁই সমাজের বসবাসের ফলে তা হয়ে উঠেছে বহুবিচিত্র। লালবাগ, বহরমপুর, জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে রাঢ়ি, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডি, কামরূপী ও বিহারি ভাষার ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। একদা পূর্ববঙ্গ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত মানুষদের ভাষাও বঙ্গালী উপভাষার সংমিশ্রণে এই জেলায় মিশ্র ভাষাগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। ফলস্বরূপ দুই বঙ্গের ভাষার মিশ্রণের পাশাপাশি সংস্কৃতিরও মিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং প্রতিটি অঞ্চল বিশেষে সেখানকার পারিপার্শ্বিক মানুষের ব্যবহৃত নিজস্ব ভাষা ও মননশীল বিকাশের ছাপ পড়ে লোকসংস্কৃতির মধ্যে; যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বহুদিন যাবৎ সঞ্চিত চিন্তা চেতনা, অভিজ্ঞতালব্ধ বিচার ভাবনা ও লোক বিশ্বাস।

সমাজের মানুষই লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেই আঞ্চলিক ভাষা-সমাজ ও ইতিহাসের বীজ নিহিত থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় ও বাগড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত লোকসংস্কৃতির বাক্ কেন্দ্রিক উপাদানগুলি যেমন—ছড়া; মুসলমানী ভাষায় রচিত গ্রাম্যগীতি, কৃষক রমণীদের গীতি, বোলান গান, কবি গান; প্রবাদে মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে।

ভৌগোলিক, সামাজিক, আঞ্চলিক সবরকম প্রভাবের ফলেই যে কোনো অঞ্চলের ভাষার রূপ গড়ে ওঠে। লায়েক আলি খান ‘মুর্শিদাবাদের বাংলা লোকভাষা’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন—“ভাষাতাত্ত্বিকগণ আধুনিক বাংলা ভাষার যে কটি উপভাষার বিভাগ (রাঢ়ি, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডি, বঙ্গালী এবং কামরূপী) দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের উপভাষায় কম-বেশি সব কটি বিভাগেরই ছাপ লক্ষ করা যাবে।”[১] রাঢ় ও বাগড়ির আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত এমন কিছু শব্দ পাওয়া গেছে যেগুলো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের ভাষার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমন—

	রাঢ়	বাগড়ি	বাংলা শব্দ
১.	ডোলচি	বালটিন	বালতি
২.	হামারদের	হামারঘে	আমাদের
৩.	মুই	হাম	আমি

মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়-বাগড়ি অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া, গীতি ও প্রবাদে ব্যবহৃত আঞ্চলিক মিশ্র লোক ভাষার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা আলোচ্য নিবন্ধের বিষয় সীমা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত বাগড়ি অঞ্চলের গ্রাম্য খেলায় শিশুদের ব্যবহৃত কয়েকটি ছড়ায় আঞ্চলিক উচ্চারণ ও বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্যর ছাপ লক্ষ করা যায়, যা বাগড়ির মানুষের কথ্য ভাষার উচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহারকে নিশ্চিত করে, যেমন–

১. ঐ দেখ চাঁদ, বুচকা বাঁধ,
বুচকা নিলো চোরে,
বুক দদ্দর করে-এ-এ-এ।[২]

২. আশপাতা বাঁশপাতা ধুঁধুল ধরেছে
ওপারেতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে।[৩]

৩. বাঁশতলা দিয়ে জল যায়
পুঁটি মাছের গীত গায়
ও দুলাভাই আজকালকার ছেলেমেয়ে চেক্ জামা চায়
চেক্ জামা না দিলে বিহ্যা করতে চায়।[৪]

৪. কচি কচি পিয়ারা
কচির কি চিহারা
কচি যখন পাকবে
রাস্তার লোক দেকবে।[৫]

৫. আতিলেবু পাতি খাবো
তাই বোলে কি তুকে দিবো, তুকে দিবো….[৬]

৬. কাজল লতা বাইসপাতা,
হাম উসকো যাস কাতা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা….[৭]

৭. নেপলে পুচলে মাটি,

সাইজলে গুজলে বিটি।[৮]

বাগড়ির একটি প্রায় হারিয়ে যাওয়া আঞ্চলিক ব্রত যা 'ভিটকুমারীর ব্রত' নামে পরিচিত। মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের মধ্যেই এটি প্রচলিত। ফাল্গুন মাস জুড়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হয়ে থাকে এটি। এই ব্রতে নিয়মকানুনের থেকে বেশি আকর্ষণীয় নারী কণ্ঠে উচ্চারিত বিভিন্ন ছড়া যা সামাজিক পরিস্থিতির পাশাপাশি বঙ্গালী ও বাগড়ির মানুষের মিশ্র কথ্য ভাষার উচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরও ইঙ্গিত দেয়–

৮. ভিট কুমারীর মা লো, ভিটে বান্ধ্যা দে
তোর ছাওয়ালের বিয়া হবি, কোমর বান্ধ্যা নে।[৯]

৯. হারান ঠাকুর বরণে,
ফুল ছিটাবো চরণে
তুমি ঠাকুর কালো
সবার করো ভালো।[১০]

আবার রাঢ় অঞ্চলের একটি গ্রাম্য কবিতার মধ্যে এই অঞ্চলের ভাষা ও নতুন আঞ্চলিক শব্দের পরিচয়ও পাওয়া যায়–

১০. চঠুইয়েরে মটুইটি দুয়ারে বসো সা।
হাপুত মালার কাণফুড়নের লাডু বাঁধসা।[১১]

উপরিউক্ত ছড়াগুলোর মধ্যে রাঢ়-বাগড়ি অঞ্চলের ভাষার নিজস্ব কিছু রূপ যেমন দেখা যায়, তেমনি রাঢ়ি, বঙ্গালী উপভাষার সংমিশ্রণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। উপরিউক্ত ছড়াগুলোর নিরিখে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়া যাক–

১. শব্দের আদ্য 'ও'-কারের স্থানে 'উ'-কারের ব্যবহার যথা—বোচকা > বুচকা, তোকে > তুকে ইত্যাদি ।
২. পদের শেষে স্বর প্লুত করে উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—করে-এ-এ-এ।
৩. অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় পদের অন্তে 'য়'-এর স্থানে 'হ'-এর আগমন ঘটে। যেমন—বিয়ে > বিহ্যা।
৪. পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। পরবর্তী 'আ'-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'এ'-ধ্বনি 'ই'-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—পেয়ারা > পিয়ারা, চেহারা > চিহারা ইত্যাদি।
৫. পদের মধ্যে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—দেখবে > দেকবে।
৬. বঙ্গালী উপভাষার সংমিশ্রণের প্রভাবে অনেক সময় যুক্ত ব্যঞ্জন না থাকলেও শব্দের মধ্যে 'ই'-স্বরধ্বনির আগম ঘটছে। যেমন—সাজলে > সাইজলে।

সমাজস্থ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মানুষের ভাবনা ও মননের ফলস্বরূপ লোক সংগীতগুলি প্রজন্ম পরম্পরায় পরিবর্তিত ও সংযোজিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে যেমন গাজন ও বোলান গান রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে

ধর্মগীতি, বিবাহ সংগীত, পটুয়া সংগীত, আদিবাসী সংগীত, ভাদু গান, ভাজই গান, কবি গান, সাপ খেলানো সংগীত, মুসলমান বিবাহ গীতি, কৃষক ও কৃষক রমণীদের গীতি প্রভৃতি। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল তুলনামূলকভাবে বাগড়ি অঞ্চলের থেকে রুক্ষ ও শুষ্ক। তাই রাঢ় অঞ্চলের মানুষের কথায় গানে লোক-ভাবনায় কৃষি বিষয়ক ও প্রকৃতি বিষয়ক বিবিধ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, রাঢ় দেশের এক কৃষকের গীত—

১. হেঁড়ে কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে—দাদারে!
ঘুরে এসো বাড়ী। তুমার জন্য,—দাদারে।
ভেবে আমি মরি। ত্যানা ভিজ্যা যাইবে—দাদারে!
জাড় লাগবে গায়, কত ধান হবে—দাদারে!
কিন্‌বো দুধ্যাল গাই।[১২]

এক কৃষক রমণীর গীত—

২. আল্‌গা কোর‍্যা বাঁধিনিখো
বেঁধ্যাছিলাম দৌড়্যাতে
পড়াণ্‌-নাথ ছেড়্যা গ্যালা সই
সন্ধ্যাব্যালার ঝট্‌কাতে।[১৩]

রাঢ় অঞ্চলের কৃষকদের পূর্বরাগের একটি গীতি উল্লেখ করা হলো–

৩. দাঁড়িং নাছে কল্‌সী কাঁখে আড় লয়ানে চায়।
লাকে ললক্‌ পৈঁছে হাতে আটবেঁকি তার পায়।
পড়নে তার লীলাম্বড়ী করবী খোঁপায়
পড়ান্‌ মন মোর লিলে কাড়িং সাঁজেরো বেলায়।[১৪]

কৃষি-প্রধান রাঢ় অঞ্চলের ভাদ্র মাসে কুমারী মেয়েদের দ্বারা গীত ‘ভাজই’ গান–

৪. ভাজই মার আমার কি খাবার মন,
হাটের ট্যাঙারী মাছ বাড়ীর বেগুন।[১৫]

মুর্শিদাবাদ জেলার আদিবাসীদের বাসস্থান দীর্ঘদিন ধরে। মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে পূর্ব-রাঢ় অঞ্চলের ধামুয়া গ্রামে মুণ্ডা জনজাতির মানুষেরা ভাদ্রমাসে একাদশী বা পুর্ণিমা তিথিতে কৃষির উন্নয়নে ও ভালো ফসলের আশায় করম বা কারাম বা ডাল পূজার অনুষ্ঠান করে থাকে। এই মুণ্ডা জনসমাজে মহিলাদের দ্বারা গাওয়া গানের মধ্যেও আমরা এই জেলার একটি ভাঙা হিন্দি সহ মিশ্র ভাষা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাব, কয়েকটি সংগৃহীত গানের প্রথম দিকের কয়েক লাইন তুলে দেওয়া হলো—

৫. শুখালো ঝুনুর ভুজ
দিহা মা-ই তো, মাঠে যাপ,
যাহাই যাহাই পানি পাওয়াপ,
তাহায় তাহায় ভিজায় খাপ….
ট্যানায় বাঁন্ধে মুড়ে লান
দিহা মুইতো মাঠে যাপ।[১৬]

৬. ওই চালো ভেয়া হার যোতে,
যাবে মিলকে ডুবারি বিলার,
ডুবালকে ডুবাল খ্যাত,
কাঁন্দে লাগাল বহু-বেটি,
এসান বাড়কা ডুবারি বিলার কাঁন্দেরে কৃরষান।[১৭]

৭. শুনো শুনো মিনতি হামার, চারুরে রইলো চাঁন্দেনাক্যার রুপাডার…..
সাস কেহে ঘার সে নিকাল চ্যালি যা।[১৮]

উপরিউক্ত লোক গীতিগুলিতে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়-বাগড়ির ভাষা ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর রূপে পরিদৃষ্ট হয়। দেখা যাচ্ছে যে—

১. বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে 'এ'-কারের স্থানে 'অ্যা'-কারের ব্যবহার—ছেড়ে > ছেড়্যা, বেলা > ব্যালা, গেলা > গ্যালা, মেঘ > ম্যাঘ, উঠেছে > উঠ্যাছে, বেঁধে > বেঁধ্যা ইত্যাদি। বাগড়িতেও এইরকম প্রভাব প্রায়শই দেখা যায়।
২. আবার কোনো কোনো স্থানে রাঢ় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। কতকগুলি শব্দের অন্ত্য 'আ'-কারের স্থানে 'য'-ফলা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—দৌড়াতে > দৌড়্যাতে।
৩. অনেক সময় 'র' ও 'ড়'-এর স্থানে 'ঢ়'-এর ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—পরনে > পঢ়নে, কেড়ে > কাঢ়ি ইত্যাদি।
৪. কিছু স্থানে অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্ত্যভাগে 'ই'-কার ও 'ং' (অনুস্বার) সংযোগ করতে দেখা যায়। যেমন—দাঁড়িয়ে > দাঁড়িং, কাড়িয়া > কাঢ়িং ইত্যাদি ।
৫. পদের আদ্য 'ন'-স্থানে 'ল'-এর উচ্চারণ হয়। যেমন—নাকে > লাকে, নয়ানে > লয়ানে, নীলাম্বড়ী > লীলাম্বড়ী ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদের বাগড়ি অঞ্চলে বহরমপুর, লালবাগ মহকুমায় প্রচলিত প্রবাদকে অনেকেই 'শোলোক গাওয়া' বলে থাকে। কোনো অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত থাকে মানুষের ব্যবহৃত এককালের জীবন যাপনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়বস্তু। ফলত সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মুর্শিদাবাদের বাগড়ি

অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের নিভাষার নিজস্ব ঢঙে ব্যবহৃত প্রবাদগুলি লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। লোকমুখে ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রবাদগুলি উপদেশমূলক হলেও একটু ভালোভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে অর্থের মধ্যে দিয়ে রস সৃষ্টির প্রাধান্যই মূল লক্ষ্য। আবার মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ধামুয়া গ্রামে মুণ্ডা জনজাতির বাস, তাদের ব্যবহৃত দু'টি প্রবাদও সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত এমনই কিছু প্রবাদ যেগুলোর মধ্যে যেমন মুর্শিদাবাদের মিশ্র আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, ঠিক তেমনিই কিছু নতুন শব্দের সন্ধানও আমরা পাব। মুণ্ডা সমাজে প্রচলিত দুটি প্রবাদ—

১. ঘারনে নাখেই ভাত, দুয়ারনে বাজেইলা ডাক। (বাংলা অর্থ—ঘরে নাই ভাত, দুয়ারে বাজে ঢাক।)[১৯]
২. যেসান চিড়িয়া তেসান ঘার। (বাংলা অর্থ—যেমন পাখি, তেমন বাসা।)[২০]
৩. শাগের মইধ্যে আখালি কতরঙ্গ দ্যাখালি।[২১]
৪. উদে মাছ ধরে, খাটাইশে সাতভাগ করে।[২২]
৫. নক্কীর আমদানি নাই, প্যাঁচার খ্যাঁচখেঁচি।[২৩]
৬. মুখে মিটে লাগে যা, ভাতার পুতে পায় না তার।[২৪]
৭. খাইতে ভালো চাইল ভাজা, দ্যাখতে ভালো মুড়ি।[২৫]
৮. খড়ির দোষে আখা নষ্ট, গিন্নির দোষে বউ নষ্ট।[২৬]
৯. আগুন লাগলো রাজার ঘরে, এই সলকে সলক করে।[২৭]
১০. এহেতে ধলীর ধলা গা তাতে ধলী ছাওয়ালের মা, দ্যামাকে ধলীর (মাটিতে) পা পড়ে না।[২৮]

নারী ও পুরুষের নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গির ঢঙে বা স্বরাঘাতে উপরিউক্ত প্রবাদগুলি সত্যিই অনবদ্য। রাঢ় ও বাগড়ির ভাষা বৈশিষ্ট্যর পার্থক্য খুব বেশি না হলেও উচ্চারণ ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও শব্দ ব্যবহারের কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এই অঞ্চলের রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার মিশ্র বাগভঙ্গির সার্থক উদাহরণ এই প্রবাদগুলিতে, যে মিশ্র ভাষা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা দেখে নেওয়া যাক—

১. রাঢ়ির বৈশিষ্ট্যে কয়েকটি অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—শাক > শাগ।
২. আবার বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যে 'য'-ফলান্ত শব্দের মধ্যে 'ই'-স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে। যেমন—মধ্যে > মইধ্যে, চাল > চাইল, খট্টাশ > খাটাইশ ইত্যাদি।

আবার, অনেক ক্ষেত্রে 'এ'-কারের 'অ্যা'-উচ্চারণ হয়েছে, যেমন—দেখালি > দ্যাখালি, দেমাক > দ্যামাক, পেঁচা > প্যাঁচা, দেখতে > দ্যাখতে ইত্যাদি।

৩. অনেক স্থলে পদের আদ্য 'ল'-স্থানে 'ন'-এর উচ্চারণ হয়। যেমন—লক্ষ্মী > নক্কী ইত্যাদি।
৪. পদান্তের মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—মিঠে > মিটে।

মুর্শিদাবাদের রাঢ় ও বাগড়ি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ছড়া, গীতি ও প্রবাদে যে সকল আঞ্চলিক শব্দ পাওয়া গেছে সেগুলিকে একত্রে মূল বাংলা অর্থ সহ দেখানো হল—

	মুর্শিদাবাদের (রাঢ়-বাগড়ি) আঞ্চলিক শব্দ	বাংলা শব্দ
১.	দব্দর	ভয় পাওয়া
২.	হাম	আমার
৩.	নেপলে	মোছা
৪.	পুচলে	পরিষ্কার
৫.	ছাওয়াল	ছেলে
৬.	চঠুই	চড়ুই পাখি
৭.	হাপুত মালা	ছোট ছেলের প্রতি স্নেহসূচক সম্বোধন
৮.	কাণফুড়ন	কর্ণবেধ
৯.	চিড়িয়া	পাখি
১০.	বাজেইলা	বাজানো
১১.	উদে	উদবিড়াল
১২.	খাটাইশ	খট্টাশ
১৩.	ভাতার	স্বামী
১৪.	পুত	পুত্র
১৫.	খড়ি	জ্বালানি কাঠ
১৬.	আখা	উনুন
১৭.	সলক	আলো
১৮.	ধলী	(ফর্সা) মেয়ে
১৯.	ধলা	ফর্সা
২০.	জাড়	শীত
২১.	ট্যাঙারী	ট্যাঙরা মাছ
২২.	হেঁড়ে কোণ	বায়ু কোণ
২৩.	দুধ্যাল	দুগ্ধবতী
২৪.	দৌড়্যাতে	মোটা কাছি দ্বারা
২৫.	পড়ান নাথ	প্রাণনাথ
২৬.	ট্যানায়	কাপড়ের পুঁটলি
২৭.	চ্যালি	চলে
২৮.	আখালি	ছোটো পাথরের টুকরো
২৯.	ঝট্‌কা	প্রবল বায়ু

৩০.	আটবেঁকি	পায়ের বাঁকা মল
৩১.	পাওয়াপ	পাওয়া যাবে
৩২.	বিলার	বিল

তথ্যসূত্র

১. চন্দ্র, অ. (২০২০)। *মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্ত,* পঞ্চম খণ্ড, বহরমপুর: বাসভূমি প্রকাশন।
২. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, গ্রাম- মিলকী পাড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ।
৩. চুনাখালি- মিলকী পাড়া (বহরমপুর থানা) গ্রামের শিশুদের খেলার সময় সংগৃহীত ছড়া।
৪. পূর্বোক্ত
৫. পূর্বোক্ত
৬. পূর্বোক্ত
৭. পূর্বোক্ত
৮. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত
৯. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত
১০. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত
১১. চৌধুরী, প্রা. (১৯৮৮)। *গণকণ্ঠ,* বিশেষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা আ ১- আ ৪৩।
১২. চৌধুরী, প্রা. (১৯৮৮)। *গণকণ্ঠ,* পূর্বোক্ত
১৩. চৌধুরী, প্রা. (১৯৮৮)। *গণকণ্ঠ,* পূর্বোক্ত
১৪. চৌধুরী, প্রা. (১৯৮৮)। *গণকণ্ঠ,* পূর্বোক্ত
১৫. চৌধুরী, প্রা. (১৯৮৫)। *গণকণ্ঠ,* বিশেষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৭১- ১২৬।
১৬. ফুলেশ্বরী মুরারি, বয়স- ৫০, গ্রাম- ধামুয়া, থানা+ জেলা- মুর্শিদাবাদ।
১৭. ফুলেশ্বরী মুরারি, বয়স- ৫০, পূর্বোক্ত
১৮. ফুলেশ্বরী মুরারি, বয়স- ৫০, পূর্বোক্ত
১৯. চম্পা মুরারি, বয়স- ৪২, গ্রাম- ধামুয়া, থানা+জেলা- মুর্শিদাবাদ।
২০. গঙ্গামনি মুরারি, বয়স- ৫০, গ্রাম- চেতরাপাড়া, থানা+জেলা- মুর্শিদাবাদ।
২১. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।
২২. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।
২৩. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।
২৪. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।
২৫. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।
২৬. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।
২৭. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।
২৮. দিপ্তী পাল, বয়স- ৫৫, পূর্বোক্ত।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

কৃষিকাজ ও বাংলা শব্দভাণ্ডার

গোপীনাথ দাস

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received 02/01/2025
Accepted 01/04/2025

সূচক শব্দ:

অর্থ,
কৃষি,
কৃষিকাজ,
জীবিকা,
বাংলা,
ভাষা,
ভাষাতত্ত্ব,
ভাষাবিজ্ঞানী,
শব্দ,
শব্দভান্ডার,
সংস্কৃতি

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

বাংলা শব্দভাণ্ডার আজ বিপুলতায় সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির কারণ শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাংলা শব্দভাণ্ডারই নয়, সেইসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় আগন্তুক বহু শব্দেরও। এই আগন্তুক শব্দগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন সময় অনুপ্রবেশ করেছে। বাংলা ভাষা সেগুলোকে আত্তীকরণ করে নিয়েছে তার নিজস্ব আত্তীকরণ শক্তি দিয়ে। ফলে আজ আমাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল হয় যে সেগুলি আসলে বাংলা ভাষায় বাইরে থেকে আগত। আসলে বাংলা ভাষা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছে; এমনকি বর্তমান বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষদের শরীরেও যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন। ফলত ঐতিহাসিক বা সামাজিক কারণে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দের আত্তীকরণ সম্ভব হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবিরোধকে স্বীকার করেও বলা যায়, ভাষার শব্দভাণ্ডারে সেই ভাষাভাষীদের জীবিকা বা বৃত্তির একটা প্রভাব থাকেই। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর মতে, কাজের সূত্রেই মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের চূড়ান্ত পরিণতি ভাষার সৃষ্টি করে। কর্মপদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বিবর্তিত হয়েছে। শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই নয়, সমগ্র মানব সমাজের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল কৃষিকাজের আবিষ্কার। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, কৃষিকাজের আবিষ্কারই মানুষকে এক স্থায়ী খাদ্যসমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে মানুষের অনিশ্চিত জীবনযাপন ক্রমশ স্থায়ী ও নিশ্চিত হয়েছিল। এই সময় থেকেই মানুষের সভ্যতার জয়যাত্রার সূচনা হয়। এমনকি এই নিশ্চিত জীবনযাপনের অবকাশেই মানুষের মধ্যে ক্রমশ শিল্প-বোধেরও অঙ্কুর জন্মায়। এককথায় কৃষিকাজের আবিষ্কারকে মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম পর্যায় বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষিকাজের আবিস্কারের ফলে এই সময়ের শব্দভাণ্ডারের মধ্যেও যে বিভিন্ন কৃষিকাজ-কেন্দ্রিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল সেকথা সহজেই অনুমানযোগ্য। আজকের সময়ে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকলেও তাদের শব্দভাণ্ডারের মধ্যেও বিভিন্ন কৃষিকেন্দ্রিক শব্দের প্রচলন অল্পবিস্তর রয়েছে, কারণ একসময় সেই সমস্ত অঞ্চলের মানুষও প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য হয়তো কৃষিকাজের দ্বারস্থ ছিলেন। তাছাড়া বর্তমান সময়েও কৃষিকাজ সবার জীবিকা না

Corresponding author’s email ID: gopinathdas731234@gmail.com

হলেও কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমবেশি প্রায় সকলেই করেই থাকেন। বাংলায় যে সুপ্রাচীন কাল থেকে কৃষিকাজের প্রচলন ছিল, তার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া বাংলার সমাজ যে কতটা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা প্রমাণিত হয় বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষিকাজের যোগ থেকে। ফলে বাংলা শব্দভাণ্ডারেও যে কৃষিকাজের প্রভাব থাকবে তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত অনেক শব্দই মূল বাংলা শব্দভাণ্ডারে ব্রাত্য থেকে গেছে। কিন্তু একথাও সত্য যে বাংলা শব্দভাণ্ডারের অনেক শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বর্তমানে এইরকম শব্দগুলি কৃষিকাজের বাইরের পরিসরে ব্যবহৃত হলেও একসময় এইসব শব্দগুলি আসলে কৃষি-কেন্দ্রিক সমাজেই তৈরি হয়েছিল, পরে সেইসব গোষ্ঠী কৃষিকাজ ত্যাগ করলেও সেই শব্দগুলির ব্যবহার পরিবর্তিত বা একই অর্থে তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। তাছাড়া কৃষি ব্যবস্থা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শব্দভাণ্ডারেও নতুন নতুন কৃষিকেন্দ্রিক শব্দের উৎপত্তি ঘটতে পারে। আবার বাংলায় বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের আগমনের ফলে সেইসব ভাষা থেকে আগত বিভিন্ন কৃষিকেন্দ্রিক শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে। এছাড়াও বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদের উৎসও কৃষিকাজ থেকে। তাই বাংলা শব্দভাণ্ডারের মধ্যে কৃষিকাজের একটা প্রভাব রয়েছে সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্ব শাখার প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এখনও ভাষার উৎপত্তি নিয়ে প্রশ্নচিহ্নের নিরশন হয়নি। বিভিন্ন সময় ভাষার উৎপত্তি প্রসঙ্গকে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়ার কথাও শোনা গেছে। যেমন ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের ভাষাতত্ত্ব সমিতি কোনো অধিবেশনে ভাষার উদ্ভব বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ না পড়ার প্রস্তাব দেয়।[১] কিন্তু ভাষার জন্মরহস্য সম্পর্কে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। এ বিষয়ে অনেকটা কৌতুহল নিরশনের চেষ্টা করেছেন মার্ক্সবাদী ভাষাতাত্ত্বিক ও সমালোচকগণ। তাঁদের মতে '*শ্রম বা কজের মধ্যে মানুষ সংগঠিত হলে সাধারণ, জৈবিক ভাব প্রকাশের গণ্ডির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; তখন বলার ভাব ও কথার বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে যায়, ফলে তখন সরল আবেগপ্রকাশক বুলিকে ছাড়িয়ে জটিল ও প্রণালীবদ্ধ মানবভাষার বিকাশ ঘটে। কথা আবার অনুভবের বৈচিত্র্য আনে এবং দুইয়ের গুণফলে ভাষাও দ্রুত সমৃদ্ধ হতে থাকে।*'[২] ভাষার উদ্ভবের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাও প্রশ্নচিহ্নের উর্ধ্বে নয়। মার্ক্সীয় মতামত সম্পর্কে দু'রকম প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। একটি হল শ্রম ও ভাষাকে কারণ ও কার্যের পরম্পরা হিসেবে দেখা যায় কি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল মানুষকে যেহেতু বানর জাতীয় প্রাণীর বিবর্তন হিসেবে ধরা হয়, তাই বানর জাতীয় প্রাণীর ভাষা এবং মানব ভাষার মধ্যে বিবর্তন সঙ্গত কিনা।[৩] এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আজও পাওয়া যায় না। কিন্তু যেকোনো ভাষার শব্দগুলির উৎপত্তি যে মানুষের কার্যকলাপ ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। তাই গ্রীকরা যতদিন জলহস্তী দেখেনি, ততদিন পর্যন্ত গ্রীক ভাষায় ওই জীবটির কোনো নাম ছিল না, কিন্তু যেদিন ওই জীবটি তাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হলো সেদিন তাঁর নাম অর্থাৎ নতুন একটি শব্দ তৈরি হয়ে গেল হিপ্পোপতেম অর্থাৎ কিনা 'নদীর ঘোড়া'। যে জনগোষ্ঠী কোনোদিন আণবিক বোমার কথা শোনেনি তাঁর ভাষাতে ওই বস্তুর জন্য কোনো শব্দ থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক। ইংরেজি ভাষায় snow এবং ice দুটি শব্দ,

বাংলায় শুধু বরফ দিয়ে দুটোকেই বোঝানো হয় কিন্তু এস্কিমোদের ভাষায় কুড়িটি শব্দ। তারা বরফের বিভিন্ন রূপকে বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ পরিবেশন করে।..."[৪] এ উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। কয়েক বছর আগের বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া কোভিড-১৯ এর পরবর্তীকালে এই মহামারীর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন কোভিড, করোনা, লক ডাউন, কোভিশিল্ড ইত্যাদি। তেমনি কোনো জনগোষ্ঠীর বৃত্তি বা পেশাকে কেন্দ্র করেও ওই সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয় বা ওই সকল শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত ঘটনা বা বৃত্তি ভাষার কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রুশ ভাষাবিজ্ঞানী নিকোলাই মার 'সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভাষার পরিবর্তন হয়'[৫] বলে যে বিতর্কিত মন্তব্য পরিবেশন করেছিলেন, সেই বিতর্কের অবসান ঘটাতে স্বয়ং স্ট্যালিনকে কলম ধরে প্রমাণ করতে হয় যে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন রাশিয়ার কোনো ভাষার কাঠামোর পরিবর্তন আনতে পারেনি। তবে ভাষার শব্দভাণ্ডারে নিশ্চয় এর প্রভাব পড়েছিল।

কৃষিকাজ ও মানব সভ্যতা

মানব সমাজের ইতিহাসে এক গুরত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো কৃষিকাজের আবিষ্কার।[৬] কৃষির আবিষ্কার যেভাবেই হোক, কৃষি যে মানব সভ্যতার বুকে এক মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল একথা প্রায় সব সমাজবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। কৃষিকাজের আবিষ্কার অরণ্যচারী ও শিকারজীবী মানুষকে দিয়েছিল খাদ্যের সুনিশ্চিত সন্ধান ও স্থায়ী বাসস্থানের সুযোগ। সেই সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়েই মানুষের সভ্যতার বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। তাই মানব সমাজের কৃষির এই অভূতপূর্ব অবদানের নিরিখেই মানুষের ভাষার মধ্যেও (যদি কৃষিকাজের উদ্ভব ভাষা উদ্ভবের পর হয়ে থাকে) যে একটা গুরত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল—তা সহজেই অনুমানযোগ্য। কারণ কৃষিকাজ সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ, জমি, বীজ, শস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে এই উপকরণের বহর আরও বাড়তে থাকে। এবং ক্রমে বাণিজ্য, শিল্প, ইত্যাদি শুরু হয় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই। অর্থাৎ ক্রমে মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গেও কৃষিকাজ যুক্ত হয়। কৃষিকাজ যেহেতু প্রকৃতি-নির্ভর, তাই প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্য জাদুবিশ্বাসবশত মানুষ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন শুরু করে। এবং কৃষিকাজের ফলন বৃদ্ধির জন্য আচার-আচরণ আজও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিতে টিকে আছে, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন জেমস ফ্রেজার তাঁর *গোল্ডেন বাউ* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে।[৭] কৃষিকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সাক্ষী ছিল সেই সময়ের ভাষা। এই কারণেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নাল ভাষাকে সজীব পুরাবশেষ (Relic) বলে অভিহিত করেছেন।[৮] বর্তমানে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের মানুষই হয়তো কৃষিকাজ করেন না, কিন্তু আদিম অবস্থায় প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য তাঁরা কোনো না কোনো সময় কমবেশি কৃষিকাজের দ্বারস্থ হতে বাধ্য ছিলেন। আজকের সমাজ-সংস্কৃতি যেমন সেই আদিম সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তিত রূপ, তেমনই আজকের ভাষার মধ্যেও সেই আদিম কৃষিপ্রধান সমাজের উত্তরাধিকার কিছুটা থাকেই। তাছাড়া পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের খাদ্যতালিকার একটা বড়ো অংশ আসে কৃষিকাজ থেকে। তাই বর্তমানে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন জনগোষ্ঠীর ভাষাতেও কিছু কিছু কৃষিকেন্দ্রিক শব্দ পাওয়া যাবে। আবার এমন অনেক শব্দও বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত যার বুৎপত্তির মধ্যে কৃষিকাজের যোগ রয়েছে।

বঙ্গদেশে কৃষির প্রাচীনত্ব

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে কৃষিকাজের বিস্তার ছিল, তার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন "অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরাণ', 'কর্ষকান', 'কৃষকান' ইত্যাদি কথার তো বারংবার উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণি। এবং কোনো কোনো স্থানে ভূমি দান বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদোপজীবিদের, ব্রাহ্মণদের এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের দান বিক্রয়ের ব্যাপারেও বিজ্ঞাপিত করিতে হইতো।"[৯] এ প্রসঙ্গে তিনি খলিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের লিপি থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিসূত্র উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন প্রাচীন ভূমির পরিমাপ ছিল সর্বত্রই কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কুলব্যাপ, দ্রোনব্যাপ, আঢ়ব্যাপ বা আঢ়ক বা উন্মান এই সমস্ত মানই শস্য উৎপাদন সম্পর্কিত।[১০] বঙ্গদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকে খনার বচন, ডাকের বচন প্রচলিত। যেগুলি মূলত তৎকালীন কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কিত উপদেশবিশেষ। অলোককুমার চক্রবর্তী তাঁর *খনার বচন ও লোককৃষি*[১১] গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে শুধু বাংলা ভাষাই নয়, প্রতিবেশি ওড়িয়া ভাষাতেও প্রচলিত বহু একই প্রবাদের প্রচলন দেখা যায়। খনার বচনে বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের উল্লেখ পাওয়া যায় তারও একটা তালিকা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। বাঙালির সংস্কৃতিতে কৃষিকাজের যোগ বাংলার দীর্ঘকাল ধরে কৃষির অস্তিত্বের পরিচায়ক। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও যে কৃষিকাজ যুক্ত হয়ে আছে তা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বিভিন্ন কৃষি-দেবদেবীর। এইসব দেবদেবীরা বিভিন্ন এলাকায় এখনও পূজিত হন।[১২] যা কৃষিকাজের সঙ্গে বাঙালির আত্মিক যোগ সূচিত করে। তাছাড়াও বাংলা ভাষা যেহেতু আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বিবর্তিত রূপ, এই আর্য জনগোষ্ঠীর ভাষায় বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক শব্দের ছড়াছড়ি। যেমন অঙ্কুশ, সীতা, লাঙল, ক্ষেত্র কীনাশা, খিল, সৃণি ইত্যাদি।[১৩]

বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন সময় কৃষি-বিষয়ক শব্দের অনুপ্রবেশ

সময়ের স্রোতে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও কৃষিকাজ ও কৃষি-ব্যবস্থার বদল ঘটেছে। বাংলায় সুদীর্ঘকাল ধরেই বাইরের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে। গ্রিক, তুর্কি, ডাচ, ইংরেজ ছাড়াও প্রতিবেশী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতির প্রভাব তো প্রাচীন কাল থেকেই আছে। যখন বাংলা ভাষা সহ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম হয়নি, সেই সময়েও অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। সেই সময় আর্য গোষ্ঠী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর থেকেই কৃষিকাজের কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত হয়। ফলে তারাও অনেক কৃষিকাজ বিষয়ক শব্দকেও তাদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত করে। যেগুলির বিবর্তিত রূপ বাংলা ভাষাতেও রয়ে গেছে। বাংলা ভাষা যখন শৈশব অতিক্রম করেনি, তখন তুর্কি আক্রমনের পর মুসলমান শাসন শুরু হয়। তারও পর বাংলা দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, এই দুই কারণেই বাংলার সংস্কৃতিতে ইসলামি প্রভাব শুরু হয়। এমনকি বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> 'At the end of the 15th century and beginning of the 16th, we find that the Moslem king of Bengal and his lieutenants in Chittagong were active patrons of Bengali literature. But contact with the Moslems certainly brought in a number of Persian words into Bengali during the early period of Mohammedan rule. ...The Moslem *kazi* or district officer, who had control over the general administration, the Amin or governor, and in later times the *Fouj-dar* or military magistrate, as well as the revenue officials, brought to the people of Bengal Persian words connected with justice, revenue and general administration.'[১৪]

এই সমস্ত বিদেশি শব্দের প্রভাব শাসন ব্যবস্থা, জমিদারি ব্যবস্থাতে পড়লেও কৃষিকাজের জন্য সরঞ্জাম, কৃষিজ ফসল, কৃষিকাজের কলা-কৌশল ইত্যাদির ওপর সেভাবে পড়েনি। কারণ তারা এই সমস্ত ব্যবস্থায় সেরকম কোনো যুগান্তকারী বদল আনতে পারেনি। তাই মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে যে সমস্ত কৃষিবিষয়ক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি মূলত চিরাচরিত ব্যবহৃত তদ্ভব, বা অস্ট্রিক শব্দ থেকে আগত। কিন্তু শাসন-ক্ষমতার অধিপতি থাকার জন্য শাসনব্যবস্থা, জমি বিলিবণ্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম-কানুন চালু হয়। যার দরুণ কিছু পারসি, তুর্কি, আরবি ইত্যাদি কৃষি-বিষয়ক শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারে প্রবেশ করে। যেমন জমি, জরিপ, আমিন, পাট্টা ইত্যাদি। এছাড়াও কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, শস্যের প্রকারভেদ, চাষের মরসুম ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সমস্ত শব্দ বর্তমান বাংলা ভাষায় প্রচলিত, তার বেশিরভাগই আরবি-ফারসি থেকে আগত। ডাচ, ফরাসি ইত্যাদি বণিকরা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে তাঁদের সেরকম প্রভাব লক্ষ করা যায় না। উনিশ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির হাত ধরে ইংরেজ শক্তি ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতর্ষের শাসনক্ষমতা কায়েম করে। তারা জমি বিলিবন্টন সম্পর্কিত পুরনো শব্দগুলিকে বজায় রেখেও নতুন কিছু শব্দের প্রবর্তন করে। যেমন রেভিনিউ, ল্যাণ্ড, রেকর্ড ইত্যাদি। যেগুলির ব্যবহার মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময় তারা বাংলা কৃষি উৎপাদনের সেরকম কোনো বদল আনতে পারেনি। বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জমিদার ও শাসকের বিরুদ্ধে সংগঠিত কৃষকদের বিদ্রোহ বিভিন্ন নতুন নতুন শব্দের প্রচলন শুরু হয়। যেমন আধিয়ার, আধিপ্রথা, তেভাগা ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষার আধিপত্য বিস্তারের ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও ইংরেজি শব্দের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে চাষবাসে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ সেই সব শব্দের নাম বেশিরভাগই ইংরেজিজাত। যেমন ট্র্যাক্টর, হারভেস্টর, পাম্প, পাওয়ার টিলার, পাইপ, মেশিন, টিউবয়েল, ক্যানেল, ইউরিয়া, পটাস ইত্যাদি। কৃষিপদ্ধতিতেও ক্রমাগত চিরাচরিত পরিভাষার পরিবর্তে ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও এগুলি মূলত কৃষিবিজ্ঞানের পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এগুলির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রেও বৃদ্ধি পাবে, একথা বলাই বাহুল্য।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সময়ে নানান কৃষি-কেন্দ্রিক শব্দ প্রবেশ করেছে। কিন্তু বাংলা শব্দভাণ্ডারে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব কিছু শব্দ ছিলই। যেগুলি প্রায় সবই তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশি শব্দ। আসলে কৃষি-কেন্দ্রিক শব্দের বেশিরভাগই প্রচলিত অভিধানগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এইসকল শব্দগুলি মূলত লৌকিক স্তরেই ব্যবহৃত হয়, বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেগুলির প্রচলন কদাচিৎ। বিভিন্ন লৌকিক শব্দের অভিধানে ছাড়াও কিছু স্থানীয় সাহিত্যে

এগুলির প্রচলন দেখা যায়, মানুষের লৌকিক স্তরে ব্যবহৃত হয় বলে শব্দগুলির মধ্যে বাংলা কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে এগুলির মূল্য অপরিসীম। কিছু কিছু শব্দ সর্বস্তরেও ব্যবহৃত হয়। কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত কিছু শব্দের তালিকা তুলে ধরা হল—

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ —অরহড়, অড়র, অঙ্কুর, আউশ (< আশু), আঁকুর, আঁটি, আখ, ইক্ষু, আখোঁড়া, ইন্দ্র, ইন্দ, গড়, কচু, কানালি, কারান (< কর্ষণ), কুলা, কুলিয়াখারা (< কোকিলাক্ষ), কুশ, কোদাল, খড়, খামার, খুদ, খেত, খেপ, গর্তিকা, গাভী, গল্লা, গাবিন (< গর্ভিনী), গাবা (< গর্ভ), গণ্ডক, গোয়াল, গোঁড়া, গোপথ, ঘসি, ঘাস, ঘুটিং, চাকা, চাষ, ছই, ছাঁদা (< ছন্দ), ছামু (< সম্মুখ), ছিঁচ (< সেচ), জাত, ডাং (< দণ্ড) ইত্যাদি।

অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ভাষা থেকে প্রাপ্ত দেশি শব্দ —আইড়, আউড়ি, আল, আকাল, আলতি, উপড়ানো, এঁড়ে, কলমি, কাঁড়া, কামিন, খাঁচি, গাদা, ঘাঁটি, জাব, জালি (কচি), ডাংরা, ঢেঁকি, ঢোল ইত্যাদি।

আরবি, পারসি, তুর্কি, ইংরেজি ইত্যাদি থেকে আগন্তুক শব্দ—আইন, আড়ৎ (ফসল বিক্রয়ের দোকান), আড়ৎদার (আড়তের মালিক), আদায়, আমিন, আবাদ, আয়মা, আয়মাদার, ইউরিয়া, এজমালি, এজেস্ট্রি (< রেজিস্ট্রি), কদু, কয়ালি (শস্য ওজনকারী), কানুনগো, ক্যানেল, খাস, চাকলা, জমি, জরিপ, দর, দাদন, পটাস, পরগণা, পেস্কার, ফসল, ফোরে, মুহরি, রবি (শীতকালীন ফসল) ইত্যাদি।

কৃষিবিষয়ক শব্দের ব্যাপকতা

কৃষিকাজে ব্যবহৃত শব্দগুলি যে শুধুমাত্র কৃষিকাজেই ব্যবহৃত হয় তা নয়। বিশেষ করে বাংলার মানুষের কাছে কৃষিকাজ সমগ্র জীবনের সঙ্গেই সংযুক্ত। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অধিকাংশই কৃষিজীবী, তাছাড়া বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে কৃষিকাজের ভূমিকা যে কত ব্যাপক তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কোনও গোষ্ঠী বা পরিবার কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করলেও তাদের ভাষায় কৃষিকাজের ব্যবহারকে অনেকাংশ ধরে রাখে, এমনকি সেই সমস্ত পরিবারে কৃষিকেন্দ্রিক ব্রত বা আচারও পালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক শব্দের উৎস কৃষিকাজ থেকে হলেও সেই শব্দগুলির অর্থ বিস্তৃত হয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অর্থ পরিবর্তিত হয়েও অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে প্রচলিত মহাকাব্য *রামায়ণ*-কে কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার রূপক বলে মনে করেন। এই মহাকাব্যের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র কৃষি-সভ্যতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *রামায়ণের উৎস কৃষি* গ্রন্থে।[১৫] নিচে বেশ কিছু শব্দের সব রকম অর্থ সহ উল্লেখ করা হলো—

শব্দ	বুৎপত্তিগত অর্থ	বিস্তৃত/পরিবর্তিত অর্থ	বিস্তৃত/পরিবর্তিত অর্থের ব্যবহার
অকালপক্ক	অকালে পাকা	নির্দিষ্ট বয়সের আগেই সব কিছু জেনে গেছে এমন ব্যক্তি	এই অকালপক্ক ছেলেটার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।
অঙ্কুর	যা বীজ থেকে উদ্গত হয়	সূচনা, প্রকাশ	ওর কাজটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।
অন্ন	ভাত	ভক্ষণযোগ্য যে কোনো বস্তু	আমার অন্নের অভাব নেই

অহল্যা	যেখানে হল কর্ষণ হয়নি	পৌরাণিক চরিত্র বিশেষ।	পাষানী অহল্যা।
আবাদ	চাষ	সংস্কার সাধন	'আবাদ করলে ফলতো সোনা'
উৎকৃষ্ট	সঠিকভাবে কর্ষিত	উৎকর্ষযুক্ত, উন্নত	উৎকৃষ্ট মানের মেধা
কৃষ্টি	কর্ষিত	সংস্কৃতি	আমাদের কৃষ্টি উন্নত
কচু	শস্যবিশেষ	তুচ্ছ বস্তু	তোর কাছে কচু আছে!
টুসু	তুসজাত	লোকপার্বণ বিশেষ	টুসু পরব
তেল	তিলের নির্যাস	যেকোনো স্নেহ জাতীয় নির্যাস, এমনকি রাসায়নিক জ্বালানিও	কেরোসিন তেল, সরষের তেল
ধাড়ি	যে বাচ্চা ধারন করেছে	বড়, বয়স্ক	ধাড়ি মেয়ে লজ্জা লাগে না বাইরে যেতে?
ঢেঁকি	শস্য পেষাইয়ের যন্ত্র	কাজে লাগে না এমন	অকর্মার ঢেঁকি
পগার	মোটা আল	যা আয়ত্তাধীন নয়	পগার পার হয়ে গেছে
গোরু	গৃহপালিত জন্তু	নির্বোধ	গোরুটা অঙ্ক বুঝতে পারে না
রোপন	ক্ষেতে শস্যবীজ লাগানো	যে কোনো কিছুকে মাটিতে পোঁতা	'ফসল ফলানো মাটিতে রোপন করবো তোকে এবার'
ঢ্যাঁড়স	সব্জি বিশেষ	মূর্খ	তুই একটা ঢ্যাঁড়স
তিল	তৈলবীজ বিশেষ	ক্ষুদ্র	এক তিল জায়গা
সীতা	হলকর্ষণের রেখা	রামায়ণের চরিত্র, জনকের কন্যা, রামের স্ত্রী,	'সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণি।'

বাংলা ভাষায় এমন অনেক প্রবাদ প্রবচনের উল্লখ পাওয়া যায় যেগুলি কৃষিকাজ-কেন্দ্রিক হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, কৃষিকাজ মানুষের আদিম জীবিকা বলে এগুলিকেই কৃষিকাজের প্রেক্ষিতেই উদ্ভূত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পরবর্তীকালে অর্থবিস্তারের ফলে এগুলির ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রেও শুরু হয়। বিস্তৃত অর্থসহ এরকম কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা হল—

১. দূর থেকে সরষে ফুল ঘন বলেই মনে হয়- দূর থেকে সবকিছু সুন্দর মনে হওয়া।
২. ধর কোদাল দে মাটি- অতিতৎপর।
৩. আগ নাংলা যেদিকে যায় পাছ নাংলা সেইদিকে ধায় – অন্যের অন্ধ অনুকরণ।
৪. জমির অভাবে উঠোন চষা – কাজ না থাকলে ক্ষতিকর কাজ করা।
৫. থাকতে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল – যন্ত্র উপকরণ থাকা সত্বেও যে কাজে লাগায় না তার দুঃখ চিরকালীন।

উপসংহার

ইদানীং প্রযুক্তিগত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পৃথিবীর সব ভাষার মতো বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকেও প্রভাবিত করছে। কৃষি মানুষের আদিম জীবিকা হলেও কৃষি-পদ্ধতিগত বিভিন্ন চিরাচরিত টার্ম-এর ব্যবধান খুব কম দূরত্বের মধ্যেই লক্ষণীয়। আসলে কৃষিজীবী মানুষের গতিবিধি মূলত নিজস্ব এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই কৃষিকেন্দ্রিক শব্দের ব্যপ্তি। তবে সাধারণ কিছু কিছু কৃষিকেন্দ্রিক শব্দ বাংলা ভাষায় আছেই। একটা সময় কৃষিকেন্দ্রিক শব্দগুলিই বেশিরভাগ মানুষের ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হতো। কারণ সমাজে কৃষিকাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে কৃষিকাজ হীন এবং শোষিতের বৃত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় বলে কৃষিকাজ অন্য বৃত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। বরং অন্য সমস্ত বৃত্তিই কৃষিকাজকে প্রভাবিত করে। অনেকক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদন নির্ভর করে শিল্পপতিদের চাহিদার ওপরেও। তাই বর্তমানে শব্দভাণ্ডারে যে সমস্ত কৃষিবিষয়ক শব্দ প্রবেশ করে সেগুলি কৃষিজীবি সমাজ থেকে সৃষ্ট নয়, তার সঙ্গে অনেকাংশে জুড়ে থাকে বাজার বা পুঁজি সম্পর্কিত ধারণাও। সেসব শব্দের উৎপত্তিও লাভ করে তাঁদের হাতেই। কৃষিজীবীদের নিজস্ব শব্দে যতটা তাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে অ-কৃষিজীবীদের (মূলত শিল্পপতিদের) দ্বারা সৃষ্ট শব্দে ততটা সম্ভব নয়। শুধু কৃষিকাজের পরিসরেই নয়, এর বাইরেও ভাষার একটা মান্য রূপ দিতে গিয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী সমাজের ভাষার ওপর গুরুত্বপ্রদান মানুষের জীবনের সঙ্গে শব্দের যে বন্ধন সেটা যে অনেকাংশে কমিয়ে দেবে তা বলাই বাহুল্য। '*আসলে ভাষা চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বলেই ফ্যাসিবাদী চিন্তার বিস্তার ঘটাতে ভাষাকে ফ্যাসিবাদের ছাঁচে ঢালাই করতে হয়, যেভাবে পুঁজিবাদের ছাঁচে জন্ম নিয়েছে নব্য সেমান্টিক্স-এর শাখাপ্রশাখার বর্তমান ও আগামীর বিস্তারকে ধারণ করে রয়েছে ফ্যাসিবাদ ও পুঁজিবাদের যোগসাজসে নির্মিত কিম্ভূত শব্দকল্পদ্রুম, মানুষের চেতনা ও কামনাকে বিকারগ্রস্ত করতে যার বাস্তবিক অস্তিত্ব আড়ালে আবডালে কৌশলে বর্ধনশীল, যাকে চোখে দেখা যায় না।*'[১৬] কৃষিকাজের ওপর এই পুঁজিবাদের প্রভাব ধনতান্ত্রিক সমাজের ফসল। তাই বলে শব্দভাণ্ডারের ওপর কৃষিকাজের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। যেকথা বাংলা শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উল্লেখপঞ্জি

১. সরকার, পবিত্র; (১৪২৫), ভাষা দেশ কাল, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, পৃ. ৫।

২. তদেব পৃ. ৭।

৩. তদেব।

৪. দাশ, শিশিরকুমার; (১৪২৪), ভাষাজিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃ. ২৭।

৫. ধর, প্রসূন; (২০২২), মার্কসিজম অ্যান্ড প্রব্লেমস অব লিঙ্গুইস্টিক্স ভাষাতত্ত্বে স্ট্যালিনের অবদান, সংবর্তক পত্রিকা, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, পৃ. ২৫০।

৬. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ; (২০১৯), লোকায়ত দর্শন, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স।

৭. ফ্রেজার, জেমস; (২০১৬), গোল্ডেন বাউ, ঢাকা, বিপিএল।

৮. বার্নাল, জে. ডি.; (২০২২), ইতিহাসে বিজ্ঞান, কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪০।

৯. রায়, নীহাররঞ্জন; (১৪২৭), বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২০৪।

১০. তদেব, পৃ. ২০৫।

১১. চক্রবর্তী, অলোককুমার; (২০১৩), খনার বচন ও লোক-কৃষি, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক।

১২. ঠাকুর, স্বপনকুমার; (২০২০), বাংলার কৃষিকাজ ও কৃষিদেবতা, কলকাতা, খড়ি প্রকাশনী।

১৩. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ; (২০১৮), ডায়ালেকটিকস অফ ল্যান্ড ইকোনমিকস অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা, দীপায়ন, পৃ. ২৫।

১৪. Chatterji, Suniti Kumar (1926), The origin and development in Bengali language, part-1, Calcutta, Calcutta university press, page 203.

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ; (১৯৫৮), রামায়ণের উৎস কৃষি, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬. ভট্টাচার্য, শঙ্খদীপ; (২০২২), পুঁজিনিষ্ঠ বাচন: ভাষার নব্য সেমান্‌টিক্‌স, সংবর্তক পত্রিকা, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, পৃ. ২৭৮।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

নারীর গানে নারীর কথা: ভাদু ও টুসু

মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 07/09/2024
Accepted 15/03/2025

সূচক শব্দ:
বঙ্গসংস্কৃতি,
নারীহৃদয়,
ভাদু-টুসু,
প্রাণের ভাষা।

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

রাঢ় বাংলার দুটি জনপ্রিয় লোকসংগীত হল ভাদু ও টুসু। কালের বিচারে ভাদু যেমন ভাদ্র মাসের গান, টুসু তেমন পৌষ মাসের গান। ভাদু ও টুসু গানের কেন্দ্রবিন্দুতে ভাদু ও টুসু নামক দুই পৃথক পৃথক দেবী থাকলেও, শেষ পর্যন্ত ভাদু ও টুসু গান সমস্ত নারীমনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার বার্তাবাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী জীবনের চাওয়া-পাওয়া, পূর্ণতা-অপূর্ণতাই এই গানগুলির মূল বক্তব্য ; আর সেই নারী কখনও কুমারী কখনও বিবাহিতা। গ্রাম্য নিরক্ষর কবিদের দ্বারা ভাদু ও টুসু গান রচিত হলেওতাঁদের লেখায় নারীর সহজ জীবনচর্যার পরিচয় খুব সহজেই ধরা পড়তে দেখা গেছে।

বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণ হলো সংগীত; সংগীতেই বাঙালি মানসের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। সংগীত ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা রচিত হলেও এর মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ানুভূতিটুকুই ব্যক্ত হয় না, তার পরিবর্তে সমগ্র সমাজের হৃদয়ের স্পন্দন এবং অভিজ্ঞতাও প্রতিফলন ঘটেতে দেখা গেছে। গ্রাম বাংলার নারী সমাজের হৃদয়োচ্ছ্বাসের বিচিত্র ও অকপট প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় ভাদু ও টুসু গানে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়- *“যাহারা এই গান গাহে, ইহা তাহাদেরই বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত; সেইজন্য ইহার মত আন্তরিক আর কিছু নাই। ইহা নারীর মনের পুরুষোচিত কৃত্রিম জীবন কথা নহে, ইহা নারী কতৃর্ক নারী জীবনের আন্তরিক স্বীকারোক্তি। জীবনের রস ইহাতে যেমন উজ্জ্বল, তেমনই নির্মল।”*

Corresponding author’s email ID: drmausumirchithi@gmail.com

রাঢ় বাংলার ঘরের মেয়ে ভাদু। তাই রাঢের বাগদি, বাউরী প্রভৃতি নিম্ন জাতির মেয়েদের মত নিতান্ত অল্প বয়সেই কৃষি কর্মে সাহায্যের জন্য মাঠে যেতে হয়; যদিও সেই সব কাজে ছোট্ট ভাদু ততটা পটু নয়। একটি ভাদু গানে তার সেই অপটুতারই পরিচয় মেলে—

"বাঁধের নিচে জমি নীলাম কাদাতে হাল লাগে না,
আমার ভাদু শিশু ছেলে জল বাগাতে জানে না।"

শুধু তাই নয়, ছোট্ট ভাদু রাঁধা বাড়াতেও খুব একটা দক্ষ নয়—

"আঁদাড়ে পাদাড়ে ঝিঙ্গে এই ঝিঙে তুই ধরিস্ না,
আমার ভাদু পিন্ডি জ্বেলে ঝিঙে রাঁধতে জানে না।"

টুসুর অবস্থাও ভাদুর মতই। দেখতে দেখতে রাঢবঙ্গের শিশু কন্যাটি বড় হয়ে ওঠে। আর বড় হওয়ার পরে নারীর স্বাভাবিক ইচ্ছা অনুযায়ী তার মধ্যে জাগে অলংকার পরার প্রবণতা। একটি টুসু গানে পাই—

"নাকে নোলক কানে কান পাশা
টুসু করে না কারে আশা।"

শুধু অলংকার পরলেই তো হবে না। যেহেতু রাঢ়ের মেয়ে টুসুর গায়ের রংটি কালো সেই কারণে টুসু হলুদ মেখে তার রংটি উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছে। সেই কথার পরিচয় রয়েছে একটি টুসুগানে—

"কে বলে রে কে বলে রে, আমার টুসু কালো রে,
বিষ্টপুরী হলুদ এনে, গা করিব আলো রে।"

এইভাবে হলুদ মেখে, পরিপাটি করে চুল বেঁধে, খোঁপায় বেলকুঁড়ি দিয়ে, হিমানী পাউডার মেখে, দু হাতে চুড়ি নাকে নোলক পরে টুসু সজ্জিত হয়। যদিও তার এহেন সাজসজ্জা অনেক সময় অন্যের ঈর্ষার উদ্রেক করে, আর তখন তাদের বলতে শোনা যায়—

"আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝল্‌মল্ করে লো,
উয়ার টুসু অভিমানী আঁচল পেতে মাগে লো।"

দুই পাড়ার দুই মেয়েকে নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে যতই প্রতিযোগিতা চলুক না কেন, দুটি সমবয়সী মেয়ে কিন্তু নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বই পাতাতে চায়, আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফুল পাতানো'—

"মাগো, আমি ফুল পাতাব ফুলকে আমার কি দিব,
পয়সা লিব বাজার যাব, ফুলকে ফুলেল তেল দিব।"

দেখতে দেখতে রাঢ়ের মেয়েটি বড় হয়ে ওঠে। তার দেহে যৌবনের সমাগম হয়। একটি উপমার সাহায্যে তার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে—

> “একলা ঘরে টুসুর মন কেমন করে
> যেন শোল মাছে উফাল মারে।”

যৌবনবতী টুসুকে সময়মত বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না বলে তার পরিবারকেও কম কথা শুনতে হয়নি—

> “কেমন তোদের মা - বাপ, দিদি, কেমন তোদের হিয়ে,
> অতবড় ধুমড়ো মাগী না দিয়েছে বিয়ে।”

কেউ কেউ আবার টুসুর ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখিয়ে বলে ওঠে—

> “টুসুর মাগো, টুসুর মাগো, টুসুর বিয়া দাও এসে,
> আইবড়াতে জাঁতি হাতে লাতি কোলে লাও এসে।”

তারপর সত্যি সত্যিই রাঢ়ের মেয়ে টুসু ওরফে ভাদুর বিবাহের দিনটি উপস্থিত হয়। বিবাহ উপলক্ষে পালিত হয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে রয়েছে নয় জন এয়োর উপস্থিতির কথা, জল সইবার কথা, বরণডালা সাজানোর কথা, আলপনা দিয়ে ছাঁদনাতলা সাজানোর কথা—

> “সাধের ভাদুর বিয়ে!
> পাড়া গিয়ে গিয়ে ডেকে আন ন'জন মেয়ে;
> সাধের ভাদুর বিয়ে!
> ....
> বলি ও সরলা, ভাদুর বিয়ে, সরল মনে সাজালো বরণডালা
> কাঁঠালপাতা তুলে আন্‌লো সাজালো সন্দেশথালা।”

যাইহোক, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর আদরের কন্যাটিকে চলে যেতে হয় পতিগৃহে। কিছুদিন পর আবার টুসু পিতৃগৃহে এসে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু তা দিনকয়েকের জন্য মাত্র। ইতিমধ্যেই পিতৃগৃহ থেকে কন্যাকে নিজ গৃহে নিয়ে যাবার জন্য জামাই এসে উপস্থিত হলে আদরের টুসু অশ্রুজলে মায়ের নিকট বিদায় চায় এইভাবে—

> “হলুদ তেল ডগমগ দাও, মা, বিদায় দাও টপ করে।
> পায়ে আলতা, কুলি কাদা তাই এসেছে লিতে গো,
> হেরাইলো সিঁদুরের খাঁড়ি মন সরে না যেতে গো।”

তবুও চলে যেতে হয়। আর সেই কারণেই চোখের জলে বিদায় দিতে হয় আদরের কন্যাকে। সাধ রয়ে যায় কন্যার সুন্দর ভবিষ্যতের। কিন্তু সবার ভাগ্যে তো সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ জোটে না। তাই বিবাহের পূর্বে শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে টুসুর মনে যে বিভীষিকা ছিল, সেই বিভীষিকা যেন সত্যি হয়ে দেখা দিল টুসুর জীবনে। সেখানে ছিল শাশুড়ি ও ননদের দেওয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, ছিল ভাদ্রবধূর প্রতি ভাসুরের অহেতুক কৌতুহল প্রদর্শন—

“ই চালে পুঁই উ চালে পুঁই পুঁইয়ের খাব মেচুরি,
আর যাব না শ্বশুর বাড়ি ধইরে মারে শাশুড়ী।”

এসব সহ্য করা যায় যদি স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া যায়। সদ্য বিবাহিতা মেয়েটির আন্তরিক কামনা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে এখানে এইভাবে—

“আয়না চাইনা, চিরুন চাই না, চাইছি বঁধূ তোমারে,
তুমি যখন চাক্‌রি
যাবে মনে রেখো আমারে।”

কিন্তু হতভাগিনী মেয়েটির কপালে স্বামীর সুখ নেই; কেননা তার স্বামীকে অধিকার করে নিয়েছে অন্য এক নারী, যে সম্পর্কে তার সতীন। বাঙালি নারী সব অত্যাচার সহ্য করতে পারে, কিন্তু সতীনকে মেনে নিতে পারে না। তাই সতীনকে জব্দ করার ইচ্ছা ও প্রকাশিত হতে দেখা যায় একটি টুসু গানে—

“এক গাড়ি কাঠ দু -গাড়ি কাঠ কাঠে আগুন লাগাবো,
যখন আগুন হুদহুদাবে সতীনকে ঠেলে দিব।
সতীন আমার জনমের বাদী।”

টুসুর এই প্রতিশোধস্পৃহার পিছনেও রয়েছে একটি কারণ- স্বামীর হৃদয়ে একচ্ছত্র অধিকারের প্রতিষ্ঠা। দুর্ভাগ্যবশত টুসুর ভাগ্যে সেই সুখ না থাকলেও স্বামীকে ছেড়ে, স্বামীর সাজানো সংসার ছেড়ে কি নারীর পক্ষে থাকা সম্ভব! তাই মনের মধ্যে অনেক দুঃখ বরণ করে নিয়েই মেয়েটিকে বেঁচে থাকতে হয়। আর তার বেঁচে থাকার রসদ ওখুঁজে নিতে হয় তাকে এইভাবে—

“ওলো মকর পরবে
তোদের গুঁড়ি কুটে দেয় মরদে
ও লো মকর পরবে।”

আপাতদৃষ্টিতে টুসুর এই কথায় কিছুটা ঈর্ষা ও ক্ষোভ থাকলেও জীবনের শাশ্বত বৃত্তি এবং সহজ-সরল প্রাণের ভাষাকে অবলম্বন করে এই সংগীতগুলি রচিত হয়েছে বলে এগুলির মূল্য অনস্বীকার্য।

টুসু উৎসব কোনো শাস্ত্রীয় কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক শস্যোৎসব; আর সেই কারণেই টুসু গানে নারী-নারীর গার্হস্থ্য জীবনের কথা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একই কথা বলা যায় ভাদু গানের ক্ষেত্রেও। আর্যেতর সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে, পৌত্তলিকতার ধ্বজা ধারণ করেও শেষ পর্যন্ত এটি সাধারণ জনমানবের সুখ-দুঃখের গানে পরিণত হয়েছে। কখনও কখনও আবার এই ধরনের গানগুলিতে ছড়ার অসংলগ্ন ভাবটিও মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, ভাবে, ভাষায়, চিত্রকল্পে, নাটকীয়তায় ভাদু ও টুসুর নূতন নূতন সংগীতধারা নারী জীবনের মধ্য দিয়ে অনন্ত প্রবাহে মিশে গিয়েছে; আর জিজ্ঞাসু মানুষের কাছে রেখে গিয়েছে এক অনন্ত বিস্ময়ের ভাষা—

> "মাথা ঘষে রইলাম বসে কাল চিতল পাথরে,
> মা বাপ আছে দূরান দেশে প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
> ঝিকিমিকি প্রাণ কেমন করে।।"

গ্রন্থপঞ্জি

১. ভট্টাচার্য, আ., *বাংলার লোকসাহিত্য,* তৃতীয় খণ্ড: গীত ও নৃত্য, কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস।

২. চৌধুরী, শী., *লোকসংগীত চর্চা,* কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ।

৩. জুনেজার, ই., লোকসংস্কৃতি: ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, কলকাতা, গ্রন্থ বিকাশ।

৪. চৌধুরী, দু., বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা, লোকায়ত প্রকাশন।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

কলকাতা ও হাওড়ার বাসিন্দাদের একটি অংশের মধ্যে হিন্দি ভাষার দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনামের ব্যবহার: একটি সমাজভাষাগত বিশ্লেষণ

মোঃ আবুল আফজাল মুবাশিশর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 04/09/2024
Accepted 07/03/2025

সূচক শব্দ:
হিন্দি ভাষা,
দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনাম,
সমাজভাষাবিজ্ঞান,
বয়স,
সামাজিক পদমর্যাদা,
আনুষ্ঠানিকতা,
লিঙ্গ,
ক্ষমতার অসাম্য।

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণাপত্রটি কলকাতা ও হাওড়ার কিছু বাসিন্দাদের মধ্যে হিন্দি ভাষায় দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনামের ব্যবহারকে প্রভাবিতকারী সমাজভাষাগত উপাদানগুলিকে অনুসন্ধান করে। ১০০ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার (questionnaire-interview) পদ্ধতির মাধ্যমে দুটি বিভিন্ন বয়স গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে করা এই গবেষণায় বয়স, সামাজিক পদমর্যাদা, আনুষ্ঠানিকতা, কথোপকথনের প্রেক্ষাপট, লিঙ্গ আর তার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষমতার অসাম্য, সর্বনাম নির্বাচনের ওপর কেমন প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেছে, বিভিন্ন বয়সের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সর্বনাম ব্যবহারের ভিন্ন ভিন্ন ধরণ রয়েছে; পুরানো প্রজন্মের মানুষরা তরুণদের তুলনায় বয়স্ক পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথনের সময় “আপ”-এর মতো আনুষ্ঠানিক সর্বনামের ব্যবহার বেশি করে। এছাড়াও, কথোপকথনের প্রেক্ষাপট ও অন্যান্যদের উপস্থিতি সর্বনাম ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা হিন্দি ভাষার শিষ্টাচারের জটিলতা প্রকাশ করে। লিঙ্গ ও ক্ষমতার গতিশীলতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে প্রাপক লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত মর্যাদা ও সম্মানের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সর্বনামগুলি ব্যবহার করা হয়। এই গবেষণাটি প্রদত্ত প্রেক্ষাপটে হিন্দি ভাষার ব্যবহারের সূক্ষ্ম সমাজ-সংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে পরীক্ষা করে এবং ভাষাতত্ত্ব গবেষণা ও যোগাযোগ পদ্ধতিতে এই উপাদানগুলির গুরুত্বকে তুলে ধরে।

Corresponding author’s email ID: abul.afzal2000@gmail.com

১. ভূমিকা

মানুষ যখন কথোপকথন করে, তখন তারা শুধু তাদের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করে না, বরং ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, সামাজিক ভূমিকা প্রকাশ করে, ভাষার পছন্দের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করে এবং তারা যে প্রেক্ষাপটে যোগাযোগ করছে তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ফ্যাসোল্ডের (১৯৯০) মতামত অনুযায়ী, ভাষার এই কার্যকরী দিকটি বিশেষভাবে দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনাম ব্যবহারে স্পষ্ট হয়। স্পলস্কি (১৯৯৮) উল্লেখ করেন যে, অনেক ভাষায় দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনাম এবং সম্পর্কিত সম্বোধনের নির্বাচন ভদ্রতা এবং মর্যাদার প্রতিফলন করে, যা বক্তার সামাজিক অবস্থান এবং শ্রোতার প্রতি সম্মানকে ফুটিয়ে তোলে।

ব্রাউন ও গিলম্যান (1960) দ্বারা দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনামগুলির উপর করা অগ্রণী ও সবচেয়ে প্রভাবশালী গবেষণা, যা দ্বিপার্শ্বিক 'tu' এবং 'vous' ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে, সর্বনাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে “পাওয়ার” ও “সোলিডারিটি” উপাদানসমূহের ওপর আলোকপাত করেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় হিন্দি ভাষায়, ত্রিপার্শ্বিক T-V বিভাজন দেখা যায়: 'তু', 'তুম', এবং 'আপ'। 'তু' হলো সবচেয়ে কম আনুষ্ঠানিক এবং কম সম্মানসূচক, এবং প্রায়ই কনিষ্ঠদের সম্বোধন করতে বা অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। 'তুম' 'তু'-এর তুলনায় বেশি আনুষ্ঠানিক, কিন্তু 'আপ' থেকে কম আনুষ্ঠানিক এবং সম্মানসূচক। 'আপ' সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক এবং সম্মানসূচক বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। এই গবেষণায় কলকাতা এবং হাওড়ার হিন্দি ভাষাভাষীদের মধ্যে এই সর্বনামগুলির নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রজন্মগত, সামাজিক এবং পরিস্থিতিগত কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা

ব্রাউন এবং গিলম্যানের (১৯৬০) মৌলিক কাজ সামাজিক ভাষাতত্ত্বে সর্বনাম ব্যবহারের বোঝাপড়ার ভিত্তি স্থাপন করে। তারা প্রস্তাব করেন যে, সর্বনাম নির্বাচনে প্রধানত দুটি বিষয় কাজ করে: ক্ষমতা (পাওয়ার) এবং সংহতি (সোলিডারিটি)। ক্ষমতা বলতে অসম সম্পর্ক বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তির ওপর অন্যজনের কর্তৃত্ব থাকে, যার ফলে আনুষ্ঠানিক সর্বনাম ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে, সংহতি সমতা এবং ঘনিষ্ঠতাকে প্রতিফলিত করে, যা পরিচিত সর্বনামের পারস্পরিক ব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে।

পরবর্তী গবেষণায় ব্রাউন এবং গিলম্যানের কাঠামোকে সম্প্রসারিত করা হয়, যা দেখায় যে ক্ষমতা এবং সংহতির অর্থ বিভিন্ন ভাষা এবং সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ল্যাম্বার্ট এবং টাকার (১৯৭৬) এবং পলস্টন (১৯৭৫) দেখিয়েছেন যে, সর্বনাম ব্যবহার স্থির নয় বরং সামাজিক প্রসঙ্গ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, এমনকি একই ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণাগুলি দেখায় যে সামাজিক শ্রেণি, ব্যক্তিগত পরিচয় এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস পর্যন্ত সর্বনাম নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে, যা নির্দেশ করে যে ভাষা সামাজিক কাঠামো এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতিফলন।

লিঙ্গভিত্তিক সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। হাস (১৯৪৪) এবং লাকফ (১৯৭৩) এর মতো গবেষকরা দেখেছেন যে, পুরুষ এবং নারী প্রায়ই ভিন্ন সর্বনাম বা সম্বোধনের ধরন ব্যবহার করে, যা সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং সামাজিক প্রত্যাশার দ্বারা প্রভাবিত হয়। শ্রেণিবদ্ধ সমাজে, লিঙ্গ প্রায়ই নির্ধারণ করে যে, কে কাকে কীভাবে সম্বোধন করবে, যেখানে মহিলাদের সাধারণত অধিক আনুষ্ঠানিক এবং শ্রদ্ধাশীল ভাষা ব্যবহারের প্রত্যাশা করা হয়।

যদিও বেশিরভাগ গবেষণা পশ্চিমী ভাষাগুলিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে এই উপাদানসমূহ কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। এই গবেষণাটি কলকাতা এবং হাওড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে বয়স, সামাজিক মর্যাদা, আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রসঙ্গের মতো কারণগুলি কীভাবে হিন্দি ভাষায় দ্বিতীয় পুরুষবাচক সর্বনামের নির্বাচনে প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করার মাধ্যমে এই ফাঁকটি পূরণ করার লক্ষ্য রাখে।

৩. পদ্ধতি

এই গবেষণায় হিন্দি-ভাষী সম্প্রদায়ে সর্বনাম ব্যবহারের বিশ্লেষণ করার জন্য পরিমাণগত প্রশ্নাবলী দ্বারা সাক্ষাৎকার এবং কিছু গুণগত সাক্ষাৎকার উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের দুটি ভিন্ন বয়সের গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে: G1, যার মধ্যে ৫৫ থেকে ৭০ বছর বয়সের ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত, এবং G2, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের বয়স ২১ থেকে ২৬ বছর। প্রতিটি গোষ্ঠীতে ৫০ জন অংশগ্রহণকারী ছিল, যাদের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা সমানভাবে বিভক্ত এবং তারা কলকাতা বা হাওড়ায় বসবাস করতেন।

G1 গোষ্ঠীর বেশিরভাগেরই কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না বা সর্বাধিক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা (৮৩%) ছিল, এবং তারা সবাই কর্মসংস্থানের জন্য উত্তরপ্রদেশ বা বিহার থেকে এসেছেন। G1-এর সকল অংশগ্রহণকারী ২৫,০০০ টাকার নিচে মাসিক আয় রিপোর্ট করেছেন, যেখানে ৯৭% নিজেদের "কনসারভেটিভ" বা ধর্মীয় বলে চিহ্নিত করেছেন। G2 অংশগ্রহণকারীদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তারা সকলেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য অধ্যয়নরত ছিলেন এবং তারাও উত্তরপ্রদেশ বা বিহার থেকে এসেছেন। তাদের বেশিরভাগই ২৫,০০০ টাকার নিচে মাসিক আয় রিপোর্ট করেছেন, যেখানে ৬৮% নিজেদের প্রগতিশীল বা উদারপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্বনাম ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা দেওয়া হয়েছিল, যা পরিবার সদস্য, বন্ধু, অপরিচিত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্নমালায় অংশগ্রহণকারীদের পটভূমি সম্পর্কেও তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমীক্ষার পাশাপাশি, অংশগ্রহণকারীদের একটি ছোট অংশের সাথে কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক গুণগত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, যাতে তাদের সর্বনাম ব্যবহারের প্রতি মনোভাব, বিশ্বাস এবং মতাদর্শ আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা যায়।

বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিটি সর্বনামের জন্য শতাংশ গণনা করা হয়েছিল, যা লিঙ্গ, বয়স এবং সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তুলনা করার সুযোগ দেয়। পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের সমন্বয় একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে হিন্দি-ভাষী সম্প্রদায়ে সর্বনাম ব্যবহারের ব্যাপক বোঝাপড়া প্রদান করেছে, যা সর্বনাম নির্বাচনের প্রভাবক এবং ভাষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের উপর তাদের প্রভাবকে আলোকপাত করেছে।

৪. ফলাফল এবং বিশ্লেষণ

হিন্দিতে দ্বিতীয় পুরুষ সর্বনামের পছন্দ জটিল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতাকে প্রতিফলিত করে, যা সর্বনাম ব্যবহারের বিশদ বিশ্লেষণের জন্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণায় কয়েকটি মূল উপাদানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

৪.১ বক্তার প্রজন্ম

প্রজন্মগত পার্থক্যগুলি সর্বনাম নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, যা ভাষাগত রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। এই গবেষণায় দুটি বয়সের গ্রুপে ফোকাস করা হয়েছে: G1 (৫৫-৭০ বছর) এবং G2 (২১-২৬ বছর)। ফলাফলে দেখা যায়, G1 সদস্যরা বিশেষত বয়স্ক পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং অপরিচিতদের সাথে আনুষ্ঠানিক সর্বনাম "আপ" ব্যবহারে বেশি আগ্রহী। উদাহরণস্বরূপ, G1 পুরুষদের মধ্যে ৫৪% তাদের পুরুষ বন্ধুদের সাথে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2 পুরুষদের মধ্যে কেউই এটি করেন না। অনুরূপভাবে, G1 পুরুষদের মধ্যে ৭৬% তাদের নারী বন্ধুদের সাথে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2 তে এটি ৫৪%। মহিলাদের মধ্যে, G1 এর ৮০% অংশগ্রহণকারী পুরুষ বন্ধুদের সাথে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2 তে এটি ৫১%। G1 মহিলাদের মধ্যে মাত্র ৩০% নারী বন্ধুদের সাথে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2 তে এটি মাত্র ৫%। G1 অংশগ্রহণকারীরা বড় ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে (৮৬% বড় ভাই এবং ৬৩% বড় বোন) "আপ" ব্যবহারে বেশি আগ্রহী, যেখানে G2 তে এটি যথাক্রমে ৭৪% এবং ৫০% (টেবিল ১ দেখুন)। এই ফলাফলগুলি ইঙ্গিত করে যে, পুরানো প্রজন্মগুলির মধ্যে "আপ" এর মতো প্রচলিত, আনুষ্ঠানিক সর্বনাম ব্যবহার করার প্রবণতা বেশি, যা শ্রদ্ধা এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে গুরুত্ব দেয়। এর বিপরীতে, তরুণ বক্তারা "তু" বা "তুম" এর মতো অনানুষ্ঠানিক সর্বনামের ব্যবহার পছন্দ করে, যা আরও নৈমিত্তিক এবং সমতাবাদী যোগাযোগ শৈলীর দিকে একটি পরিবর্তন নির্দেশ করে। এই প্রজন্মগত পার্থক্যটি ব্রাউন এবং গিলম্যান (১৯৬০) এর পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষায় ক্ষমতার রূপ থেকে সংহতির দিকে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন, যেখানে সংহতি আরও অনানুষ্ঠানিক, সমতাবাদী ভাষার ব্যবহারের প্রধান প্রবণতা হিসেবে উঠে এসেছে।

টেবিল ১

ক্র.সং.	শ্রোতা	আপ (%)	
		G1	G2
১	পুরুষদের পুরুষ বন্ধুদের জন্য	৫৪	০
২	পুরুষদের নারী বন্ধুদের জন্য	৭৬	৫৪
৩	মহিলাদের পুরুষ বন্ধুদের জন্য	৮০	৫১
৪	মহিলাদের নারী বন্ধুদের জন্য	৩০	৫
৫	বড় ভাই	৮৬	৭৪
৬	বড় বোন	৬৩	৫০

তবে, নিম্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের, যেমন ঝাড়ুদার, গৃহ সহায়ক, অটো চালক এবং রাস্তার বিক্রেতাদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। G1 অংশগ্রহণকারীরা G2 এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম "আপ" ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, G1 এর মাত্র ৫% অংশগ্রহণকারী ঝাড়ুদারদের সাথে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2 তে এটি ৮৮%। অনুরূপভাবে, G1 এর মাত্র ১৫% সময় অটো চালকদের সাথে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2 তে এটি ৯২%। এই প্রবণতা গৃহ সহায়ক, নিরাপত্তারক্ষী এবং রাস্তার বিক্রেতাদের ক্ষেত্রেও অব্যাহত থাকে, যেখানে G1 অংশগ্রহণকারীরা যথাক্রমে ১৭%, ৪২%, এবং ৪৮% ক্ষেত্রে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2 তে এটি ৯৪%, ৯২%, এবং ৮৯% (টেবিল ২ দেখুন)। "আপ" এর পরিবর্তে, G1 প্রায়শই এই ব্যক্তিদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে কম আনুষ্ঠানিক "তুম" ব্যবহার করেন। এই বৈষম্যটি সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করতে পারে, যেখানে G1 ঐতিহ্যবাহী নিয়মের প্রতি বেশি অনুগত থাকে, আর G2 অধিক শ্রদ্ধা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব প্রদর্শন করে। G1 এবং G2 এর মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে সর্বনাম ব্যবহারের এই পরিবর্তন সমাজের মনোভাব এবং ভাষাগত নিয়মাবলীর বিবর্তনের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। G1 অংশগ্রহণকারীরা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের সাথে আনুষ্ঠানিক "আপ" এর পরিবর্তে অনানুষ্ঠানিক "তুম" ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, যেখানে G2 অংশগ্রহণকারীরা অধিক শ্রদ্ধাশীল "আপ" ব্যবহার করতে আগ্রহী। এই প্রজন্মগত পরিবর্তনটি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, কারণ বেশিরভাগ G1 অংশগ্রহণকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ বিদ্যালয় স্তর বা তার নিচে ছিল, যেখানে G2 এর সব অংশগ্রহণকারী মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের পথে ছিলেন। ভবিষ্যতের গবেষণায় এই প্রজন্মগত পার্থক্যের পেছনের কারণগুলি এবং এগুলির সামাজিক সংহতি এবং ভাষার বিকাশের উপর প্রভাবগুলি আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

টেবিল ২

ক্র.সং.	শ্রোতা	আপ (%)	
		G1	G2
১	অটো ড্রাইভার/রিকশা চালক	১৫	৯২
২	ঝাড়ুদার	৫	৮৮
৩	রাস্তার বিক্রেতা	৪৮	৮৯
৪	সিকিউরিটি গার্ড	৪২	৯২
৫	গৃহ সহায়ক	১৭	৯৪

৪.২ শ্রোতার বয়স

বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কীরূপে কাউকে সম্বোধন করা হবে তা নির্ধারণ করে। সাধারণত, বেশি সম্মানজনক এবং আনুষ্ঠানিক "আপ" বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর কম আনুষ্ঠানিক "তুম" বা "তু" তরুণদের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের গবেষণায় এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছে, যা বয়স অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, পুরোনো প্রজন্ম (G1) এর মধ্যে, ৮৬% ব্যক্তিরা বড় ভাইকে সম্বোধন করতে 'আপ' ব্যবহার করেন এবং ৬৩% বড় বোনকে সম্বোধন করতে। তরুণ প্রজন্ম (G2) এর মধ্যে, এই পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৭৪% এবং ৫০%। বিপরীতে, G1 এর ১৫% এবং G2 এর ১৬% তরুণ ভাইবোনদের জন্য 'আপ' ব্যবহার করেন। পরিবর্তে, G1 এর ৪৯% এবং G2 এর ৬০% তরুণ ভাইবোনদের জন্য 'তুম' ব্যবহার করেন (টেবিল ৩ দেখুন)।

টেবিল ৩

ক্র.সং.	শ্রোতা	আপ (%)		তুম (%)	
		G1	G2	G1	G2
১	ছোট ভাই	১৫	১৬	৪৯	৬০
২	ছোট বোন	১৫	১৬	৪৯	৬০
৩	বড় ভাই	৮৬	৭৪	১০	১৮
৪	বড় বোন	৬৩	৫০	২২	৪২

একইভাবে, G1 এবং G2 উভয়ই নিজেদের থেকে বয়স্ক অজানা ব্যক্তিকে সম্বোধন করতে "আপ" ১০০% এবং ৯৫% সময় ব্যবহার করেন। তবে, বয়স কম হলে এই ব্যবহার ৪০% এবং ৪৬% এ নেমে আসে। তাদের স্ত্রীর বড় ভাইবোনদের সম্বোধনে, পুরুষেরা প্রধানত "আপ" (৮০%) ব্যবহার করেন, তবে তরুণ ভাইবোনদের জন্য ৪৬%

সময় "আপ" ব্যবহার করেন এবং ৫৪% সময় অনানুষ্ঠানিক "তুম" ও "তু" ব্যবহার করেন। সুতরাং, প্রাপকরের বয়স উল্লেখযোগ্যভাবে সর্বনাম নির্বাচনে প্রভাব ফেলে।

৪.৩ সামাজিক পদমর্যাদা এবং আনুষ্ঠানিকতা

সামাজিক পদমর্যাদা এবং আনুষ্ঠানিকতা সর্বনাম ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আনুষ্ঠানিক পরিবেশে, যেমন শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথোপকথনের ক্ষেত্রে, উভয় প্রজন্মই সম্মানসূচক সর্বনাম "আপ" ব্যবহার করেন, যার ব্যবহার হার ১০০%।

কিন্তু যখন নিম্ন আর্থ-সামাজিক পটভূমির ব্যক্তিদের, যেমন ঝাড়ুদার, গৃহ সহায়ক, অটো ড্রাইভার/রিকশা চালক এবং রাস্তার বিক্রেতাদের সম্বোধন করা হয়, তখন G1 "আপ" অনেক কম ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, G1 এর ক্ষেত্রে ঝাড়ুদারদের জন্য "আপ" ব্যবহার মাত্র ৫% এবং অটো ড্রাইভার/রিকশা চালকদের জন্য ১৫%। তারা প্রায়ই কম আনুষ্ঠানিক "তুম" ব্যবহার করে। এটি G1 এর শ্রেণি স্তরের প্রতি ঐতিহ্যগত মানদণ্ডে অনুগত থাকার প্রতিফলন হতে পারে। তবে, G2 এই বৈষম্য প্রদর্শন করে না। সুতরাং, শ্রোতাদের সামাজিক পদমর্যাদা এবং পরিবেশের আনুষ্ঠানিকতা সর্বনাম নির্বাচনে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলে।

৪.৪ কথোপকথনের প্রেক্ষাপট

কথোপকথন যেখানে ঘটে, সেই প্রেক্ষাপট সর্বনাম ব্যবহারে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মানুষ এমন সর্বনাম ব্যবহার করে, যা তারা জনসমক্ষে অন্যদের সামনে সাধারণত ব্যবহার করে না। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় G1-এর ৮৬% ব্যক্তি বড় ভাইকে সম্বোধন করতে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2-এর ৭৪% ব্যক্তি এটি করেন। কিন্তু অন্যদের উপস্থিতিতে, এই হার G1-এর জন্য ৯৭% এবং G2-এর জন্য ৮৬% এ বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও, G1-এর ৬৩% ব্যক্তি বড় বোনকে সম্বোধন করতে "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2-এর ৫০% ব্যক্তি এটি করেন। কিন্তু অন্যদের উপস্থিতিতে, এই হার G1-এর জন্য ৭৮% এবং G2-এর জন্য ৭৪% এ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় G1-এর ৩৪% ব্যক্তি "আপ" ব্যবহার করেন, যেখানে G2-এর ৬৬% ব্যক্তি এটি করেন। কিন্তু অন্যদের উপস্থিতিতে, এই হার G1-এর জন্য ৯৩% এবং G2-এর জন্য ৮৮% এ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, কথোপকথনের প্রেক্ষাপট এবং অন্যদের উপস্থিতি সর্বনাম নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.৫ লিঙ্গ এবং ক্ষমতার অসাম্য

অন্যান্য অনেক ভাষার মতো, হিন্দিতেও লিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ধরণ গঠন করে। দ্বিতীয়-পুরুষ সর্বনামের নির্বাচন প্রায়শই সম্বোধিত ব্যক্তির লিঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে যোগাযোগ করার সময় আরও সম্মানসূচক বা আনুষ্ঠানিক সর্বনাম ব্যবহারের বিষয়টিকে সাধারণত ভদ্রতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়।

এই গবেষণার তথ্য লিঙ্গভিত্তিক সর্বনাম ব্যবহারের স্পষ্ট প্যাটার্নগুলি দেখায়। G2 পুরুষদের মধ্যে, ৫৪% তাদের মহিলা বন্ধুদের জন্য "আপ" ব্যবহার করেন, তবে পুরুষ বন্ধুদের জন্য কেউই এটি ব্যবহার করেন না। অন্যদিকে, G1 পুরুষরা ৫৪% পুরুষ বন্ধুর জন্য এবং আরও বেশি, ৭৬% মহিলা বন্ধুর জন্য "আপ" ব্যবহার করেন। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে, G2 পুরুষদের ৩০% পুরুষ সহপাঠীর জন্য এবং দ্বিগুণ ৬০% মহিলা সহপাঠীর জন্য "আপ" ব্যবহার করেন। G1-এ, এই পরিসংখ্যান পুরুষ সহপাঠীর জন্য ৪৫% এবং মহিলা সহপাঠীর জন্য ৭৬% (দেখুন টেবিল ৪)।

টেবিল ৪

ক্র.সং.	শ্রোতা	আপ (%)	
		G1	G2
১	পুরুষদের পুরুষ বন্ধুদের জন্য	৫৪	০
২	পুরুষদের নারী বন্ধুদের জন্য	৭৬	৫৪
৩	পুরুষ সহপাঠীকে পুরুষদের সম্বোধন	৪৫	৩০
৪	নারী সহপাঠীকে পুরুষদের সম্বোধন	৭৬	৬০

অন্যদিকে, G2 প্রজন্মের মহিলা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫১% পুরুষ বন্ধুদের জন্য "আপ" ব্যবহার করেন, তবে মহিলা বন্ধুদের জন্য এটি মাত্র ৫%। G1-এ, ৮০% মহিলারা পুরুষ বন্ধুদের জন্য এবং ৩০% মহিলা বন্ধুদের জন্য "আপ" ব্যবহার করেন। শ্রেণিকক্ষে, G2 মহিলাদের ৪৫% মহিলা সহপাঠীর জন্য এবং ৬১% পুরুষ সহপাঠীর জন্য "আপ" ব্যবহার করেন। G1-এ, পুরুষ সহপাঠীর জন্য ৮৭% এবং মহিলা সহপাঠীর জন্য ৫৭% "আপ" ব্যবহার করেন (দেখুন টেবিল ৫)।

টেবিল ৫

ক্র.সং.	শ্রোতা	আপ (%)	
		G1	G2
১	মহিলাদের পুরুষ বন্ধুদের জন্য	৮০	৫১
২	মহিলাদের নারী বন্ধুদের জন্য	৩০	৫
৩	মহিলাদের পুরুষ সহপাঠীদের জন্য	৮৭	৬১
৪	মহিলাদের নারী সহপাঠীদের জন্য	৫৭	৪৫

এই ফলাফলগুলো লিঙ্গ এবং সর্বনাম ব্যবহারের জটিল সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে, যা দেখায় কীভাবে ব্যক্তি লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক নিয়ম এবং ভদ্রতার ধারণার উপর ভিত্তি করে তাদের ভাষার ব্যবহার সামঞ্জস্য করেন।

লিঙ্গ প্রায়ই সেই সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর সাথে জড়িত থাকে যেখানে একটি ভাষা ব্যবহার করা হয়। এই গবেষণার তথ্য লিঙ্গ এবং ক্ষমতার অসমতার মধ্যে সম্পর্ককে স্পষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ, G2 প্রজন্মের ৯০% অংশগ্রহণকারী তাদের বাবাকে সম্বোধনের সময় 'আপ' ব্যবহার করেন, কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে এটি মাত্র ৬৬%। একইভাবে, G1 প্রজন্মে ৯৫% অংশগ্রহণকারী বাবার জন্য 'আপ' ব্যবহার করেন, কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে এটি মাত্র ৩৪% (দেখুন টেবিল ৬)। এটি বাবাদের প্রতি সমাজের অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণাকে প্রতিফলিত করে।

G2 প্রজন্মের মধ্যে ৫০% অংশগ্রহণকারী বড় বোনের জন্য 'আপ' ব্যবহার করেন, যেখানে বড় ভাইয়ের ক্ষেত্রে এটি ৭৪%। G1 প্রজন্মে, ৬৩% অংশগ্রহণকারী বড় বোনের জন্য 'আপ' ব্যবহার করেন, কিন্তু বড় ভাইয়ের ক্ষেত্রে এটি ৮৬% (দেখুন টেবিল ৬)। এই প্রবণতা পরিবারে পুরুষ সদস্যদের অধিক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সামাজিক বিশ্বাসকে নির্দেশ করে।

টেবিল ৬

ক্র.সং.	শ্রোতা	আপ (%)	
		G1	G2
১	বাবা	৯৫	৯০
২	মা	৩৪	৬৬
৩	বড় ভাই	৮৬	৭৪
৪	বড় বোন	৬৩	৫০

জামাইকে সম্বোধনের সময়, ৮৮% অংশগ্রহণকারী 'আপ' ব্যবহার করেন, যেখানে বউমার জন্য এটি মাত্র ৪৪%, যা ক্ষমতার পার্থক্যকে স্পষ্ট করে। এই পার্থক্য সম্পর্কে একটি ৫৬ বছর বয়সী মহিলা মন্তব্য করেছেন, যার বাংলা অনুবাদ হলো: "জামাইকে রাজাদের মতো মনে করা হয়, তাকে রাজাদের মতো সম্মান করা হয়, আর বৌমাকে চাকরের মতো মনে করা হয় এবং তার সাথে চাকরের মতোই আচরণ করা হয়"।

স্বামী-স্ত্রীদের ক্ষেত্রে একটি অনুরূপ ধারা দেখা যায়; ৮৭% মহিলারা তাদের স্বামীকে 'আপ' দিয়ে সম্বোধন করেন, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে মাত্র ৩৬% তাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে একইভাবে সম্বোধন করেন। এটি ঐতিহ্যগত লিঙ্গভূমিকা প্রতিফলিত করে যেখানে মহিলারা আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন করেন, কিন্তু পুরুষরা তা করেন না। এর প্রসঙ্গে একটি ৫৮ বছর বয়সী মহিলা বলেছেন, যার বাংলা অনুবাদ হলো: "আমার স্বামী আমার জন্য ভগবানসম,

তাই তাকে সম্মান দিয়ে সম্বোধন করাটা জরুরি, আর আমি তার সেবিকা, তাই তিনি যেভাবেই ডাকেন, সেটা ঠিক আছে"।

একই ধরনের প্রেক্ষাপটে, ৮০% পুরুষ তাদের স্ত্রীর বড় ভাই-বোনদের জন্য 'আপ' ব্যবহার করেন, কিন্তু ছোট ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে এটি মাত্র ৪৬%। অন্যদিকে, ৯২% মহিলা তাদের স্বামীর বড় ভাই-বোনদের জন্য 'আপ' ব্যবহার করেন, এবং ছোট ভাই-বোনদের জন্যও ৬৮% পর্যন্ত 'আপ' ব্যবহার করেন (দেখুন টেবিল ৭)।

টেবিল ৭

ক্র.সং.	শ্রোতা	আপ (%)
১	স্ত্রীর বড় ভাই-বোন	৮০
২	স্ত্রীর ছোট ভাই-বোন	৪৬
৩	স্বামীর বড় ভাই-বোন	৯৬
৪	স্বামীর ছোট ভাই-বোন	৭৩

বিয়ের আগে প্রেমের সম্পর্কেও, ৪৮% মহিলা তাদের পুরুষ সঙ্গীকে সম্বোধনের সময় 'আপ' ব্যবহার করেন, কিন্তু বিয়ের পর এটি ৭২% পর্যন্ত বেড়ে যায়, যা দেখায় কীভাবে সমাজের ক্ষমতার সম্পর্ক বিয়ের পর পুরুষদের পক্ষে কাজ করে।

উল্লেখিত পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সর্বনাম ব্যবহারে যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দেখা যায়, তা পরিবারিক পরিসরে দুই লিঙ্গের মধ্যে সম্মান ও শ্রেণিবিন্যাসের পার্থক্য নির্দেশ করে। এই বৈষম্য ইউরোপীয় ভাষায় পরিচালিত অনুরূপ গবেষণায় দেখা যায়নি; অতএব, এটি হিন্দি ভাষাভাষী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই ফলাফলগুলো লিঙ্গ, সর্বনাম ব্যবহারের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ককে তুলে ধরে, যা দেখায় কীভাবে ভাষার নির্বাচন সমাজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত এবং শক্তিশালী করে।

৪.৬ ব্যক্তিগত পছন্দ এবং মতাদর্শ

সর্বনাম ব্যবহারে ব্যক্তিগত পছন্দ, বিশ্বাস এবং মতাদর্শের প্রভাব অনেকটাই রয়েছে। ব্যক্তিদের পছন্দ তাদের সম্মানজনক এবং সমান অধিকারযুক্ত যোগাযোগের ইচ্ছার প্রতিফলন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখেছি যে ৪৯% মহিলা যারা তাদের পুরুষ সঙ্গীকে "তুম" দিয়ে সম্বোধন করতে চেয়েছিলেন, তারা সবাই নিজেদেরকে "প্রগতিশীল বা উদার" হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিবাহের পরও, ২৫% মহিলা যারা তাদের স্বামীদের "তুম" দিয়ে সম্বোধন করবেন বলে জানিয়েছিলেন, তারাও নিজেদেরকে "প্রগতিশীল বা উদার" হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এটি দেখায় কীভাবে ব্যক্তিগত মতাদর্শ এবং বিশ্বাস সর্বনাম পছন্দকে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে সমান এবং প্রগতিশীল যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রেক্ষাপটে। ব্রাউন এবং গিলম্যান (১৯৬০) এর পর্যবেক্ষণের সাথে এটি মিল

থাকতে পারে, যেখানে ব্যক্তিগত মতাদর্শ এবং সর্বনাম ব্যবহারের প্যাটার্নের মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখা গেছে, যেখানে ব্যক্তিগত ব্যবহারের উচ্চ "Tu" এবং রাজনৈতিক উদারতার মধ্যে একটি সম্পর্ক ছিল।

৫. উপসংহার

পরিশেষে, এই গবেষণা হিন্দি ভাষায় দ্বিতীয় পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহারের উপর সমাজভাষাগত প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে। ফলাফলগুলি দেখায় যে বয়স, সামাজিক পদমর্যাদা, আনুষ্ঠানিকতা, লিঙ্গ আর তার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষমতার অসাম্য এবং ব্যক্তিগত মতাদর্শগুলি সর্বনাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিল সম্পর্ক গড়ে তোলে। দুটি প্রজন্মের মধ্যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা বিশেষত বয়স্ক পরিবারের সদস্যদের সাথে এবং আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে "আপ" এর মতো আনুষ্ঠানিক সর্বনাম ব্যবহারে আগ্রহী, যা প্রচলিত নিয়মের প্রভাবকে তুলে ধরে। অন্যদিকে, তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে কম আনুষ্ঠানিক সর্বনাম, যেমন "তুম" বা "তু" ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে, যা সমাজের পরিবর্তিত মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

তদুপরি, বিশ্লেষণে দেখা যায় যে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক সর্বনাম ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে, যেখানে মহিলারা "আপ" ব্যবহারে বেশি আগ্রহী। এই পার্থক্যটি সমাজের পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার কাঠামো এবং বিয়ের পর পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতমূলক সামাজিক প্রত্যাশার প্রতিফলন। এছাড়াও, ব্যক্তিগত মতাদর্শ এবং বিশ্বাসও সর্বনাম পছন্দে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে প্রগতিশীল বা উদারপন্থী মতাদর্শ পোষণকারী ব্যক্তিরা সমতাবাদী যোগাযোগের শৈলী অনুসরণ করেন।

তবে, হিন্দিতে সর্বনাম ব্যবহারের প্রকৃতি একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম বিষয় যা একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পরিচালিত গবেষণার সীমার বাইরে। আরও বড় নমুনা আকারের (sample size) মাধ্যমে বিষয়টির আরও গভীর বিশ্লেষণ করা যেত। এছাড়াও, আরও বেশি গুণগত সাক্ষাৎকার থেকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যেত। তা সত্ত্বেও, এই গবেষণা ভাষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের মধ্যে জটিল আন্তঃসম্পর্কের ভাল বোঝাপড়া অর্জনে সহায়তা করেছে এবং বিভিন্ন সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য সূক্ষ্ম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে।

উল্লেখপঞ্জি

ব্রাউন, রজার এবং গিলম্যান, অ্যালবার্ট। (১৯৬২)। The Pronouns of Power and Solidarity, *এমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজিস্ট*, খণ্ড ৪(৬), পৃষ্ঠা ২৪-২৯।

ফ্যাসল্ড, রালফ। (১৯৯০)। *The Sociolinguistics of Language*, অক্সফোর্ড: বাসিল ব্ল্যাকওয়েল।

হাস, এম.আর। (১৯৪৪)। Men's and Women's Speech in Koasati, *ল্যাংগুয়েজ*, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ১৪২।

ল্যাম্বার্ট, ওয়ালেস, & টাকার, জি. রিচার্ড। (১৯৭৬)। *Tu, Vous, Usted: A Social-Psychological Study of Address Patterns,* রাউলি, MA: নিউবেরি হাউস।

লাকফ, আর.টি। (১৯৭৩)। Language and Woman's Place, *ল্যাংগুয়েজ ইন সোসাইটি*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫-৭৯।

পলস্টন, ক্রিস্টিনা ব্র্যাট। (১৯৭৪)। Language Universal and Sociocultural Implications in Deviant Usage: Personal Questions in Swedish, *স্টুডিয়া লিঙ্গুইস্টিকা*, খণ্ড ২৯(১-২), পৃষ্ঠা ১-১৫।

স্পলস্কি, বি। (১৯৯৮)। *Sociolinguistics*, অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

বাংলাদেশে ব্যবহৃত সাঁওতালি ভাষা ও বাংলা ভাষার ক্রিয়া রূপতত্ত্ব: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রজ্ঞা সাহা এবং মালিহা ফাহমিন আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 06/09/2024
Accepted 20/03/2025

সূচক শব্দ:

সাঁওতালি,
ক্রিয়া,
খাগড়াছড়ি,
রূপতত্ত্ব,
বাংলা,
পরিগ্রহণ

অতিথি সম্পাদক

শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্যতম সুপরিচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতাল। ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, রাজশাহী, রংপুর, খাগড়াছড়ি, দিনাজপুরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসরত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১,২৯,০৪৯ জন। সাঁওতালি দক্ষিণ এশিয়ার অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের সদস্য। এ ভাষা-পরিবারের মুণ্ডা উপশাখা থেকে সাঁওতালি ভাষার উদ্ভব ও পরবর্তীতে বিকাশ ঘটে। প্রাক-আর্য যুগের ঐতিহ্যবাহী সাঁওতালি ভাষা দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার সাথে সহাবস্থানের কারণে উভয় ভাষা একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাংলা বাক্যের পদক্রমের মতো একই বিন্যাস অনুসারে সাঁওতালি ভাষায় কর্তার পরে কর্ম, কর্মের পরে বাক্যের শেষে ক্রিয়ার অবস্থান। এক্ষেত্রে পদের অবস্থানগত রদবদল ঘটলেও বাক্যের অর্থ ঠিক থাকে। বাংলা ভাষার ন্যায় সাঁওতালি ভাষাও নমনীয় এবং ক্রমবিন্যাস পরিবর্তন করলেও পদসমূহের মধ্যকার স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। বাংলা ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (যেমন: ক্রিয়াপদের লিঙ্গহীনতা, শব্দদ্বৈত ইত্যাদি) মুণ্ডা ভাষাজাত হিসেবে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বেশ কিছু দেশি শব্দ (যেমন: উনুন, গাই, ঢোল, জালি, কাই, রঙ্গো, ওল, প্রভৃতি) মুণ্ডা বা সাঁওতালি ভাষা থেকে উদ্ভূত। কালের পরিক্রমায় বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এবং বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষার পর্যাপ্ত আনুষ্ঠানিক ব্যবহার ও সুনির্দিষ্ট লিপি না থাকায় এ ভাষা বাংলার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছে। সাঁওতালিতে ব্যবহৃত অব্যয় শব্দ যেমন: 'আর' বাংলা ভাষা থেকে পরিগ্রহিত। এছাড়া বাংলা ভাষার ক্রিয়ামূলের সাথে সাঁওতালি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়া শব্দ গঠিত হয়েছে। রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক গঠনের নিরিখেও সাঁওতালি ও বাংলার সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দ ব্যবহারের যে প্রবণতা বা কোড মিশ্রণ সাঁওতাল জাতির মাঝে লক্ষ্য করা যায় তার আরেকটি বিশেষ কারণ শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাংলার ওপর নির্ভরশীল। এই গবেষণাপত্রের উপাত্ত হিসেবে বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসরত ৮ জন সাঁওতালি-ভাষীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে যাদের বয়স ১৬-৭২ বছর। ১৯৬০ সালে রাঙামাটির কাপ্তাই বাঁধে

Corresponding author's email ID: progga-2018223976@ling.du.ac.bd, malihafahmin-2021914182@ling.du.ac.bd

উদ্বাস্তু হয়ে খাগড়াছড়ির পানছড়ি ও লক্ষ্মীছড়িতে এসে ঠাঁই নেয় শতাধিক সাঁওতাল পরিবার যাদের আদি নিবাস ছিলো ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা অঞ্চলে। বর্তমানে খাগড়াছড়ির পানছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার তিনটি পল্লীতে প্রায় ১২৯টি সাঁওতাল পরিবার বসবাস করে। এসব অঞ্চলে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর বাস। এর ফলে সাঁওতালি ভাষায় অন্যান্য ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহে সামগ্রিকভাবে সাঁওতালি ভাষা ও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যবহৃত সাঁওতালি ভাষার ওপর বাংলার প্রভাব এবং এদের মধ্যকার তুলনামূলক গবেষণা অপ্রতুল। উপরন্তু, বাংলাদেশের সাঁওতালি ভাষা নিয়ে গবেষণা মূলত উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা খাগড়াছড়িকেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতিতে সাঁওতালি ও বাংলা ভাষার ক্রিয়ার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তথা ক্রিয়ার গঠন, কর্তার সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক, ক্রিয়ার কাল, কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ, ক্রিয়ার ভাব, ক্রিয়া নির্দেশক, ক্রিয়া বিভক্তি, যৌগিক ক্রিয়া, প্রত্যয়, পরিগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়াদির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা হবে। প্রসঙ্গত, অন্যান্য মুণ্ডা ভাষাগুলোর চেয়ে সাঁওতালি ক্রিয়া অধিক বৈচিত্র্যময় এবং বিস্তৃত। দ্বিবচনের ব্যবহার এই ভাষাকে করেছে অনন্য। বাংলা ভাষার ক্রিয়া সংঘটনের সাথে এ ভাষার বহুলাংশে সমন্বয় রয়েছে। এই গবেষণাকার্যে সর্বোপরি সাঁওতালি ভাষার ক্রিয়া রূপতত্ত্বের সাথে বাংলা ক্রিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণতার বিষয়টি আলোকপাত করা হবে।

১. ভূমিকা

"ভাষা মুক্ত সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া; যার আইন এবং নীতিগুলি স্থির, তবে প্রজন্মের নীতিগুলি যেভাবে ব্যবহার করা হয় তা মুক্ত এবং অসীম বৈচিত্র্যময়।" (নোয়াম চমস্কি, ১৯৫৭)। উক্ত বক্তব্যানুসারে সঙ্গতভাবে বলা যায়, বৈচিত্র্যময় ভাষিক সংমিশ্রণ ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য স্ফীতিশীল হয়। আদিবাসী ভাষা ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমূল্য রত্ন। পন্ডিতদের অনুমান অনুসারে, আদিবাসীরা এখনও প্রায় ৭,১০৫-টি ভাষায় কথা বলে (লুইস ও অন্যান্য, ২০১৩) এবং (কিং ও সাইলম্যান, ২০০৪) এর মতে, ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ এর মতো ভাষায় তারা কথা বলে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, বাংলাদেশে ৪৫-টি জাতিগত সম্প্রদায় রয়েছে। এসব ভাষার মধ্যে সাঁওতালি বাংলাদেশের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষা, ভাষাটির অনন্য ভাষাগত মান রয়েছে। এ গবেষণায় বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসকারী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত সাঁওতালি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার ক্রিয়া রূপতত্ত্বের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। রূপমূলীয়-বাক্যতত্ত্ব (মরফোসিনট্যাক্স) বা ভাষার রূপগত এবং বাক্যিক এককের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাকরণগত ভাষিক উপাদানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে। সাঁওতালদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাতার্থে বিভিন্ন রূপমূলীয়-বাক্যতাত্ত্বিক উপাদান, দৃষ্টান্তস্বরূপ: পুরুষ, বচন, ক্রিয়ার কাল, ভাব, ক্রিয়ার সক্রিয়শীলতাসহ বিবিধ বিষয় একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা (বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার) প্রেক্ষিতে অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাষায় নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি, আচার-নিষ্ঠা

ও অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে অন্তর্জাত প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই কাজের মূল প্রয়াস আদিবাসী ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে ভাষাগত সংরক্ষণের চেষ্টা করা।

২. তাত্ত্বিক বিবেচনা

২.১ ক্রিয়া রূপতত্ত্ব

ক্রিয়া রূপতত্ত্বে ক্রিয়াপদের গঠন-কাঠামো নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে আলোচনা করা হয়। ভাষাতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ক্রিয়া-রূপতত্ত্ব। একটি নির্দিষ্ট প্রতিবেশে মূল ধাতু থেকে নির্গত ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যগত রূপভেদ ঘটে। ক্রিয়া রূপের এই পরিবর্তন ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামোকে বোঝার জন্য অপরিহার্য (দত্ত, ২০১০)। ক্রিয়ারূপের কালগত পরিবর্তন (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ), ভাব (নির্দেশনা, অনুমোদন, সাপেক্ষ, আকাঙ্ক্ষা), বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ (কাজের অসম্পূর্ণতা, সম্ভাবনা, অনিশ্চয়তা)-এসব বিবিধ আনুষাঙ্গিক বিষয় নিয়ে ক্রিয়া রূপতত্ত্বের পরিমণ্ডল বিস্তার লাভ করেছে। ক্রিয়ার মূলরূপ তথা ধাতুর সাথে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের প্রসঙ্গে—সময়, কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ, পুরুষ, সম্মানসূচক নির্দেশক ব্যবহার করা হয়; এসকল সংযুক্তির দরুন বাংলা ক্রিয়াসমূহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (সুলতানা, ২০১৬)।

২.২ বাংলা ভাষা

"বাঙ্গালা ভাষা প্রায় আট কোটি লোকের ভাষা। কেবল বিভাগপূর্ব বাঙ্গালা দেশে নয়, তাহার প্রত্যন্ত স্থানেও বাঙ্গালা দেশভাষা রূপে পরিচিত" (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮)। তাই বাঙালিকে বলা যায় 'বিশ্বায়নকৃত সংকর জাতি' (শেখর, ২০০৪)। সুকুমার সেনের মতানুসারে, প্রায় তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বে বেদ সংকলিত হয়, যেখানে প্রথম 'বঙ্গ' শব্দের কথা বলা হয়েছিল। যেসকল বসতিস্থাপনকারী ককেশীয় অঞ্চল দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল তাদের ভাষাকে মূলত ভাষাবিজ্ঞানীগণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা নামে অভিহিত করেন। উক্ত আর্য ভাষার সংস্কারকৃত রূপ ছিল সংস্কৃত ভাষা। কালের পরিক্রমায় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত (শেখর, ২০০৪) সময়ে ভাষার বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় 'মধ্য আর্য ভাষা বা প্রাকৃত ভাষা' উদ্ভূত হয়। এরই ক্রমধারায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার থেকে আগত গৌড়ীয় প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ থেকে বঙ্গ কামরূপীর পরবর্তী পর্যায়ে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮)। সময়ের পরিক্রমায় প্রাচীন বাংলা থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ের এ পর্যায়ে উন্নীত হয়।

২.৩ সাঁওতালি ভাষা

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের মুন্ডা শাখার একটি সদস্য হচ্ছে সাঁওতালি ভাষা। অস্ট্রিকরা বাংলায় এসেছিল সভ্যতার একেবারে শুরুর দিকের সময়কালে, আর্যদের বাংলায় আগমনের বহুবছর পূর্বে। বাংলাদেশে বসবাসরত সাঁওতালদের সংখ্যা আনুমানিক দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার, অপরদিকে ভারতবর্ষে বসবাসরত প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ সাঁওতালি ভাষিকগোষ্ঠী। ভারতের ঝাড়খন্ড, আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম,

উত্তরে রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, দিনাজপুর জেলাসহ সমগ্র বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে সাঁওতালি জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছে। বাংলার সাথে সাঁওতালি ভাষার এক ধরনের ভাষা-সাংস্কৃতিক মিল থাকায় অধিকাংশ সাঁওতাল সাঁওতালি উপভাষায় কথা বলে যা মুন্ডা ভাষার অংশ (গ্রিয়ারসন, ১৯৯৪)। ১৯ শতকের পূর্বে সাঁওতালি ভাষা কেবল কথ্য ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৬৫ সালে ময়ূরভঞ্জের কবি পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু 'ওল চিকি' ('Ol Chiki' সংক্ষেপে 'OI') নামক সাঁওতাল ভাষার উক্ত লিপিটির প্রথম প্রচলন শুরু করেছিলেন (লোটজ ২০০৪; ক্যারিন ২০০৮)। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে বাংলা লিপিতেই সাঁওতালদের ভাষা লেখা হয়। ভাষা এবং ক্ষমতা কখনোই নিরপেক্ষ হয় না বরং, এটি অধিকাংশ সময় সংখ্যালঘুদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাকে সহজ করে তোলে। ফলে বর্তমানে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠী বাংলা ভাষার শরণাপন্ন হচ্ছে (ইফতেখার, ২০১৯)।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সাঁওতালি ও বাংলা ভাষার ক্রিয়া রূপতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ অর্থাৎ সাঁওতালি ও বাংলা ভাষার ক্রিয়ার গঠন, পরিবর্তন, ও রূপতাত্ত্বিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করা। দুই ভাষার ক্রিয়া ব্যবহারের পদ্ধতির পার্থক্য ও সাদৃশ্য খুঁজে বের করা, বাংলা এবং সাঁওতালি ভাষার ক্রিয়া গঠনে এক ভাষার ওপর অন্য ভাষার প্রভাব অনুসন্ধান, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং ক্রিয়া রূপতত্ত্বের পরিবর্তনও এই গবেষণায় উঠে এসেছে।

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা

"সাহিত্য পর্যালোচনা হলো সাহিত্য সম্বন্ধে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সম্বোধন করে" (এভিয়ার্ড, ২০১০)। প্রথাগত ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ক্রিয়াপদের প্রকরণ, বিন্যাস, বিবিধ সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাঁওতাল ক্রিয়ার সহাবস্থান ও সাদৃশ্যবাচকতার প্রসঙ্গক্রম দুটো ভাষার ক্রিয়াপদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) গ্রন্থটি বাংলা ক্রিয়াপদে অনার্য ভাষার প্রভাব, মূল ধাতুর প্রকৃতি নির্ণয়, বাংলা ভাষায় মুন্ডা শব্দের প্রবেশ, পুরুষ ও বচন ভেদে অনুসর্গ (কারক-বিভক্তি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলার ওপর সাঁওতালি ভাষার প্রভাবক হিসেবে কাজ করার মতো বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের সাথে সাঁওতাল ক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য একটি বৈসাদৃশ্য হচ্ছে ক্রিয়াপদে মধ্যসর্গ সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি। সংগৃহীত উপাত্তের আলোকে সাঁওতালি ভাষার সাথে এক্ষেত্রে বাংলা ক্রিয়াপদের যে বৈপরীত্য তা ক্রিয়ার কালগত নির্দেশকের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। ড. রামেশ্বর শ' (১৪১৯) গ্রন্থটি মধ্যসর্গ বা প্রত্যয় সংযুক্তির বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনায় তাৎপর্যবাহী ছিল। ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ 'বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা' (২০১১) গ্রন্থে, সাঁওতালি ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের প্রসঙ্গক্রম ব্যাখ্যা করেছেন। সাঁওতালি ভাষার ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে গ্রন্থটি সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। টমাস এডওয়ার্ড পাইনের 'ডেসক্রাইবিং মরফোসিনট্যাক্স' (১৯৯৮) প্রশ্নাবলি তৈরি করতে সাহায্য করেছে। এ ধরনের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য ভাষার গবেষণাকর্মের-ও পর্যালোচনা করেছি: 'ম্রো ভাষার রূপমূলীয়-বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (রাসেল, ২০০৯) এবং 'মারমা ভাষার রূপমূলীয়-বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (আসাদুজ্জামান ও রাসেল, ২০০৮); 'কোডা ক্রিয়ায়

বাংলার প্রভাব' (বর্ণিনি লাহিড়ী, ২০২০)। গ্রেগরি ডিএস অ্যান্ডারসনের 'দ্য মুন্ডা ল্যাঙ্গুয়েজেস' (২০০৮) ভাষার একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি বিকাশ করতে সাহায্য করেছে। এখানে তিনি গভীরভাবে সাঁওতালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক দিক অনুসন্ধান করেন। শ্রী হরিপ্রসাদ নাথের 'সহজ সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা' (১৯৩৫) গ্রন্থে তিনি কিছু শব্দের অর্থ ও বাক্যিক গঠন দেখিয়েছেন যা উপাত্তসমূহকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা হল এখানে কোনো ব্যাকরণগত কাঠামো প্রদান করা হয়নি।

সাঁওতালি ভাষার ক্রিয়া-রূপতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার পরিমাণ অপ্রতুল, তবে পূর্বে কৃত কাজের ভিত্তিতে সাঁওতাল ভাষার গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়ন করা হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে সাঁওতালি ভাষার জটিলতাগুলো অনুধাবন করতে আরো তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কারণ এখনো এ ভাষা সম্পর্কে পূর্ণ অভিহিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

৫. গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাকর্মে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে নমুনা জনসংখ্যা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলা থেকে সাঁওতালিভাষী ৮ জন ব্যক্তির কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় যারা ছিলেন ১৬-৭২ বছর বয়সি। তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ ও বিশ্লেষণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বই ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করা, প্রশ্নাবলি তৈরি করা, ফিল্ড নোট নেওয়া, আইপিএ প্রতিবর্ণীকরণ, উপাত্ত বাছাই, খসড়া প্রণয়ন-পর্যালোচনা, উপাত্ত নির্ভুল কিনা যাচাই করার মতো পদক্ষেপ অনুসৃত হয়েছে। প্রশ্নাবলি প্রস্তুত করতে টমাস এডওয়ার্ড পাইন-'র, 'ডেসক্রাইবিং মরফোসিনট্যাক্স' (১৯৯৭), বর্ণিনি লাহিড়ী ও অতনু সাহা'র লেখা 'ভারতের বিপন্ন ও আদিবাসী ভাষা নিয়ে মাঠপর্যায়ের কাজ পরিচালনার জন্য একটি প্রশ্নাবলির বিকাশ' (২০২০), ড. অন্বিতা আব্বির 'ভাষাতাত্ত্বিক ফিল্ডওয়ার্ক ও ভারতীয় ভাষাসমূহ গঠনের একটি সারগ্রন্থ' (১৯৯৭) সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, বাংলা ভাষার সাথে ভাষাগত তারতম্যের কারণ অনুসন্ধানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় উপায়ে জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাংলা ভাষার সাথে কাঠামোগত মিল থাকায় সাঁওতালি ক্রিয়াসমূহ সহজে শনাক্ত করা সম্ভব ছিল। বাংলা ভাষার সাংগঠনিক ব্যাকরণের সাথে তুলনা করে সাঁওতালি ভাষার ক্রিয়া পদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য গুণগত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে ব্যবহৃত সাঁওতালি ভাষা ও বাংলা ভাষার ক্রিয়া রূপতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আধুনিক কালের ক্রমধারায় বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের যে সরল রূপ বিকশিত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। প্রাচীন যুগের (৬৫০-১২০০খ্রি.) সময়কালে বাংলা ক্রিয়ায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদে সাঁওতালি ক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—'থাহ'—"তুমি থাহ হৃদি মাঝারে", 'গাহ'—"গাহ না তাতে বাউল"। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর সময়কালানুসারে, মুসলিম যুগে (১৩৫০-১৮০০ খ্রি.) বাংলা ভাষায় যেসব শব্দের প্রভাব ছিল তন্মধ্যে তৎসম, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, অস্ট্রিক (মুন্ডা, সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি) দ্রাবিড়, আরবি, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতি ভাষার প্রচুর শব্দ বাংলার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিল। আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি সহ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বের সকল ভাষার পেছনে কাজ করে সার্বজনীন ব্যাকরণ। ফলে

সকল ভাষা মূলত একটি ভাষা পরিবারেরই সদস্য। সাঁওতালি ভাষায় ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। বিভিন্ন সম্পর্ক নির্ণয়ক (Argument Markers) ক্রিয়ামূলের সাথে সংযুক্ত হয়ে বাক্যের অভ্যন্তরীণ কার্য সম্পাদন করে। সাঁওতালি ও বাংলা ভাষার ক্রিয়া-রূপতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, তাদের মূলত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পরিবারভুক্ত হওয়ায় উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো ভাষার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক ব্যাকরণিক গঠন দ্বারা প্রভাবিত।

৬.১ ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ

The Oxford Learners' Dictionary প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে, "ক্রিয়া হচ্ছে একটি শব্দ বা শব্দাংশ যা একটি কাজ (যেমন: খাওয়া), একটি ঘটনা (যেমন: কোনো ঘটনার সংঘটন) বা একটি অবস্থাকে (যেমন: অস্তিত্ব) প্রকাশ করে।" যেকোনো ভাষায় ক্রিয়াপদের শ্রেণি হলো ব্যাকরণগত বিভাজন যার মধ্যে লেক্সিম বা শব্দ রয়েছে যেটি সর্বনিম্ন সময়-স্থিতিশীল ধারণা প্রকাশ করে, যেমন: মৃত্যু, দৌড়, বিরতি ইত্যাদির মতো ঘটনা। বাক্যের ভাবার্থ প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: সমাপিকা (Finite) ও অসমাপিকা (Nonfinite) ক্রিয়া। অপরদিকে, কার্য সম্পাদনার বিচারে সকর্মক (Transitive), দ্বিকর্মক (Di-transitive) ও অকর্মক (Intransitive) ক্রিয়া; এছাড়া প্রযোজক (causative), যৌগিক (compound) ক্রিয়া সহ প্রভৃতি ক্রিয়াপদ বাক্যে পরিলক্ষিত হয়। এসকল প্রকারভেদের ভিত্তিতে সাঁওতালি ভাষার সাথে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের সাংগঠনিক সাদৃশ্য রয়েছে।

৬.১.১ সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া

যে সকল ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্যে পরিপূর্ণরূপে মনোভাব প্রকাশিত হয় সে সকল ক্রিয়াকে বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া। ক্রিয়ামূলের সাথে কালিক নির্দেশক হিসেবে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে এ ধরণের ক্রিয়াপদ গড়ে ওঠে। যেমন—

১. 'আমি বই পড়ি'

এখানে 'পড়ি' একটি সমাপিকা ক্রিয়া, যা বাক্যের প্রধান ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বর্তমান কাল নির্দেশ করছে। এটি বাক্যের কাল, সংখ্যা, ও ব্যক্তির প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়।

যে সকল ক্রিয়ার কোনো কালিক নির্দেশক বাক্যে উপস্থিত থাকে না এবং সে সকল ক্রিয়া যদি কাল নিরপেক্ষ হিসেবে বাক্যে অবস্থান করে তবে এরূপ ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের কতিপয় পদে অসমাপিকা ক্রিয়ার উপস্থিতি পাওয়া যায়।

চর্যা-৫: 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী', (সাঁকোয় চড়িলে ডান বাঁ হইও না)।

মধ্যযুগীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এরূপ ক্রিয়াপদের উপস্থিতি ছিল।

"পাএত নূপুর চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে" (পৃ: ৬-২)।

সাঁওতাল ভাষার ক্ষেত্রেও একইভাবে বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা কাজ করে।

- **সমাপিকা ক্রিয়া**

১. /daka-ko jɔm-a/
'তারা ভাত খেয়েছে'

২. /gidṛɔku bɔl kʰilakanaku/
'ছেলেরা বল খেলছে।'

- **অসমাপিকা ক্রিয়া**

১. bɔi paṛhia huju.am/
'বই পড়ে আসবে'

২. /barek-en horko-ko/
'পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে গেল'

৬.১.২ ক্রিয়ার সক্রিয়শীলতা (Verb Transitivity)

ক্রিয়ার সক্রিয়শীলতা বলতে কোনো কাজ সম্পাদনায় ক্রিয়াপদের সাথে বস্তুর সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতাকে বোঝানো হয় "The property of transitivity refers to how many arguments follow the verb" (Carnie, Andrew, 2013). বাংলা ক্রিয়াপদের অধিভুক্ত সকর্মক ক্রিয়া, দ্বিকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া বাক্যে ক্রিয়ার কর্ম সংযুক্তির বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত, সাঁওতালি ভাষায় এ তিন ধরণের ক্রিয়াপদের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, বিধেয় পদে বাধ্যতামূলক ভাবে দুটো arguments থাকে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোজ্যতা ২, যেমন: মারা, দেখা, প্রশংসা করা প্রভৃতি ক্রিয়াপদ। এসকল ক্রিয়ার আগে বাক্যে দুটি argument দেখা যায়। অনুরূপভাবে, দ্বিকর্মক ক্রিয়ার যোজ্যতা ৩, কারণ এক্ষেত্রে বিধেয় পদে তিনটি arguments পাওয়া যায়। 'রাখা', 'বলা', 'দেওয়া' প্রভৃতি দ্বিকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ। সবশেষে, অকর্মক ক্রিয়ার যোজ্যতা ১, কারণ উক্ত ক্রিয়ায় কেবল একটি argument পাওয়া যায় যেটি ক্রিয়াপদের পূর্বে বাক্য অবস্থান করে।

- **অকর্মক ক্রিয়া**

১. /uni t̪aramd̪ai̯/
'সে হাঁটে'

২. /fɔra kana/
'পানি পড়ছে'

- **সকর্মক ক্রিয়া**

১. /iŋ ɔl ɟɔmd̪on/
'আমি আম খাই'

২. /ɾima cʰobi akaod̪ai/
'রিমা ছবি আঁকে'

- **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**

১. /iŋ mɪsbain aɽãŋ haɾãɲad̪iɔŋ/ '
'আমি বোনকে জামা পরালাম'

২. /iŋ elin boi̯ẽmad̪iʲoŋ/
'আমি এলিনকে বই দিয়েছি'

৬.২. প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb)

প্রযোজক ক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি ক্রিয়া যার নির্দেশে কোনো কাজ কিংবা ঘটনা পরিচালিত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের উক্ত ক্রিয়া 'ণিজন্ত' ক্রিয়া হিসেবে অভিহিত। যেমন—

১. /gɔgɔ gidɔɽɔ daka ɟɔmcuiɖiai/
'মা শিশুকে ভাত খাওয়ায়'

এ বাক্যে ক্রিয়ার সাথে বাক্যের শেষে বিভক্তি /-ai/ যুক্ত হয়ে সাঁওতালি ভাষার প্রযোজক ক্রিয়া গঠিত হয়েছে যেটি দেখতে বাংলা বাক্যের বাক্যিক একক সংগঠনের কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপ আরেকটি বাক্য:

২. /gidɽɔku paɽɔha wɔkuai/
'মাস্টার ছাত্রদের পড়ায়'

৬.৩. যৌগিক ক্রিয়ার গঠন (Compound Verb Structure)

যে ক্রিয়া একাধিক ধাতু নিয়ে গঠিত হয় এবং যেখানে এক বা একাধিক কাজ ও ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়। বাংলা ভাষায় কখনো কখনো বাক্যে যৌথ ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন: তিনি কথা

বলে যাচ্ছেন, পড়া শেষ করে ফেলেছি; উভয় বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া 'বলে', 'করে'। ক্রিয়াদ্বয়ের সাথে মূল ধাতু 'যা', 'ফেল্' এবং শেষে সম্প্রসারিত প্রত্যয় যোগে সমাপিকা ক্রিয়া মিলে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়েছে। যৌগিক ক্রিয়ার একই সংগঠন সাঁওতালি ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে।

১. /uni kul-e sedra-ked-e-a/)
'সে বাঘটির খোঁজ করলো'

২. /iɲɛljanam - ked -e-a-ɲ/
'আমি তাকে জন্ম নিতে দেখেছি'

বিশেষ্য পদের পরে উপর্যুক্ত দুটি বাক্যে অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া মিলে যৌগিক ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৬.৪. ক্রিয়ার ধারাবাহিক-বিন্যাস (Serial Verb Construction)

সাঁওতালি ভাষায় একটি বাক্যে একাধিক ক্রিয়া অবস্থান করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে, 'বাক্যে অভিন্ন প্রতিবেশে অবস্থানরত দুটি ক্রিয়া কোনো পৃথক ঘটনার বিবরণ দেয়, অথবা তারা সমার্থক ক্রিয়া হিসেবে বাক্যে অবস্থান করে।' (নিউকম, ২০০১) অনুরূপভাবে, বাংলা ভাষার বিধেয় পদে জটিল একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ক্রিয়াপদের সাহায্যে অভিন্ন বা ভিন্ন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়।

বাংলা: 'বৃষ্টি থামলে তুমি পড়া বন্ধ করে বাহিরে গিয়ে বই কিনে আনবে'

সাঁওতালি: /bɦəgtɛ-ko raɽu-led-e uni tərup' dɔ-e rɔɽ-gɔt-ked-a/
'যেই না চিতাবাঘের কথা বললো ওমনি তারা তাকে ছেড়ে দিল'

বাংলা বাক্যটির মূল ক্রিয়াপদের মতো সাঁওতালি বাক্যের বাক্যের শেষে মূল ক্রিয়া /ked/-এর সাথে বিভক্তি /-a/ যুক্ত হয়ে পরপর অনেকগুলো কাজের ধারাবাহিক বিবরণ যুক্ত বাক্য গড়ে উঠেছে। যৌগিক ক্রিয়া ও ক্রিয়ার ধারাবাহিক বিন্যস্তকরণ, উক্ত ধারণাদ্বয় সাদৃশ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যৌগিক ক্রিয়ার কাল অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কাজের বিবরণ দিয়ে থাকে।

৬.৫. ক্রিয়া নির্দেশক (Verb Markers)

ক্রিয়া নির্দেশক হল এমন একটি মানদণ্ড যা বাক্যে ক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন, ক্রিয়ার কাজ, অবস্থা, সময়, স্থান, সংখ্যা, ভাব ইত্যাদি নির্দেশ করে। সাধারণত বাক্যে ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা প্রকাশে এসব নির্দেশকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কর্তা ও কর্মের সম্বন্ধের ভিত্তিতে ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।

৬.৫.১ পুরুষ (Person)

সাঁওতালি ভাষায় ক্রিয়াপদের সাথে পুরুষানুযায়ী বিভক্তি যুক্ত হয়। বাংলায় আমি খাই, তুমি খাও, সে খাচ্ছে, iŋ jɔmdɔŋ, am jɔmme, uni jɔmdai; এতে বাংলা বাক্যের ন্যায় সাঁওতাল ভাষার বিশেষ্য স্থানীয় সর্বনামের সাথে ক্রিয়াপদের আনুভূমিক সম্পর্ক (syntagmatic relation) এর মধ্যদিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠিত হতে দেখা যায়।

১. উত্তম পুরুষ: /iŋ ul jɔmdɔŋ/ 'আমি আম খাই'
২. মধ্যম পুরুষ: /am ul jɔmme/ 'তুমি আম খাও'
৩. নাম পুরুষ: /uni d̪aka jɔmdai/ 'সে ভাত খাচ্ছে'

৬.৫.২ বচন (Number)

সাংখ্যিক ধারণা দেওয়ার জন্য বচনভেদে ভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করে কর্তার কার্য সম্পাদনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় কেবল একবচন ও বহুবচন থাকলেও সাঁওতালি ভাষায় একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন রয়েছে। (সংস্কৃত ভাষার মতো)। যেমন:

একবচন: মিৎহড় /mit̪hɔɽ/ (একটি মানুষ)
দ্বিবচন: বারহড়/ barhɔɽ/ (দুজন মানুষ)
বহুবচন: যত্তহড় /ɟɔt̪t̪ohɔɽ/ (অনেক মানুষ)

এই ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ প্রয়োগ না করেও বচন নির্দেশ করা যায়। যেমন: ধিরিকিন্ (d̪ʱirikin) (ছটি পাথর), ধিরিকো /d̪ʱiriko/ (পাথরগুলি)। 'বাক্যের কর্তা চেতন পদার্থ হইলে, ক্রিয়ার সহিত কর্তার সর্ব্বনাত্মক সংক্ষিপ্ত রূপ বচন ভেদে পরিবর্তিত হইয়া সন্ধিযুক্ত হইতে পারে। ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয় না' (পরিমলচন্দ্র মিত্র; ১৯৮৫; ৮০) যেমন- চালাঃকানাঞ/calat̪kanaŋ/ (আমি যাচ্ছি) কিন্তু চালাঃকানাল্যা/calatʰkanalla (আমরা যাচ্ছি)। বাংলায় কিছু বিভক্তি কেবল প্রাণীবাচক শব্দের জন্য, অপরদিকে কতিপয় বিভক্তি অপ্রাণীবাচক শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়।

বইগুলো দাও (-গুলো: অপ্রাণীবাচক)
মেয়েরা খেলছে (-রা: প্রাণীবাচক)

ছেলেরা বল খেলছে /gidɽɔku bɔl kʰilakanaku/ (-ku; প্রাণীবাচক)
বইগুলো ধরো /aima bɔi sa.kʊme/ (-ma; অপ্রাণীবাচক)

আধুনিক বাংলা ভাষায় নাম পুরুষে 'চল্' ধাতুর সাথে একবচনের জন্য 'ক' বিভক্তি ব্যবহার করা হয়।

'সে একবার ঠাকুর বাড়িতে চলুক'

এক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র অভিমত এই যে, 'ক' বিভক্তি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে আসেনি, বরং এটি মুন্ডা ভাষা থেকে এসেছে বলে তিনি ধারণা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় মূল শব্দের পরে কারক-বিভক্তি যুক্ত হওয়ার যে প্রবণতা তা অনার্য প্রভাবপুষ্ট হতে পারে। বাংলা ভাষার উক্ত বৈশিষ্ট্য সাঁওতাল ভাষায় বিভক্তি যোগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতালি ভাষায় পুরুষ ও বচন ভেদে যে অনুসর্গ (কারক বিভক্তি 'case endings') যুক্ত হয় সেটি সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সাঁওতাল থেকে আসার প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রদান ও কর্মে 'কে' বিভক্তি, করণ কারকে 'তে' বিভক্তি, অধিকরণে 'রে' বিভক্তি সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি উভয় ভাষার একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে। (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮)

৬.৬. ক্রিয়ার কাল (Tense)

সাধারণত ক্রিয়ার সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়ে কাজ সংঘটনের সময় নির্দেশ করা হয়। সাঁওতালি ভাষায় ক্রিয়ার কালীক বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় পুরুষ ও ক্রিয়ার সংগতিপূর্ণতা বজায় রেখে।

১. সাধারণ বর্তমান কাল
/in̠ bajaɾiŋ cala:kana/
'আমি বাজারে যাই'

২. সাধারণ অতীত কাল
/in̠ bajaɾiŋ calao̯olina /
'আমি বাজারে গিয়েছিলাম'

৩. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
/in̠ bajaɾ calao/
'আমি বাজারে যাব'

বাংলার মতো সাঁওতালিতেও সময়ের সাথে সংগতি বজায় রেখে ক্রিয়ার সাথে বিভক্তি যোগ করা হয়। এছাড়া বাংলা ভাষার সাথে সাঁওতালির ক্রিয়ার কালের প্রকারভেদেরও সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

৬.৭. ক্রিয়ার নমুনা বিন্যাস্তকরণ (Verb Paradigm Set)

প্যারাডাইম হচ্ছে এক ধরনের কাঠামো, নমুনা, দৃষ্টান্ত (Pattern, framework, example), যার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রভৃতি বিষয়াদির বৈশিষ্ট্যায়ন (Generalization) করা হয়। পনেরো শতকের সূচনালগ্নে এর প্রচলন শুরু হয়। সাদৃশ্যবাদী বা শৃঙ্খলাবাদী (Analogist)-গণ যে সকল শব্দের গঠনগত মিল খুঁজে পেতেন সেসকল শব্দকে একটি অভিন্ন কাঠামোর আওতাভুক্ত করেছিলেন। বাংলা ভাষার মতো সাঁওতাল ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এরূপ প্যারাডাইম

সেট তৈরি করা যেতে পারে। এতে ক্রিয়াপদের মূল, গঠনগত বিন্যাস এবং কোনো অভিন্ন কাঠামোর ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াপদগুলোকে সহজে চিহ্নিত করা যায়।

মূল ধাতু /√jɔm/ - 'খা্' থেকে গঠিত সেট: jɔmme, jamoŋ, jɔmkeda, jamа̃m, 'খাও', 'খাবো', 'খেয়েছি', 'খাবে' (প্রশ্নবাচকার্থে)

অনুরূপ,

/√tahaen/- 'থাক্' - tahaenoŋ, tahẽnа̃m, 'থাকি', 'থাকো' (প্রশ্নবাচকার্থে).
/√t̪aram/ 'হাঁট্' - t̪aramd̪ai̯, t̪aramnɔi, 'হাঁটে', 'হাঁটছে'
/√ke/ 'উঠ্'- tike, kikeŋ, kome, 'উঠালাম'(নিমিত্তার্থে), 'উঠিয়েছিলাম', 'উঠিয়েছিলে'

কিছু উপাত্তের ভিত্তিতে একটি অভিন্ন ক্রিয়ার মূলরূপ থেকে বৈসাদৃশ্যমূলক ক্রিয়াপদের উপস্থিতিও প্যারাডাইমে লক্ষনীয়, যেমন:

/√cal/- 'যা্'/'চল'- /cala/, /cala:kanale/, 'যাই', 'যাচ্ছি'; /calaunai/, /calaunɔn/ 'গিয়েছে', 'গিয়েছি'।

৬.৮. মধ্যসর্গ প্রযুক্তকরণ (Infixation)

মধ্যসর্গ হচ্ছে একপ্রকার প্রত্যয় (affix) যেটি ক্রিয়ামূল বা শব্দের ভেতরে যুক্ত হয়। জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমুলার ইন্দোনেশীয় Tagalog ভাষায় মধ্যসর্গ যোগের প্রবণতা দেখেছেন।

১. sulat 'লিপি', s-un-ulat 'লেখা', s-u-ng-m-ulat 'লিখেছিল'।

বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার সাথে মধ্যসর্গ সংযুক্ত হওয়ার ঘটনা সাধারণত দেখা যায় না। তবে সাঁওতাল ক্রিয়ায় সংগৃহীত উপাত্তের আলোকে মধ্যসর্গ যুক্ত হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিক থেকে বাংলা ক্রিয়ার সাথে সাঁওতাল ক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। নিচের সাঁওতাল ক্রিয়াসমূহে মধ্যসর্গ (infix) সংযুক্ত হলেও বাংলা ক্রিয়ার শেষে পরসর্গ (suffix) যোগে ক্রিয়ার কালগত পরিবর্তন ঘটেছে:

২. খাচ্ছি /jɔmdɔŋ/
খেয়েছিলাম/jɔm-ki-dɔŋ/
খাচ্ছে /jɔmdai/
খেয়েছিল /jɔm-li-dai/

৩. ধরছি /ʃaod̪oŋ/
ধরেছিলাম /ʃao̯-li-d̪oŋ/

৬.৯. কৃতঋণ/পরিগ্রহণ (Borrowing)

সাধারণত দুই বা ততোধিক ভাষিক গোষ্ঠী যখন অবস্থানগত দিক থেকে নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে, তখন ভাষিক গোষ্ঠীদের ভেতর শব্দ গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। সাধারণত এক অঞ্চলের ভাষিক উপাদানের সংস্পর্শে অন্য অঞ্চলের ভাষিক উপাদানে ঋণকৃত শব্দ গ্রহণ করে পরিশীলিত রূপ ধারণ করার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলা ও সাঁওতালি ভাষা দুটি ভিন্ন ভাষা পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে পারস্পরিক শব্দের আদান-প্রদান সংঘটিত হয়েছে। মুণ্ডা ভাষাসমূহ থেকে বাংলা ভাষায় কালানুক্রমিকভাবে (diachronically) শব্দ গৃহীত হয়েছে। বিপরীতে, সাঁওতাল ভাষায় এককেন্দ্রিক (synchronic) সময়ের ব্যবধানে বাংলা ভাষার শব্দ গৃহীত হয়েছে। তবে বয়সভেদে ধার্যকৃত শব্দ ব্যবহারের তারতম্য ঘটে। বয়োজ্যেষ্ঠদের তুলনায় তরুণ-যুবকদের বাংলা শব্দ প্রয়োগের অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। এতে সাঁওতাল ও বাংলা ভাষার ভাষিক মিশ্রণের (code mixing) ফলস্বরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় বাংলা ভাষার শব্দসমূহের সাথে সাঁওতালিতে ব্যবহৃত শব্দের মিল পরিলক্ষিত হয়।

১. /rima cɦobi akaod̪ai/ 'রিমা ছবি আঁকে'
২. /pukurire da bonu a/ ‘পুকুরে পানি নেই’
৩. /iŋ bajar calao/ 'আমি বাজারে যাবো'

তিনটি বাক্যের বিশেষ্য পদে বাংলা ও সাঁওতালির মিল লক্ষণীয়।
বাংলা ও সাঁওতালি ভাষার সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু ক্রিয়ারূপ:

সাঁওতাল ক্রিয়া	**বাংলা ক্রিয়া**
akao/akae	আঁকা
paɽɦa	পড়া
d̪ijn	দেওয়া
fɔra	পড়া/পতন
cala	যাওয়া/চলা

ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহ বিশেষভাবে বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া ভাষার মূল শব্দ সাঁওতালি ভাষায় আগত হয়েছে। অন্যদিকে, অস্ট্রিক ভাষাসমূহের মধ্য থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি হওয়ার ফলে ক্রিয়াপদ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেশি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। খুঁটি, ঢেঁকি, ঝিঙ্গা, ঝাঁটা, চিংড়ি, ঢিবি প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষা বংশ থেকে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করে। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এবং কতিপয় পন্ডিত ব্যক্তিদের মতে, বাংলায় যেসকল শব্দ আর্য ভাষা থেকে আগত হয়েছে সেসকল শব্দ কোনো এক সময় অস্ট্রিক মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রিক বংশ থেকে সংস্কৃত শব্দ ঢক্ক > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলা ঢাকা শব্দ আগত হয়েছে (রামেশ্বর, ১৪১৯)। এটি ধারণা করা হয় যে, মগধের প্রাচীন অধিবাসী মুন্ডাভাষীদের প্রভাবে মাগধী প্রাকৃত অন্যান্য

প্রাকৃত ভাষা থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। কালের পরিক্রমায় মুন্ডা ভাষা (অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের সদস্য) আর্য ভাষার প্রভাবে এর আদি রূপের পরিবর্তন ঘটে।

৬.১০. কোষ্ঠবদ্ধতা (agglutination)

কোষ্ঠবদ্ধতা (agglutination) এমন একটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, যেখানে একাধিক প্রত্যয় (suffix) একসঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল ধাতুর সাথে ব্যবহৃত হয়, এবং প্রত্যেকটি প্রত্যয় পৃথক পৃথক অর্থ বহন করে। বাংলা ক্রিয়াপদের রূপতাত্ত্বিক প্যারাডাইমে সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ (agglutinative features) প্রদর্শন করে (কর, ২০০৯; মজুমদার, ১৯২০)। বাংলা একটি কোষ্ঠবদ্ধ ভাষা। 'লিখছিলাম'—এখানে মূল ধাতু '√লিখ', ঘটমান কাল নির্দেশিত হয় '-ছি' দ্বারা, অতীত কাল '-ল' এবং উত্তম পুরুষ নির্দেশিত হয় '-আম' দ্বারা। সাঁওতালি ভাষায়ও এটি খুব সাধারণ।

মূল ধাতু: "men" (যাওয়া)
রূপান্তর: "men-a-bon-ko"
"men" = যাওয়া
"a" = অতীত কাল (Past tense)
"bon" = দ্বিবচন (Dual number marker, two people)
"ko" = ভবিষ্যৎ কাল (Future tense)
অর্থ: "আমরা দুইজন ভবিষ্যতে যাব।"

এখানে একাধিক প্রত্যয় মূল ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে একটি বিশেষ অর্থ তৈরি করেছে।

৬.১১. ক্রিয়ার উহ্যতা (Ellipsis of Verbs)

সহায়ক ক্রিয়া (auxiliary verbs) এর উহ্যতা (ellipsis) বলতে বোঝায়, বাক্যে সহায়ক ক্রিয়া বা তাদের অংশ সরিয়ে দেওয়া, কারণ তা বাক্যের অন্যান্য অংশ থেকে স্পষ্ট বা অনুমানযোগ্য। সাধারণত এই ধরনের উহ্যতা বাক্যের প্রেক্ষাপট বা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যায়। বাংলা ও সাঁওতালি উভয় ক্ষেত্রেই ক্রিয়ার উহ্যতা লক্ষণীয়।

বাংলা: 'তুমি কেমন আছো? আমি ভালো। (আছি)'

সাঁওতালি: /uni +boyhatiő/ 'সে আমার ভাই (হয়)'

৬.১২. নঞর্থক প্রক্রিয়া (Negation process)

নঞর্থক প্রক্রিয়া ভাষাগতভাবে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে এবং ভাষার কাঠামো অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। বাংলা ভাষায় নঞর্থক উপসর্গ সরাসরি ক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে, যেখানে সাঁওতালিতে না-বোধক শব্দ বা অংশ ব্যবহার করা হয়। উভয় ভাষার নঞর্থক প্রক্রিয়া তাদের ভাষার ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর নির্ভর

করে। সাঁওতালি ভাষায় নঞর্থক ক্রিয়া গঠন করতে "na" অথবা "a-" মত উপসর্গ ব্যবহার করা হয়। যেমন, "men-na" (যাইনি), "kan-na" (খাইনি)। এছাড়া, "bo" ব্যবহার করে ভবিষ্যৎকাল নির্দেশ করা হয়, যেমন: "men-bo" (যাবো না)। বাংলায় সব ক্ষেত্রেই নঞর্থক 'না' বাক্যের শেষে বসলেও (আঞ্চলিক বাংলায় কখনো মাঝে বসে) সাঁওতালি ভাষায় কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন:

/iōdo cet ho baē joma/
'আমি কিছুই খাব না'

—এখানে 'baē' অর্থ 'না', যা ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে। তবে বাক্যের গঠনানুসারে কর্তা বা কর্ম অনেক সময় আগে পরে বসে।

বাংলা ভাষায় সাধারণত 'কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া' (SOV) ক্রম থাকে। সাঁওতালি ভাষায়ও সাধারণত একই ক্রম থাকে, তবে তাদের বাক্যের ক্রমবিন্যাসে কিছু ভিন্নতা দেখা যেতে পারে, বিশেষত ক্রিয়া যুগপৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

৭. গবেষণা ফলাফল ও আলোচনা

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, সাঁওতালি ও বাংলা ভাষার ক্রিয়ার গঠনে মূলত ঐতিহাসিক প্রভাব এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কারণে পার্থক্য তৈরি হয়েছে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে উভয় ভাষার মধ্যে মিল পাওয়া যায়। এই গবেষণা থেকে বেশ কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়:

১. ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ, যৌগিক ক্রিয়ার গঠন, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার নমুনা বিন্যস্তকরণ, ক্রিয়ার উহ্যতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি বিবেচনায় বাংলার সাথে সাঁওতালির সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে, বচন, নঞর্থক প্রক্রিয়া, মধ্যসর্গ প্রযুক্তকরণ ইত্যাদি বিবেচনায় সাঁওতালি বাংলা ভাষা থেকে অনন্য।
২. বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় একে অপরের প্রভাব সুস্পষ্ট, বিশেষত ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে।
৩. ভাষাগত সংকরায়নের কারণে সাঁওতালি ভাষায় বাংলা ভাষার অনেক শব্দ গৃহীত হয়েছে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে।
৪. পদক্রম ও বাক্যের শ্রেণিবিভাগে বাংলা ও সাঁওতালির সাদৃশ্য বিদ্যমান।

৮. উপসংহার

বাংলা ভাষার সাথে সাঁওতালি ভাষার ক্রিয়া রূপতত্ত্বের তুলনামূলক পর্যালোচনায় এ গবেষণাকর্মে উল্লেখযোগ্য কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সাঁওতালি ভাষা বাংলার সংস্পর্শে উল্লেখ্য পরিমাণে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে সাংগঠনিক বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করেছি মধ্যসর্গ সংযুক্তির ক্ষেত্রে। এছাড়া কিছু বাক্যে নঞর্থকবাচক পদ ক্রিয়ার পূর্বে দেখা গিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য আর্থ-সামাজিক ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার চাপে সাঁওতালিরা বাংলা ভাষা, বাংলা শব্দ ব্যবহারে সক্রিয় হচ্ছে। ভাষাগত বৈচিত্র্য ও আঞ্চলিকতার কারণে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষার

উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেও, তাদের ভাষার সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য এখনও বজায় রয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এ ভাষিক গোষ্ঠীর ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান, জীবনাচরণের পর্যবেক্ষণ এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপরে ব্যাপক পরিসরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ গবেষণাটি প্রথাগত ও সাংগঠনিক ব্যাকরণের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে ভাষা গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী এবং ভাষা-অভিসন্ধিৎসুদের জন্য একটি ভালো উৎস হতে পারে, একই সাথে সাঁওতালি ভাষাভাষীদের সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সহায়ক হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

উল্লেখপঞ্জি

আজাদ, হু. (১৯৮৮)। *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আজাদ, হু. (১৯৯৯)। *অর্থবিজ্ঞান,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

মোরশেদ, আ. (১৯৮৫)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

শহীদুল্লাহ, মু. (১৯৬৫)। *বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

শ', রা. (১৩৯০)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি

সিকদার, স. (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা,* বাংলা একাডেমি প্রকাশনা

সিকদার, স. (২০১৪)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা - সংস্কৃতি ও অধিকার,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

সিকদার, স., ও পলি, ন. (২০১৬)। *বাংলাদেশের ভাষা ও লিপি,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

Abbi, A. (2001). *A manual of linguistic fieldwork and structures of Indian languages LINCOM handbooks in linguistics,* Muenchen: Lincom Europa.

Anderson, G. (2008). *The Munda Languages*, Routledge

Aveyard, H. (2010). *Doing a literature review in health and social care: A practical guide*, Berkshire, Great Britain: Open University Press.

Basu, D. and Wilbur, R. (2010). *Complex predicates in Bangla: An event-based analysis*, Rice Working Papers in Linguistics, Vol. 2, 1-4, 7-8

Bodding, P. (1929). *A Santal Dictionary*, Vol. 1, Part 1, OSLO: DET NORSKE VIDENSKAPS AKADEMI

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*, Berlin: Mouton de Gruyter

Carnie, A. (1969). *Syntax: A Generative Introduction*, Blackwell Publishing, Ltd

Eftekhar, S. (2019). *Changing Pattern of Santali Language: A Trilingual Situation and the Emerging Conflict,* Jagannath University Journal of Arts, Vol.9, 142, 144-145

Haspelmath, M., & Sims, A. (2013). *Understanding morphology*. Routledge.

Liber, R. (2009). *Introducing Morphology*, New York: Cambridge University Press

Payne, T. (1997). *Describing Morphosyntax*: A guide for field linguists, New York: Cambridge University Press

Skrefsrud, O. (1873). A *Grammar of the Santhal Language*, Banaras: Medical Hall Press

Sultana, A. (2016). *Description of Verb Morphology in Colloquial Bangla*, BRAC University Journal, Vol. XI, 71-74

Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics

ISSN: 2581-494X

পশ্চিম বাংলার কুম্ভশিল্প-বিবর্তনের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে কুমোর পাড়ার শব্দ

সুমন দাস

মাজিগ্রাম বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:)

ARTICLE INFO

Article history:
Received 28/12/2024
Accepted 25/04/2025

সূচক শব্দ:
কুম্ভ-শিল্প,
কুমোর পাড়া,
শব্দ,
লুপ্তপ্রায় শব্দ,

অতিথি সম্পাদক
শংকর রাম বর্মন

আয়োজক: শব্দ /ʃɔbd̪o/

সারসংক্ষেপ

বেঁচে থাকবার সংকটের বিরুদ্ধে টিকে থাকবার লড়াই-এর কৌশলই সংস্কৃতি। যে হারবে তার কাজ, পেশা, নেশা সব হারিয়ে যাবে। মানুষ যেমন পুরানো পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরে, প্রাণও জীর্ণ দেহ ছেড়ে নতুন শরীর নেয়। সংস্কৃতিও এক মানব-কৃতি থেকে আরেক মানব-কৃতিতে ঠিকানা বদল করে। সব ব্যবস্থা অস্থায়ী, স্ব-বিরোধীতায় উন্মুখ। প্রগতি আর যন্ত্রদাবির গর্ভে লীন হতে বসেছে বাংলার কুমোর পাড়ার গড়ন বাড়ি। গুণিতক হারে কমে যাচ্ছে কুম্ভশিল্প, খুব স্বাভাবিকভাবেই কুম্ভ-শব্দের অস্তিত্ব সংকটের খাদে দাঁড়িয়ে! প্রতিদিনের জীবন আর জীবিকার বৃত্তে কত শব্দের ভাববীজ ঘোরাফেরা করে। তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে বস্তু বিশ্বের সাথে মানব মনের সম্পর্কের স্পষ্ট পথটি- শব্দ। ভাষিক বৈশিষ্ট্য, এমনকি ভাবও শব্দ থেকে শব্দে ছড়িয়ে পড়ে।

কুম্ভ-শিল্প সময়ের সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মেই। এই বদলে যাওয়া শিল্পের প্রয়োগ, কৌশল সবই বিবর্তিত হচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া শিল্পর সাথে শব্দগুলোর সংরক্ষণ বড়ো জরুরি। এই শব্দের সাথেই জড়িয়ে আছে কুম্ভ-শিল্পের রীতি ও প্রয়োগ। সময়ের সংকট থেকে বেড়িয়ে আসবার পথ খুঁজেছে পাঁচমুড়ার মতো কিছু গ্রাম। সময়ের সাথে নতুন নতুন সমস্যা আসবেই, কিন্তু সমাধানের পথ খুঁজতেই হবে। চাষ, মাটির পাত্রের মন্দা-চাহিদা, মাটির অভাব, প্লাস্টিকের বাড়-বাড়ন্ত, গ্যাস-চুল্লি, সময় সচেতনতা, আর্থ-সামাজিক সেন্টিমেন্ট—এসব তো থাকবেই। সময় উপযোগি কুমোরের চাককে ঘোরাতে হবে, আঙুলকে নতুন তালিম দিতে হবে। শুধু শিল্প আর এতিহ্য নয়, সুস্থতার দিশা এই মাটিতেই। এই প্রবন্ধে কুম্ভ-শিল্পের সাথে জড়িত শব্দগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। যার মধ্যে অনেক শব্দের ব্যবহার কমে গিয়েছে এবং অনেক শব্দ বিলুপ্তির পথে। বিলুপ্তপ্রায় শব্দগুলি নিয়ে থাকবে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা।

Corresponding author's email ID: suman.das923@gmail.com

১. শুরুর কথা

স্বামী গম্ভীরানন্দ উপনিষদের ব্যাখ্যায় বললেন- “বেদ শব্দের মুখ্যার্থ জ্ঞানরাশি এবং গৌণার্থ শব্দরাশি।” অতীন্দ্রিয় শক্তির উপলব্ধি বেদ এবং তার হোতা ঋষি। যে মুহূর্তে আর্য ঋষি উপলব্ধি করেছেন অর্থ, সেই মুহূর্তে তাঁর উচ্চারিত স্বন জ্ঞান বা প্রমা। তারপর যতবার শ্রুতি হয়ে শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে, প্রত্যেকবার তার অস্তিত্বের নাম শব্দ। প্রাজ্ঞ-ঋষির ধ্যানজ ধ্বনি আর বেদের লিখিত শব্দের ব্যবধান বিস্তর। লিখিত বেদের শব্দ ধরে কিছুতেই পৌঁছানো সম্ভব নয় বৈদিক অনুভবে। শব্দ তাই প্রকৃত অর্থে স্রষ্টার মৌলিক কৃতি। সময়ের সাথে বহু ব্যবহারে সব শব্দই তার মৌলিকত্ব হারায়। শব্দ স্রষ্টার সাথে শব্দ ব্যবহারকারীর মানসিক দূরত্ব যত বাড়ে, শব্দ ততোটাই তার মৌলিক অনুভব থেকে সরে আসে। সরতে সরতে জীবন ও যাপনের বিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে শব্দের বনেদি ভাবাবেগে; ঠিক তখনই শব্দ তার মৌলিকত্ব বা প্রয়োজনীয়তা হারায়।

প্রত্যেক ভাষাভাষী অঞ্চলের জন্য যেমন নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ হয়, তেমনই প্রত্যেক কর্মবৃত্তে ঘোরাফেরা করে সেই পেশার ভূমিজ শব্দ। পেশা তো শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই জন্ম নেয় না, মনের আবেগ তার সাথে মিলেছে বলেই- পেশা হয়েছে ধারাবাহিক, অনেকক্ষেত্রে জাতি বাহক। পেশা-নেশার স্বাভাবিক রসায়ন যেখানে ঘটেছে, সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে সর্বজনীনতা। সৃষ্টির সেই নিজস্ব পথে আপন গরিমায় গড়ে উঠেছে বৃত্তি-শব্দকোষ বা বৃত্তি-শব্দবাস। সৃজনের ভরনার জন্য এই শব্দবাস ভীষণ জরুরি। আবার মানব সমাজের কোন একটি ক্ষেত্র বা পেশা আরেকটি ক্ষেত্র বা পেশার সাথে সম্পর্কিত। সমাজ এবং মানব দুটি অস্তিত্বই ব্যাবহারিক দিক থেকে মিশ্র। স্বাভাবিকভাবেই এক পেশার সাথে আরেক পেশার অনিবার্য যোগে যুক্ত হয় নানা পেশার শব্দ। সমাজের একটি পেশা ভেঙে পড়লে, সেই সংক্রমণ অন্য পেশায় ধায়। শব্দ-বিবর্তনের গর্ভবাসে থেকে যায় পেশা-বিপর্যয়ের সক্রিয় ভূমিকা।

সময় অনিবার্যভাবে বদলে ফেলে তার চাহিদা। ব্যক্তি থেকে সমষ্টি মানুষ, কেউ বাদ যায় না সেই পরিবর্তিত ডারউইনবাদের সাথে অভিযোজিত হওয়ার লড়াইয়ে। শত পরিবর্তনেও কিছু মৌল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে সূর্য, গাছ, নদীর মতো। গতি, প্রযুক্তি, বিপণন, বিশ্বায়ন—শব্দগুলো তো নিছক অর্থযুক্ত অক্ষর সমষ্টি নয়, এক একটা সামাজিক এবং মানবিক ধাক্কাও। বিবর্তনের প্রেক্ষিতে অনেক পেশাতেই এসেছে এই ধাক্কা। বদলে গেছে পেশাগত জীবনের ক্যানভাস। অবশ্য এক্ষেত্রেও মৌল কিছু শৈলী অটুট ভাবেই বেঁচে আছে হাজার বছর ধরে, সাথে সেইসব পেশাকেন্দ্রিক শব্দও।

২. শব্দের তত্ত্ব

বিনির্মাণবাদের ব্যাখ্যায় তপোধীর ভট্টাচার্য বললেন- "জীবনের প্রতিবেদনকে সংক্রামিত ও রূপান্তরিত করার দায় বহন করে সংবেদনশীল মানুষ।" একটি শব্দের নাম যদি হয় 'কুম্ভ'[1]; সেই শব্দটি নির্মাণের জন্য স্রষ্টার সংবেদনশীল একটি মন নিবিড়ভাবে নানান রূপান্তর ও সৃজনের পথ বেয়ে নির্মাণ করেছিল মাটির সেই পাত্র। তারপর পুড়িয়ে তা চিরস্থায়ী করবার পথটিও রীতিমতো গবেষণা বা সাধনা। দীর্ঘ সেই সৃজন ও রূপান্তরের পথ পেরিয়ে জন্ম নেওয়া পাত্রটি শিল্পীর সন্তান। তখনই প্রয়োজন হয় একটা নামের। যে নাম আমরা শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করি। যা একান্তভাবেই

লিখিত রূপের উচ্চারণ। স্রষ্টার গর্ভবাসের তপস্যায় জন্ম নেওয়া শব্দ আর ব্যাবহারিক জীবনের বিনির্মাণে বহু ব্যবহৃত সেই শব্দটির অনেকটা ব্যবধান। ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রশ্নটি এ বিষয়ে খুব প্রাসঙ্গিক- "মানুষের মুখের সাধারণ কথাবার্তায়, বক্তৃতায় কিংবা লিখিত ভাষা পঠিত হবার কালে যে ধ্বনি স্রোতের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে থেকে একটি শব্দকে কিভাবে আলাদা করা যায়?" সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষিক ধারণা শব্দ, অথচ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নাই! 'জালা'[২] শব্দটি জলাধার হলেও 'জালার মতো পেট' শব্দ-বন্ধে থাকা 'জালা' একই অর্থের দ্যোতনা দেয় না। ভাষাবিদ হুমায়ুন আজাদ রূপমূল ছাড়িয়ে শব্দের অর্থবোধ পৌঁছে দিতে হয় চেয়েছেন 'লেক্সিম'এ- লেক্সিমকেই মেনে নিতে হয় অর্থের একক হিসাবে।"

অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনা কিম্বা রূপিম-লেক্সিম পেরিয়েও শব্দ বেঁচে থাকে তার প্রয়োগের আন্তরিকতায়। যখন একটি গোষ্ঠীর আদি ঘরানা সময়ের দাবি মিটিয়ে দিতে পারে না, তখন সেই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক শব্দগুলোর অভিধা-রূপিম থাকে, থাকে না শব্দগুলোর জীবন্ত প্রয়োগ। আমাদেরই ব্যাবহারিক পরিবর্তন বদলে দিচ্ছে শব্দের সহবাস। রসগোল্লা সেদিনও ছিল আজও আছে, কিন্তু তার আধার 'হুলুনি/হোলা'[৩] আজ নাই! প্লাস্টিক আধারেই আজ রসগোল্লা খরিদ হয়। সময়ের দাবি মেনে এই সহজলভ্য পরিবর্তনে আমরা সম্মতি দেওয়ার সাথে সাথেই কুমোর পাড়া থেকে হোলার ছাঁচটা ফিকে হয়ে গেল! হারিয়ে যেতে বাধ্য হল, কুমোর পাড়ার একটি শব্দ। শব্দেরা প্রয়োজনের তাগিদেই জন্ম নেয়, আবার অপ্রয়োজনে ব্যবহারের বৃত্ত থেকে ঝাপসা হয়ে যায়; থাকে কেবল তার বর্ণ কাঠামোর নিষ্প্রাণ উচ্চারণটুকু।

৩. কুম্ভ ইতিকথা

"কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।" -অর্থাৎ কুম্ভকার ও তন্তুবায় ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম নিয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণের এই শ্লোক কুম্ভকারকে উত্তম সংকর জাতির তালিকায় রেখেছে। বাংলাদেশের লোকজীবনে শিবের রুদ্রাক্ষ থেকে রুদ্রপালের জন্মের গল্প-কথা পদ্মা-মেঘনার মতো বইছে। খাজুরডিহি গাঁয়ের (পূর্ব বর্ধমান) ঘোষপাড়া লাগোয়া কুমোর পাড়ায় ৺নন্দ পালের ছেলে জয়দেব পাল (৭০) দইয়ের হাঁড়ির কানা মুড়তে মুড়তে এখনো বলেন বাপ-ঠাকুরদার বয়ে আনা ছড়া- "হাঁড়ি গড়ি তাড়ি তুড়ি শিব চক্র বাণ"। সওদা না থাক, এই ছড়াতে কুমোরের গর্ব বেঁচে আছে। দক্ষিণা মন্দিরে শিবের বিয়ে হওয়ার পর অধিবাসের জন্য ব্রহ্মা সোনার ঘটে জল আনেন। ত্যাগি শিব স্বর্ণঘটে রেগে যান- "গলার রুদ্রাক্ষ খুলে ভূমিতে ফেলেন।" সেই রুদ্রাক্ষ থেকে রুদ্রপালের জন্ম হয়। বিষ্ণু রুদ্রপালকে চাক[৪] বানাবার জন্য দেন সুদর্শন চক্র। ব্রহ্মা পেলে[৫] তৈরির জন্য দেন কমণ্ডুল। পর্বতের ওপর বিষ্ণুচক্র ঘোরানোর চাকলাড়ি[৬] হিসাবে শিব দেন ত্রিশূল। শিব অধিবাসের মাটির ঘট গড়লেন রুদ্রপাল- "পর্বতের ওপর চক্র করলেন স্থাপন/ অম্বুশলা দিয়া তারে ওস্তারি চাপন।/ মৃত্তিকার ঘট গড়িয়া দিলাম হে তখন/ তীক্ষ্ণাদি দিয়া তারে করলেন দাহন।/ রুদ্রপালের সন্তান মোরা সদাশিবের নাতি।" এই লৌকিক ছড়ায় কুমোর পাড়ার আভিজাত্য। বাংলার অনেক গাঁয়েই কুমোরপাড়া বহরে বাড়লেও ছোটো হচ্ছে পেশায় এবং নেশায়। মাটির জোগানের অভাব, চাহিদার বানিজ্যিক বিবর্তনে টিকে থাকতে পারছে না শালতলা[৭]! বিশ্ববাজারের লেনদেন যত বাড়বে, আঞ্চলিক গরিমার অস্তিত্ব ততই ফিকে হয়ে যাবে। মৌলিকতায় অনন্য এবং আধুনিক হতেই হবে কুম্ভ-শিল্পীদের। আগামী কুড়ি-ত্রিশ বছরের মধ্যে হয়তো গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাবে হাঁড়ি, হোলা[৮], পাদনা[৯], সরা[১০], খাপুড়ি[১১] গড়নের মানুষগুলো। কারিগরি

আধুনিকতার ঘূর্ণিতে চাকের ঘোরা থেমে যাবে! "সহজপাঠ"-এর ছড়াটা ইতিহাস হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নাই- "কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি/বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি"।

সময়ের সাথে খোঁজের নতুন পথে ইতিহাসের বয়স বাড়ে। হরপ্পা সভ্যতা থেকে ইতিহাস প্রায় দু'হাজার বছর পিছিয়ে যায় মেহেরগড়ের আবিষ্কারে। আগুন আর চাকার যৌথ অন্বেষণে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে কুমোরের চাক আর চুল্লির প্রয়োগ দেখিয়েছে এই সভ্যতা। ইতিহাসবিদ রণবীর চক্রবর্তী লিখছেন- "মৃৎপাত্রের ব্যবহার নিয়মিত ও ব্যাপক না হলে এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। মেহেরগড়ের মৃৎপাত্র ছড়িয়ে রয়েছে ৭৫-হেক্টর জুড়ে থাকা এলাকায়।" মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতায় প্রায় ন'হাজার বর্গফুট আয়তনের শষ্যাগার পাওয়া গেছে, যা পোড়া ইটের তৈরি। কৃষ্ণলাল দাস মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতায় মাটির পুতুল নির্মাণ বিষয়ে লিখছেন- "মূর্তিগুলির নির্মাণকার্যে শিল্পীরা কোনপ্রকার ছাঁচ বা যন্ত্র ব্যবহার করেননি; ... পক্ষীচঞ্চুর ন্যায় নাসিকা, কলাই বা মুসরীর ন্যায় চক্ষু, কচি জংলী কুলের ন্যায় স্তনযুগল ভিন্নভাবে নির্মাণ করে মাটি শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে ঐ অঙ্গগুলি আঙুলের চাপে মূর্তির কাঠামোর সঙ্গে সংলগ্ন করেছেন।" প্রাকৃতপৈঙ্গলে যে আকাঁড়া চালের ভাত রান্না হয়েছিল, তা মাটির হাঁড়িতেই। বাংলা ও বাঙালির জীবন-সংস্কৃতির বাঁকে বাঁকে পোড়ামাটির পরশ খুবই ঘনিষ্ঠ।

৩ ও ৩৩ সংখ্যক চর্যাগানে যথাক্রমে মৃৎপাত্রের প্রভাব স্পষ্ট- "এক সে ঘড়লী সরুই নাল" ও "হাঁড়িত ভাত নাহি"; কারণ চর্যার যুগে নিম্নবৃত্তের ঘটি আর হাঁড়ি পোড়ামাটির হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"এর 'রাধাবিরহ'তে এক ধাপ এগিয়ে পাওয়া গেল কুমোর চুল্লির খোঁজ- "মোর মন পোড়ে যেহু কুম্ভারের পণী।"। আরও পরে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"এর পাতায় দই আর দুধের আধার হিসেবে এসেছে পোড়ামাটির পাত্র- "দধি দুগ্ধ খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পেলায়।"। পদাবলীর বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেও রয়েছে কুমোরের কলসী- "মঙ্গল-কলস করব কুচভার", "কলসে কলসে ছিঁচে ঘুচে না পাথার।" ষোড়শ শতকে কবি মুকুন্দের "অভয়ামঙ্গল" কাব্যে কালকেতু-ফুল্লরার জোড়ের উপমা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন- "খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।" কুমোরের এই কলসই ময়মনসিংহ গীতিকায় এনেছে রোমান্সের আবেগ- "কোথায় পাব কলসী কইন্যা"। কুম্ভকৃতি যেন বাংলা সাহিত্যে জীবনের মতোই জড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি" থেকে শতবর্ষের প্রাসঙ্গিক ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর "অমৃত কুম্ভের সন্ধানে" সর্বত্রই কুম্ভ-শিল্পের ধারা। তবু কুম্ভকৃতির সাথে জড়িয়ে থাকা কত শব্দ তার আবেগ সমেত হারিয়ে যাচ্ছে।

৪. বিবর্তন ও কুম্ভকৃতি

সময়ের চাকায় ঘুরছে জীবন, কুমোরের চাকায় মাটি। প্রতিদিনের জীবন আর যাপনের মধ্যে যেখানে সত্য আর সুন্দরের সহ-অবস্থান ঘটে, সেখানেই সংস্কৃতি একটা রূপ নেয়। একতাল মাটি সত্য, সত্য গড়নের আপ্রাণ নেশা ও পেশা। মনের মাঝে সুন্দর গড়নের ছবিটা কুমোরের দশটি আঙুলে জীবন্ত হয়ে ওঠে, চাক সেই মৃৎ-শিল্পের মঞ্চ। আর্থ-সামাজিক চাহিদা গড়নে আঘাত হানে। অন্য অন্য পেশার সাথে বদলে যায় কুমোর পাড়া। শ্রম বাঁচানোর বৈমানিক চাহিদা মাটির চাক ভেঙে উপহার দেয় যন্ত্র-চাক। কারিগরি বিদ্যার সাথে লড়াইয়ে হেরে যায় মাটির হাঁড়ি-কড়াই।

কৃষকের গোয়াল ঘরে যখন গরুর ভিড় কমে আসে, গোয়ালা পাড়া যখন ছোট হয়, গো-লালনে; তখন পাদনা, জালা, সরা, কলসির প্রয়োজন কমে যায়। ঘুঁটের[১২] অভাব এবং ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে সুখি রান্নাঘর বেছে নেয় গ্যাস-উনান। এক নিমেষে পোড়ামাটির পাত্র বাতিল হয়ে গেল! মাটির পাত্র গ্যাসের আগুন সইতে পারে না! এই সুযোগে আধুনিক কিচেনে পাকাপাকি জায়গা করে নিলো স্টিল। আর মাটির গড়ন নয়, কারখানার চকচকে বাসনের আওয়াজে মুখরিত সংসার। গ্রামীন মেলায় কত রকমের মাটির পুতুল বিক্রি হতো। এখন শান্তিনিকেতন, দধিয়া, জয়দেব মেলায় প্লাস্টিকের খেলনাপাতির রমরমা। মোড়ে মোড়ে মিষ্টির দোকানে সার সার হোলা থাকতো, শালপাতা আর সুতলি দড়ির মোড়কে মাটির হোলায় মিষ্টি যেত কুটুম বাড়ি, সেখানেও পলিপ্যাক রাজত্ব করছে। প্লাস্টিকের সর্বব্যাপি অভিযান আর সুবিধাপ্রিয় মানুষের সময় সন্ধানি মন একসাথে চেপে ধরেছে কুমোরপাড়াকে। বান[১৩] গড়নের কুমোরটি চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেছে অন্য পেশায়! বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ধিকিধিকি করে জ্বলছে শাল। ক্লান্ত কুমোর চাকতলায় আতালে[১৪] কলস রেখে বাঁ হাতে বোলে[১৫] নিয়ে, ডান হাতে পিটনে[১৬] দিচ্ছে থপথপ করে। কুঁড়ো[১৭]-কাঁচকির[১৮] অভাবে কাঠমিলের গুঁড়ো কাঠ কিনে কুমোর-বউ শাল জাগিয়ে আছে। নেভা নেভা সেই আগুন যেন শঙ্খ ঘোষের কবিতা হয়ে উঠেছে- "নিভন্ত এই চুল্লিতে মা/একটু আগুন দে/আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি/ বাঁচার আনন্দে।"।

৫. হারানো প্রায় শব্দের খোঁজে ক্ষেত্র-জরিপ

৫.১ ক্ষেত্র একঃ মঙ্গলকোট থানার পূরাতনহাট-ইছাবর

কুমোর পাড়ার সুভাষিণী দেবী (৪৫, পুরাতনহাট)রা কুমোরের মিথ বুকে নিয়ে আজও বলে চলেছেন- "শিবের রুদ্রাক্ষ থেকে আমাদের জম্ম। তাই শিবপুজো আর দুগ্গাপুজোয় গড়ন গড়ি না। চোত মাসের হোমের দিন থেকে বোশেখ মাস পয্যন্ত একমাস আর দুগ্গাপুজোয় পনেরো দিন পালন করি। এই দেড় মাস গড়ন-পোড়ন করি না। জোষ্টো মাসের বিজোড় শনিবার চাকপুজো[১৯] করে গড়ন শুরু করি। শীতলা ষষ্টির দিনেও শালে আগুন দিতে নাই।"

কানাদীঘির এঁটেল মাটি আর কোপাইয়ের ডেমুর থেকে আনা বনোকমাটি[২০] বতর[২১] করে চাকতলায় বসে পাগুই[২২] গড়ছিলেন পুরাতনহাট গাঁয়ের শিশির পাল (৬২)। চাঁচনে[২৩] দিয়ে সুভাষিণী পাল মাটি চাঁচছেন। ধুকিপিঠের হাঁড়ি[২৪], গোলা[২৫], নাড়াখোলা[২৬], ছাঁকাখোলা[২৭], ডাবা[২৮], ডেয়ে[২৯] এইসব গড়ন শিখেছিলেন বাবা ৺নরহরি পালের কাছে। টাকায় কুড়িটা হোলা বিক্রি করেও সংসার চলেছে। এখন গড়নের ওপর ভরসা করে সারাবছর চলে না! বুদবুদ, পানাগড়, শক্তিগড় থেকে প্রতিদিন আসতো গরুর গাড়ি। শিশির পাল বড়ো কষ্টে কইলেন- "আগে ঘরে ঘরে গরু ছিল, মুড়ি ভাজা ছিল, ধান সেদ্দ ছিল, মাটির আকাও[৩০] ছিল। এখন ঘরে ঘরে গ্যাস, মশলা বাঁটার যন্তর, মুড়ির মিল, চালের মিল বারোটা বাজিয়েছে আমাদের!"

অজয়ের দক্ষিণের গ্রাম ইছাবর। চণ্ডীমঙ্গলের ইছানীনগরের মিথ জড়ানো এই গাঁয়ে বর্তমানে ১২০ ঘর কুমোরের বাস। কিন্তু শালের আগুন ধিকিধিকি করে এখানে একটায় এসে ঠেক খেয়েছে! বছর ত্রিশ আগেও এই গাঁয়ে ৩৫-৪০ টি শাল আর গড়ন-বাড়ি ছিল; এখন ৺রঞ্জন পালের ছেলে মানিক পাল (৭৫) শাল বাঁচিয়ে রেখেছে। এ গাঁয়ে এককালের বাঘা কুমোর ছিলেন ৺সুধাকর পাল, ৺মহাদেব মণ্ডল। তালের বাগা[৩১], শর[৩২], হোগলা[৩৩] ছিল এ

গাঁয়ের জ্বালানি। কানা দীঘি, কামার পুকুরের মাটি ছিল গড়নের কাঁচামাল। বিকেল থেকেই শালের ধোঁয়ায় কোমরপাড়া ভরে উঠতো। সোম, শুক্কুর নতুনহাটে গরুর গাড়ি করে গড়ন বেচতে যেত বছর কুড়ি আগেও। কখনো মাটি আনা, আবার গড়ন বেচার বোঝাই গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজে ভরে উঠতো কুমোর পাড়া।

৫.২ ক্ষেত্র দুই: নানুর থানার থুপসাড়া-রামকৃষ্ণপুর

থুপসাড়া গাঁয়ে ৬০-৬৫ ঘর কুমোরের বাস। ৺বাদল পালের ছেলে দয়াল পাল (৬৪) আগে বাঁকে[৩৪] করে ন'দা, পালুন্দী, বনগাঁ, জলুন্দী, খালা, পাপুড়ি এইসব গাঁয়ে বেচে আসতেন মালসা[৩৫], পয়া[৩৬], হাঁড়ি, কলসি, বান, কড়া। এখন সবকিছুর চাহিদা কমেছে! ৺রামচন্দ্র পালের ছেলে অনিল পাল (৭২) তখন মাটির বতর করছিলেন। মাটির থান[৩৭] থেকে বেতিতে[৩৮] চিরে, সেই চেরামাটি[৩৯] জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে তিন-চার ঘন্টা রাখা হয় মজে ওঠার জন্য। তারপর পরিমাণ মতো চালাবালি দিয়ে সেই চেরামাটিকে পা দিয়ে সানা[৪০] হয়। এসব কাজেও এখন মেসিনের আমদানি হয়েছে। সব গড়ন বাদ দিয়ে এখন কুয়ো পায়খানার পাত তৈরি করেন ছেলে কিরণ পালের (৪২) সাথে।

রামকৃষ্ণপুরের ৺ভূবন পালের ছেলে রবীন্দ্রনাথ পাল (৫১) আর ৺শক্তিপদ পালের ছেলে বাসুদেব পাল (৬৩) আগে গড়তেন ঢোল, খোল, তবলা, ডগর[৪১], নাল, মাদল, ধামসা[৪২] প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের খোল। রবীন্দ্রনাথ পাল এখন কেবল ঢোলের খোল গড়েন। বাসুদেব পাল গড়েন তুবড়ির খোল। তুবড়ির খোল সবসময় বিক্রি নাই, পেট চলে না! তবু মাটির মায়া ছাড়তে পারেন না শিল্পী। বড়ো কষ্টে বললেন- "শিল্পীর আর দর থাকলো না বুঝলেন, আমি মরে গেলে এ বংশে মাটির কাজ চুকে যাবে!"

৫.৩ ক্ষেত্র তিন: কেতুগ্রাম থানার মাসুন্দী-দক্ষিণ্ডী

৺রামদয়াল পালের ছেলে গনপতী পাল (৭২) খোঁজ দিলেন মাটির মনের। চেলো মাটি[৪৩] সরিয়ে গড়ন মাটি বের করতে হয়। চেরামাটি মাসুন্দীতে নাম পেয়েছে চিরুনি মাটি, দক্ষিণ্ডীতে গাড়ানো[৪৪] মাটি আর পূরাতনহাটে থ্যান। মুর্শিদাবাদের সোনাভারুইয়ের মাটির রোদ সওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি কিন্তু পাণ্ডুগ্রামের বিলের মাটি ছায়ায় শুকোয়। এমন কত কথকথা লুকিয়ে আছে কুম্ভকারের মনে।

দক্ষিণ্ডী গাঁয়ের ৺কার্তিক পালের ছেলে অনিল পালের (৫৩) কাছে পাওয়া গেলে চাক-পরিচয়। মটর চাক বাগ মানে না, শিল্পীর মন বোঝে না কিন্তু সেকেলে চাকলাড়ি থামতে জানে। এই যন্ত্র যন্ত্রণার শিকার এখন কুমোর পাড়ার সিংহভাগ শিল্পী। অনিল পাল, তমাল পালেরা (৫৮) বললেন- "চাকের মাঝে যে বাবলা কাঠের গোল পাটাতন থাকে, যার ওপর সানা মাটি রাখে কুমোর, তার নাম চাঁদা/চাকি[৪৫]। চাঁদার চারদিকে যে চারটে লাঠি চাক ধরে থাকে তাদের বলে বাহু/বাউলে[৪৬]। চাকের প্রান্তের নাম কোঁরচ[৪৭]। যে গর্তে লড়ি/লাঠি রেখে চাক ঘোরাতে হয় তাকে বলে খয়ো[৪৮]।" মটর চাকে না আছে বাউলো, না খয়ো বা কোঁরচ; আছে শুধু চাঁদার গতি!

৫.৪ ক্ষেত্র চার: কাটোয়া সংলগ্ন খাজুরডিহি-দাঁইহাট

খাজুরডিহির শ্রীনন্দন পালের ছেলে জয়দেব পাল (৭০) খোঁজ দিলেন চাকের পাশে থাকা লতাগড়ের[৪৯]। ব্রহ্মার কমণ্ডলুর সাথে তুলনা হয় এই লতাগড়ের। তিনি গড়েছিলেন চাটুহাঁড়ি[৫০] যার আরেক নাম কড়াহাঁড়ি। আগে গিঁটেহাঁড়ির[৫১] ব্যবহার ছিল অনেক। এখন কেবল দই-হাঁড়ি গড়া হয়, যায় নদীয়ায়। এই গাঁয়ের ৺গোবিন্দচন্দ্র পালের ছেলে সঞ্জিত পাল (৫৫) আগে গড়তেন হাঁড়া[৫২], এখন দইয়ের হাঁড়ি গড়েই কোনোরকমে পেট চলে।

দাঁইহাটের রঞ্জন পাল (৫৬) ছোটবেলায় দেখতেন বাবা ৺উপেন্দ্র পাল কটোরা[৫৩] গড়তেন। আগে ভোজ বাড়িতে মাছ, মাংস, জল দেওয়ার জন্য কটোরার চল ছিল খুব। এখন চায়ের দোকানের চা-ভাঁড় বা কোপটে[৫৪] গড়ে রঞ্জন পাল বেঁচে আছেন। কাগজের কাপ সেখানেও বসিয়েছে থাবা।

৫.৫ ক্ষেত্র পাঁচ: উত্তরের রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ

কুলিক নদীর ধারের শহর রায়গঞ্জ। এই রায়গঞ্জ শহরের মধ্যেই সুভাষগঞ্জ পালপাড়া। বিমল পাল (৪৪) আর স্মৃতি পাল (৩৫) দুই মানুষে একহাতে বোলে আরেক হাতে আঁটি[৫৫] নিয়ে পারার[৫৬] ওপর টব গড়ছেন। পাশের বাড়িতে বাদল পাল (৬৪) আর প্রতিমা পাল (৫৫) গড়ছেন মাটির টেপা পুতুল [৫৭]। টিমটিম করছে সংসারগুলো! কারণ একটাই, যুগের দাবি বদলে গেছে।

উত্তর পাল পাড়ার তরুন কোমর সঞ্জয় পাল (৩৫) তার বিধবা মা অতসী পাল (৫৬) কে নিয়ে বিকেলের নরম রোদে ভাটি[৫৮] সাজাচ্ছেন। নকসি বোতল আর নকসি থালা পাড়ি দেবে কলকাতা, পূর্ণিয়া, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্রে। এখানেই শুনলাম, কচমাটি/কষমাটির[৫৯] কথা। ৩০০ টাকায় ৫০ কেজি মাটি বুনিয়াতপুর থেকে কিনে, সেই মাটিতে পরিমাণমতো কালো খয়ের আর সোডা মিশিয়ে পোড়ামাটির পাত্রে ধীরে ধীরে জ্বাল দিয়ে দশ লিটার মিশ্রণ ফুটিয়ে তিন লিটারে আনতে হয়। এতখানি মেহনতে মাটির কষ আর খয়েরের কষের মিলন হয়। গড়নের-বরণের এই পূর্বরাগের তত্ত্বকথা জানে ক'জন?

৫.৬ ক্ষেত্র ছয়: বিষ্ণুপুর থানার পাঁচমুড়া গ্রাম

দক্ষিণের নগর বিষ্ণুপুর। মল্লরাজাদের শিল্প-অনুরাগ ছিল, তাই নাটোর থেকে কুম্ভকারদের এনে ভূমিদান করেছিলেন। বিষ্ণুপুর শহরের মন্দিরে মন্দিরে সেই টেরাকোটা[৬০] শিল্পের ছাপ। ৺মদনমোহন কুম্ভকারের ছেলে ধীরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার (৮১) ও ৺রাসবিহারী কুম্ভকারের ছেলে পশুপতি কুম্ভকার (৯৪) গত প্রজন্মের দুই প্রবীন শিল্পীর কাছে খোঁজ পেলাম টেরাকোটার কথা। ঘোড়া, হাতি, মনসার চালি এই গাঁয়ের আদি শিল্প। মহেঞ্জোদারো শিল্পীদের মতো এখানেও একটা অবয়ব খণ্ড খণ্ড করে নির্মাণ করে জোড়া লাগানো হয়। হাতি-ঘোড়ার গর্দান[৬১], ঠ্যাং, ঘাড় পৃথকভাবে চাকে তৈরি হওয়ার পর জোড় দেওয়া হয়। বরতোরা, জামবেদিয়া থেকে আগে লালমাটি[৬২] আসতো, এখন সে মাটির অভাব মেটায় কেমিক্যাল রং! সব বাধা ঠেলে পাঁচমুড়ার শিল্প বিশ্ববাজারে সেদিন থেকে আজ অব্দি নিজের গরিমা বজায় রেখেছে।

৬. প্রান্তিক খোঁজ:

গড়নবাড়ি, পোড়নবাড়ি গুলো এমনি করেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে দ্রুততার তাল কেটে! প্লাস্টিক, গ্যাস চুল্লি, যন্ত্রের বাড়-বাড়ন্ত, শ্রম বিমুখ মন, চাহিদার অভাব- সবকিছু মিলে যে শব্দগুলো ক্ষয় হতে শুরু করেছে প্রাচীন সৌধের মতো, তার তালিকা খুব ছোট নয়। বাংলার মাত্র সাতটি থানার এগার-বারটি ক্ষেত্র জরিপ করে পাওয়া শব্দের তালিকা ৬২। এই সীমিত ক্ষেত্রে কুম্ভশিল্পের মতো ধারাবাহিক, ব্যপক সমস্যা সম্পূর্ণ জরিপ করা অসম্ভব। কাজটির সীমাবদ্ধতা এটি। তবু কোথাও থেকে তো শুরু করতে হবে। তাই উত্তর, দক্ষিণ আর রাঢ় বাংলার তিনটি ধারা সমন্বয় করে কাজটির একটা রূপরেখা আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক ক্ষেত্রে কুম্ভশিল্পের এই ক্ষেত্র-সমীক্ষা করা যেতে পারে। শুধু কুম্ভকার নয়, বঙ্গ-সমাজের অন্যান্য পেশাভিত্তিক জাতির শিল্পচর্চার অভিমুখ নিয়েও কাজ করবার পথ রয়েছে।

আর দু-একটি দশকের পর শব্দগুলো শুধুই ইতিহাস হয়ে থাকবে। প্রয়োগ এবং প্রয়োজনের বৃত্ত থেকে ছুটি নেবে। বাঙালির লোকজীবন থেকে এমন অনেক শব্দ হারিয়ে যাওয়ার পথে। অথচ একদিন কত আবেগে, কত দাবিতে গড়ে উঠেছিল এইসব শব্দের ভ্রূণ। গ্রামের পেশাভিত্তিক জীবন-যাপন থেকে আরও অনেক ক্ষেত্র সমীক্ষা হতে পারে, লুপ্তপ্রায় শব্দ এবং তার আবেগ তুলে ধরে শব্দকোষের সমৃদ্ধ একটি আধার গড়তে। যা পরপ্রজন্মের সামনে খুলে দেবে শিকড়ের খোঁজ। পেশাভিত্তিক এই শব্দ-কোষ বা আর্কাইভের বড়ো প্রয়োজন। বাংলা ভাষার ধ্রুপদী তকমাতেও শব্দের অস্তিত্বই একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। লি য়েন সংকলিত সংস্কৃত-চিনা ডিকশনারিতে (অষ্টম শতক) পাওয়া 'ভতার', 'আইস', 'বইস' শব্দগুলো ধরে ভাষাবিদ অমিতাভ দাস চর্যাপূর্ব বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক দাবিকে তুলে ধরেছেন।* একদিন জীবন আর যাপন থেকে কুমোর পাড়ার সিংহভাগ শব্দের প্রয়োজনীয়তা হারাবে। সজীব সমাজ ও ভাষা বহমানতার নিরিখেই বদলে ফেলবে তার শব্দবাস—এ স্বাভাবিক। তাই বলে শব্দগুলোর বিশেষ সংরক্ষণ থাকবে না? যেখানে তার প্রয়োগের, আবেগের খোঁজটি ধরা থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। যে শব্দের কাছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুঁজে পাবে সমাজ-ইতিহাসের ধারাটি। বাঙালির রান্নাঘর, দোকানঘর এবং মৃৎশিল্পে ইতিহাসের সূত্রটি ধরা থাকবে ঐ জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া শব্দকোষে।

৭. কুমোর পড়ার লুপ্তপ্রায় শব্দ টীকা:

১. **কুম্ভ:** কুমোরের নির্মিত প্রথম পাত্র, কাঁখে করে মেয়েরা জল আনতো নদী বা পুকুর থেকে এই পাত্রে।
২. **জালা:** জমিদার বাড়িতে খাবার জল সংরক্ষণ বা দানাশস্য রাখবার বড়ো পোড়ামাটির পাত্র।
৩. **হুলুনি:** আগেকার রসগোল্লা নিয়ে যাওয়ার ছোট পোড়ামাটির পাত্র।
৪. **চাক:** যে কাঠের চাকার ওপর কোমর মাটি রেখে ঘুরিয়ে পাত্র বানায়।
৫. **পেলে:** চাকের পাশে জল রাখবার পোড়ামাটির পাত্র।
৬. **চাকলাড়ি:** যে লাঠি দিয়ে চাক ঘোরানো হয়।
৭. **শালতলা:** যেখানে কুমোর তার গড়নকে পোড়ায়।

৮. **হোলা**: বড়ো হুলুনি।

৯. **পাদনা**: গরুকে খাবার দেওয়ার পোড়ামাটির পাত্র।

১০. **সরা**: জালা, হাঁড়ি, পয়ার মুখ ঢাকা দেওয়ার পাত্র, অনেকটা তাওয়ার মতো।

১১. **খাপুড়ি**: মুড়ি ভাজার চাল নাড়ার পাত্র, অনেকটা কড়া ছাড়া বড়ো কড়াইয়ের মতো পোড়ামাটির পাত্র।

১২. **ঘুঁটে**: গোবরের তৈরি শুকনো গোলাকার জ্বালানি, যা মাটির পাত্র সইতে পারে সহজে।

১৩. **বান**: বড়ো আকারের পাদনা।

১৪. **আতাল**: মাটির তাওয়ার মতো, যেখানে মাটির হাঁড়ি/কলসি রেখে শিল্পী পিটনে-বোলে দিয়ে পাত্র গড়েন।

১৫. **বোলে**: বেলে পাথরের/ পোড়ামাটির তৈরি অনেকটা বাটি আকৃতির হেতেড়। কাঁচা পাত্রের ভিতরে বাম হাতে বেলে পাথরের বোলে রেখে পিটাতে হয় পিটনে দিয়ে।

১৬. **পিটনে/পিটুনে:** যে কাঠের হেতেড় দিয়ে কাঁচা মাটির পাত্রকে বাইরে থেকে পিটিয়ে পিটিয়ে আকার দিতে হয়, ছাপ মারতে হয়।

১৭. **কুঁড়ো:** চালকল থেকে যে ধানের খোসা বেড় হয়, যা কুমোরের শালের প্রাচীন জ্বালানি।

১৮. **কাঁচকি**: সরষে, তিল বা গমের ডালপালার গ্রাম্য নাম। যা কুমোর পাড়ার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

১৯. **চাকপুজো**: জ্যৈষ্ঠ মাসের বিজোড় শনিবার চাকে ফুল নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করে কুমোর গড়নের কাজ শুরু করে, যা চাকপুজো নামে খ্যাত।

২০. **বনোক মাটি:** যে মাটি দিয়ে পাত্র শুকিয়ে যাওয়ার পর রঙ করা হয় বা বর্ণ দেওয়া হয়।

২১. **বতর**: মাটিকে পাত্র গড়বার উপযোগি করা। জল আর বাতে এই পদ্ধতি হয়, তাই বতর।

২২. **পাগুই**: যেকোনো হাঁড়ির কানার মুখ পাকে পাকে গড়তে হয়, তাই নাম তার পাগুই।

২৩. **চাঁচনে**: লোহার তৈরি বিভিন্ন রকমের আকৃতির হেতের, যা দিয়ে কাদামাটি চাঁচা হয়।

২৪. **ধুকিপিঠের হাঁড়ি**: ইডলির চেয়ে একটু বড়ো আকারের পিঠে তৈরির পোড়ামাটির হাঁড়ি।

২৫. **গোলা**: মদ তোলা পোড়ামাটির কলসি।

২৬. **নাড়া খোলা**: চাল নাড়বার পোড়ামাটির পাত্র যার আরেক নাম খাপুড়ি।

২৭. **ছাঁকা খোলা**: খই বা মুড়ি ভাজবার খোলা।

২৮. **ডাবা**: ধান সিদ্ধ করবার পর দু-সিদ্ধের আগে সেই ধানকে জলে ভিজিয়ে রাখবার বড়ো পাদনা জাতীয় পোড়ামাটির পাত্র।

২৯. **ডেয়ে:** গুড়, দানাশস্য রাখবার বড়ো কুঁজো-আকারের পোড়ামাটির পাত্র।

৩০. **আকা:** মাটির উনানের ডাকনাম, ঘুঁটে-কুঁড়ো দিয়ে যা জ্বলে।

৩১. **বাগা:** তালগাছের পাতা যে ডালের সাহায্যে গাছের সাথে লেগে থাকে, যা কুমোরের জ্বালানি হিসাবে লাগে।

৩২. **শর**: নদীর ধারে বা ডাঙায় অগ্রাণমাসে লম্বা সরু লাঠির মতো যে গাছ হয়, যা দিয়ে কলম তৈরি হতো আগে, সেই শরও একপ্রকার দেশজ জ্বালানি।

৩৩. **হোগলা/কেশে:** কাশফুল ঝরে যাওয়ার পর কাশগাছের শুকনো ডাল, যা মাটি পোড়ানোর জ্বালানি।

৩৪. **বাঁক**: বাঁশের তৈরি বাতার দুপাশে পাটের দড়ি দিয়ে ভার নিয়ে যাওয়ার হেতেড়। গরুর গাড়ি যেখানে যেতো না, সেখানে বাঁকে করে পোড়ামাটির পাত্র বেচতে যেতো কুম্ভকার।

৩৫. **মালসা**: পুজোর ভোগ দেওয়ার পাত্র। হোলার চেয়ে ছোট, হুলুনির চেয়ে বড়ো।

৩৬. **পয়া**: মূলত পোওয়া পোওয়া শষ্যদানা রাখবার বড়ো পাত্র, জালার চেয়ে ছোট।

৩৭. **থান/থ্যান**: সারা বছর গড়ন গড়বার জন্য মাটির স্তুপের বিশেষ গড়ন (চিত্র -১)।

৩৮. **বেতি**: বেতের তৈরি/বাতার তৈরি স্কেলের/ছুঁড়ির মতো হেতেড়, যা দিয়ে মাটির বতর করা হয়।

৩৯. **চেরামাটি**: বেতি বা চাঁচনে দিয়ে থান থেকে মাটিকে চেরার পর, মাটির যে নতুন রূপ হয়।

৪০. **সানা**: চেরামাটি বালি আর জল দিয়ে পায়ে করে গড়নের উপযুক্ত করবার পদ্ধতি হল সানা, সেই মাটির নাম সানামাটি।

৪১. **ডগর**: বাঁয়া জাতীয় পোড়ামাটির আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র।

৪২. **ধামসা**: ডগরের চেয়ে বড়ো আকারের আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র।

৪৩. **চেলোমাটি**: মাটি সংগ্রহের সময় মাটির ওপরে থাকা আগাছা যুক্ত মাটিকে কোদাল দিয়ে তুলে ফেলা হয়, ঐ অপ্রয়োজনীয় মাটি কুমোরের ভাষায় চেলোমাটি।

৪৪. **গাড়ানো মাটি**: থান থেকে মাটি চিঁরে গড়নের উপযোগি হয়ে উঠলে, সেই মাটিকে গাড়ানো মাটি বলা হয়।

৪৫. **চাঁদা/চাকি**: কুমোরের চাকের মাঝের পাটাতন, যা বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি।

৪৬. **বাউলে/বাহু**: চাঁদার সাথে চাকের প্রান্তভাগ জুড়ে থাকা চারটে লাঠির বাহুকে বাউলো বলা হয়।

৪৭. **কোঁরচ**: চাকের মাটিলেপা বৃত্তাকার প্রান্তভাগ।

৪৮. **খয়ো**: চাক ঘোরানোর লাঠি কোঁরচের ওপর যে গর্তে রাখা হয়, খয়ে খয়ে নির্মাণ- তাই খয়ো।

৪৯. **লতাগড়**: হাঁড়ির কানা জোড়ার সময় যে পাত্রে জল আর কাপড়ের লতা থাকে, সেই লতা রাখবার আগার হলো লতাগড়।

৫০. **চাটুহাঁড়ি/কড়াহাঁড়ি**: চ্যাপ্টা আকারের হাঁড়ি, সাধারণত দুধ বা পায়েস তৈরিতে আগে ব্যবহৃত হতো।

৫১. **গিঁটে হাঁড়ি**: শক্তপোক্ত যে হাঁড়িতে খাবার রেখে ঢাকা দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা হতো।

৫২. **হাঁড়া**: বড়ো আকারের গিঁটে হাঁড়ি।

৫৩. **কটোরা**: চায়ের ভাঁড়ের চেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ আকারের পাত্র, যা দিয়ে ভোজ বাড়িতে আগে জল, তরকারি দেওয়া হতো।

৫৪. **কোপটে**: ছোট আকারের কটোরা।

৫৫. **আঁটি**: টবের মতো যে পাত্রে মাটির চাদর রেখে টব আঁটা হয়।

৫৬. **পারা**: যে বৃত্তাকার প্লেটের ওপর রেখে টব পারা হয়, যা সাধারণত পাথর বা পোড়ামাটির হয়।

৫৭. **টেপা পুতুল**: আঙুলের চাপ দিয়ে টিপে টিপে গড়া পুতুল।

৫৮. **ভাটি**: উত্তরবঙ্গে কুমোরের মাটি পোড়ানোর উনানকে ভাটি বলা হয়।

৫৯. **কচ/কষ**: খয়ের আর মাটির পাকা রঙ, যা পাত্রকে বর্ণময় করবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৬০. **টেরাকোটা:** টেরা এবং কোটা এই দুটি ধারায় গড়া পুতুল, প্রথার থেকে একটু টেরা কিন্তু কুটে কুটে নির্মাণ, যা বিষ্ণুপুরের ঘরানা।

৬১. **গর্দান:** টেরাকোটার হাতি-ঘোড়ার বুক থেকে কোমড় পর্যন্ত দেহের অংশ, যা চাকে তৈরি হয়।

৬২. **লালমাটি:** মোড়াম মাটির যে অংশ বালি-কাঁকড় থাকে না এবং টকটকে লাল বর্ণের, যা টেরাকোটা গড়নের রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বি: দ্র:

প্রথম বন্ধনিতে দেওয়া সংখ্যা বছরের হিসাবে বয়স নির্দেশ করেছে।
ক্ষেত্র-সমীক্ষার সকল তথ্য ২০২২ থেকে ২০২৪ এর মধ্যে নেওয়া হয়েছে।
*'ধ্রুপদী ভাষা বাংলা' শিরোনামে অধ্যাপক অমিতাভ দাসের মূল্যবান মতামত থেকে নেওয়া

৮. চিত্র পরিচিতি:

চিত্র: ১) পুরাতনহাট গাঁয়ের রবীন্দ্রনাথ পালের মাটির থানা
চিত্র: ২) মাটির চাদর দক্ষিণ্ডী গাঁয়ের তমাল পালের
চিত্র: ৩) দক্ষিণ্ডী গাঁয়ের অনিল পালের হাত চালিত চাক
চিত্র: ৪) মাটির আতালে পাথরের বোলে
চিত্র: ৫) মাটির আতালে লোহার চাঁচনে
চিত্র: ৬) মাটির আতালে কাঠের পিটনে
চিত্র: ৭) বিভিন্ন রকমের আতাল
চিত্র: ৮) দক্ষিণবঙ্গের মাসুন্দী গাঁয়ের দুষ্কর পালের শাল
চিত্র: ৯) উত্তরবঙ্গের বাদল পালের ভাটি
চিত্র: ১০) মাসুন্দী গাঁয়ে কুমোরের পাদনা
চিত্র: ১১) থুপসাড়া গাঁয়ের গড়নের সামনে রবীন্দ্রনাথ পাল(বামদিক) ও অনিল পাল(ডানদিক)
চিত্র: ১২) খাজুরডিহি গাঁয়ের জয়দেব পালের লতাগড়
চিত্র: ১৩) রায়গঞ্জে টব গড়ছেন স্মৃতি পাল, পারার ওপর মাটি রেখে
চিত্র: ১৪) রামকৃষ্ণপুর গাঁয়ের বাসুদেব পাল তুবড়ির ঠোল গড়ছেন যন্ত্র চালিত চাকে
চিত্র: ১৫) পাঁচমুড়ার সুশান্ত কুম্ভকার গর্দান জুড়ছেন পায়ের সাথে
চিত্র: ১৬) পাঁচমুড়া গাঁয়ের পশুপতি কুম্ভকারের সাথে লেখক
চিত্র: ১৭) রায়গঞ্জের কুলিক নদীর ধারে সঞ্জয় পালের কষমাটি মাখা পাত্র শুকাচ্ছে (সঞ্জয় পাল)
চিত্র: ১৮) রায়গঞ্জের প্রতিমা পাল মাটির পুতুল গড়ছেন
চিত্র: ১৯) প্রায় ছ'শো বছর আগে মদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটা

চিত্র: ২০) পাঁচমুড়া গাঁয়ের ভূতনাথ কুম্ভকারের গড়া টেরাকোটা(২০২৩)

চিত্র: ২১) জয়দেব মেলায় পোড়ামাটির দোকান, মাত্র দুটি(২০২৩)

চিত্র: ১

চিত্র: ২

চিত্র: ৩

চিত্র: ৪

চিত্র: ৫

চিত্র: ৬

চিত্র: ৭

চিত্র: ৮

চিত্র: ৯

চিত্র: ১০

চিত্র: ১১

চিত্র: ১২

চিত্র: ১৩

চিত্র: ১৪

চিত্র: ১৫

চিত্র: ১৬

চিত্র: ১৭

চিত্র: ১৮

চিত্র: ১৯

চিত্র: ২০

চিত্র: ২১

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দাস, স্বামী রামসুখ; 'শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা', ২০০৯, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

২. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন (সম্পাদিত); 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', ১৪২০, নবভারত পাবলিসার্স, কলকাতা।

৩. রায়, নীহাররঞ্জন; 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব', ১৪২৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪. শ্রী অরবিন্দ, 'ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি', ২০০৭, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পুদুচেরি।

৫. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পাদিত); 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', ১৪২৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

৬. রায়, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত); 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', ২০২২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার; 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি', ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

৮. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত); 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল', ২০১৭, সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা।

৯. মিত্র, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত); 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

১০. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত); 'বৈষ্ণব পদাবলী', ১৪২৭, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

১১. সেন, শ্রী দীনেশচন্দ্র (সম্পাদিত); 'মৈমনসিংহ গীতিকা', ১৯৯৩, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

১২. দাস, কৃষ্ণলাল; 'শিল্প ও শিল্পী' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০১৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

১৩. চক্রবর্তী, রণবীর; 'ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব' (প্রথম খণ্ড), ২০০৭, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।

১৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত); 'লোকজ শিল্প', ২০১১, পারুল, কলকাতা।

১৫. হালদার, গোপাল; 'সংস্কৃতির রূপান্তর', ২০১৯, অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা।

১৬. বেদান্ততীর্থ, গিরিশচন্দ্র; 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়', ১৪২৮, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

১৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর; 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', ২০০৬, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।

১৮. হাই, মুহাম্মদ আবদুল; 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', ১৪১৮, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৯. আজাদ, হুমায়ুন; 'অর্থবিজ্ঞান', ২০০৯, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

২০. হক, মোহাম্মদ দানীউল; 'ভাষা বিজ্ঞানের কথা', ২০০২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

২১. মুহিত, আব্দুল; 'ভাষাদর্শন', ২০২২, অবসর, ঢাকা।

পত্রিকা:

'লোক': ‘দুর্গোৎসব: সেকাল-একাল’, শারদ-১৪২১, কলকাতা